বাগর্থ

শ্রী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

বাগর্থ

বাগর্থ

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

পরিবর্ধিত ও সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৫০
পরিবর্ধিত ও সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৭৭

প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জি জ্ঞা সা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫/১এ কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

বাঙ্গালা ভাষার ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাগত সমস্যার সম্বন্ধে বই সংখ্যায় এত অল্প যে এ বিষয়ে দুই একখানি বই বাহির হইলে ভাষাতত্ত্বের অনুশীলক সকলের পক্ষেই আনন্দের কারণ হয়। এবং সে বইয়ে যদি যুক্তি-যুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভাষাগত দুই চারিটি বৈশিষ্ট্যের বস্তুতান্ত্রিক আলোচনা এবং ভাষাগত সমস্যার যুক্তিসঙ্গত বিচার ও সমাধানের চেষ্টা দেখা যায় তাহা সোনায় সোহাগা হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুমোদিত রীতিতে আলোচনামূলক গ্রন্থ খুবই কম, বোধ হয় এক আঙ্গুলে গণিয়া শেষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সার্থক ভাবে প্রথম শিক্ষা দিয়াছিলেন—তাঁহার রচিত কতকগুলি প্রবন্ধ যেগুলি "শব্দতত্ত্ব" শীর্ষক ছোট একখানি গ্রন্থে সংকলিত হইয়া আছে সেগুলি এখনও বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনার পক্ষে মূল্যবান সাধনস্বরূপ বিদ্যমান। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের "শব্দ-কথা"র কতকগুলি আলোচনা সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়। এই অবস্থায় বিচার-বুদ্ধি এবং সত্যকার জিজ্ঞাসার অধিকারী হইয়া যদি কেহ ভাষাতত্ত্বের চর্চা করেন এবং সে বিষয়ে যুক্তি-যুক্ত কথা লেখেন তদ্দ্বারা তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞানসম্পদের সহায়তা করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য রচিত এই বইখানি কতকগুলি প্রবন্ধের সংগ্রহ। এগুলিতে বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। 'বাগর্থবিজ্ঞান'-শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ধরিয়াই সমগ্র গ্রন্থখানির নামকরণ করা হইয়াছে 'বাগর্থ'। ইংরেজী Semantics শব্দের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হিসাবে বাগর্থবিজ্ঞান শব্দটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছে—ইহার গঠনে কালিদাসের প্রযুক্ত বাগর্থ এই সুন্দর সমস্তপদটির অতি সুষ্ঠু প্রয়োগ হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বাগর্থবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বোধগম্য করিয়া এবং উপযোগী বাঙ্গালা উদাহরণ দ্বারা বিশদ করিয়া লিখিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে নীরস বিষয়ের বেশ সরস আলোচনা হইয়াছে। 'চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান' প্রস্তাবে এই বানান বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় যে ভীষণ অরাজকতা চলিতেছে সেদিকে সংখ্যা গণনা করিয়া অকাট্য যুক্তি-শলাকা দ্বারা তিনি আমাদের চক্ষু

উন্মীলিত করিয়াছেন। ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় যে আমাদের এই বঙ্গভাষা, "মোদের গরব মোদের আশা" ইহার প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কি গভীর! এখানে যে যাহা খুশী তাহা করিতে পারে। "ক'রছে" এবং "চ'লল" এই দুই শব্দের যথাক্রমে চব্বিশটি চব্বিশটি করিয়া বানান বাঙ্গালায় প্রচলিত। এই সব হিসাব করিতেও যথেষ্ট পরিশ্রমের আবশ্যক হইয়াছে। ইহার সমাধান বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা করি-করি করিয়াও করা হইল না। এবং কবে যে হইবে তাহাও জানি না।

অন্য প্রবন্ধগুলি এইরূপ নানা আবশ্যক তথ্যের খনি এবং প্রত্যেকটি যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তার খোরাক জোগাইতে সমর্থ। মোটের উপর বৈচিত্র্যে অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে এবং যৌক্তিকতায় এই বইখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি নূতন ধরনের জিনিস হইয়াছে। এই বই পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত হইবেন এবং আনন্দলাভ করিবেন। এবং আশা করি সুধী-সমাজে ইহার যথোচিত সমাদর হইবে।

দোলপূর্ণিমা
১৩৫৬। ২০০৬
৪ মার্চ ১৯৫০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

আগের সূচীপত্রে পাঠের সংখ্যা যাহা ছিল এবারে হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ। ভার বাড়িয়াছে অনেক, কিন্তু ধার বাড়িল কতটা সে হিসাব শুভঙ্করের অঙ্কশাস্ত্রের অন্তর্গত নয়। শব্দশাস্ত্রের প্রতি যাঁহাদের কিছু অনুরাগ আছে, তাঁহারাই সে বিচার করিবেন। বাগর্থ গ্রন্থটির উদ্ভবও সেই অনুরাগ হইতেই।

বর্তমান সংস্করণে এই প্রবন্ধগুলি নূতন সংযোজিত হইয়াছেঃ বাগর্থ ও স্ফোটবাদ, প্রাতিশব্দ্য, প্রাচীন বাংলা ভাষার বানান পদ্ধতি, বাংলা কারক-বিভক্তি, ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় শব্দোপকরণ, সাধুভাষা ও চলিত ভাষা, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপভাষা। শেষোক্ত প্রবন্ধের অনুষঙ্গরূপে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে 'সোনার পাথরবাটী' নামক একটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকা। পূর্ব সংস্করণের একটি প্রবন্ধ পরিত্যক্ত হইয়াছে—'মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণ প্রণালী'। 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপভাষা' ওই পুরাতন প্রবন্ধেরই পূর্ণতর রূপান্তর। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কথিত এই উপভাষাটির একটি ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা কি বাংলা? নাকি ওড়িয়া? নাকি বাংলা-প্রভাবিত ওড়িয়া? অথবা, ওড়িয়া-প্রভাবিত বাংলা? রাষ্ট্রীয় ভূগোল অনুসারে আলোচ্য অঞ্চলটি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং বাংলাদেশের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। সে হিসাবে এ ভাষাকে বাংলাই বলিতে হয়। কিন্তু কেবল সেই কারণেই যে ইহাকে বাংলা বলিতেছি তাহা নয়, ইহার ব্যাকরণ অনেকটা বাংলারই অনুসারী। তবে এ অঞ্চলের ধ্বনিপ্রকৃতি ওড়িয়ার প্রভাবে প্রভাবিত। সেই কারণেই ইহাকে ওড়িয়া বলিয়া ভ্রম হয়।

গ্রিয়ার্সন ইহাকে দক্ষিণ-পশ্চিমা বাংলা ভাষাই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই উপভাষার যে দৃষ্টান্ত সংকলন করিয়াছেন সেগুলি শিক্ষিত লোকের দ্বারা তথাকথিত উপভাষায় রচনা করাইয়া লওয়া হইয়াছে, সুতরাং সেগুলি অকৃত্রিম হইতে পারে নাই। 'সোনার পাথরবাটী' পুস্তিকাটির ভাষা আলোচ্য উপভাষার অতি সন্নিহিত নিদর্শন। 'সোনার পাথরবাটী' সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করি,—"এই ভাষার একটি বিশেষ মূল্যবান্ নিদর্শন ··· গোলকনাথ বসু কর্তৃক রচিত 'গ্রাম্য উপন্যাস' 'সোনার

পাথরবাটী'-তে পাওয়া যাইবে। এই প্রায়-অপ্রাপ্য বই একখানি সংগ্রহ করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। সুখের বিষয়, এই স্থানীয় বাঙ্গলার বইখানির মূল্য বুঝিয়া বইখানির প্রথম খণ্ডটি তিনি ছাপাইয়া দিয়াছেন ও ইহার ভাষাভিত্তিক আলোচনাও কিঞ্চিৎ করিয়াছেন। ...বাঙ্গলা ভাষার আলোচনায় ইহা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন।" (ষট্‌ত্রিংশ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ। ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৩ এপ্রিল ১৯৭৩।)

আর একটি কথাও উল্লেখ করিবার মত। এ অঞ্চলের ভাষা যেমনই হউক যাহাই হউক লিপি বাংলা। কাঁথির একটি ছাপাখানায় মুদ্রিত কয়েকটি বই আমার কাছে আছে যাহার ভাষা ওড়িয়া কিন্তু হরফ বাংলা।

শিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, রেডিয়োর প্রচার এবং সিনেমার প্রসারের ফলে ভাষাগত আঞ্চলিকতা দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। আলোচ্য উপভাষাটিও শহুরে ভাষার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ অবলুপ্তির অপেক্ষায় দিন গুনিতেছে।

'বাগর্থ ও স্ফোটবাদ' নূতন প্রবন্ধ। স্ফোট কথাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় পতঞ্জলির (খ্রীঃ পূঃ ১৫০) ব্যাকরণ মহাভাষ্যে। তাহার পর হইতে দুই হাজার বছর ধরিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিতেছে। এ যুগের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে আছেন কীথ্, রাধাকৃষ্ণন্, সুশীলকুমার দে প্রমুখ পণ্ডিতগণ। শেষ কথা যিনি বলিবেন এখনও তাঁহার প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু আগের কথাগুলিও শব্দার্থরসিকের জানিবার যোগ্য। 'বাগর্থ ও স্ফোটবাদ' প্রবন্ধে সেই কথাগুলিও বলিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।

শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক ধরিয়াই তৃতীয় প্রবন্ধ 'প্রাতিশব্দ্য'-এর অন্তর্ভুক্তি। বাংলা ভাষাবিজ্ঞান সাহিত্যে প্রতিশব্দ প্রসঙ্গও সম্ভবতঃ স্ফোটবাদের মতই অপরিচিত মনে হইবে। প্রতিশব্দ কথাটি আমরা যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি সে অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইতে দেখি না। সংস্কৃতে ইহার ব্যবহার প্রতিধ্বনি অর্থে। আমরা বাংলায় প্রতিশব্দ বলিতে Synonym বুঝি। 'প্রাতিশব্দ্য' প্রবন্ধে সেই প্রতিশব্দের চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, কোনো শব্দই সর্বতোভাবে আর একটি শব্দের প্রতিশব্দ হইতে পারে না। এরূপ মনে করিবার কারণ কি তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিশব্দ বলিতে সমার্থক শব্দই বুঝি তাহা ঠিক, কিন্তু 'সমার্থে'র 'সমতা'র মাত্রায় ষোল আনা মিল কদাচিৎ দেখা যায়।

'চলিত বাংলা ও তাহার বানান' পুরাতন প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' রচিত হইবার পূর্বে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল প্রথম সংস্করণের নিবেদনে সেকথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন,—"গত নভেম্বর মাসে (১৯৩৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি নিযুক্ত করেন। এই সমিতি বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট একটি প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন।" 'চলিত বাংলা ও তাহার বানান' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিই ছিল ওই 'প্রশ্নপত্রে'র মূল অবলম্বন।

এই বানান প্রসঙ্গেই সংযুক্ত হইয়াছে আর একটি প্রবন্ধ—'প্রাচীন বাংলা ভাষার বানান পদ্ধতি'। প্রাচীন বাংলার কি সর্বজনস্বীকৃত কোনো বানানপদ্ধতি ছিল? বাংলা পুঁথির লিপিকারগণ কি কোনো সুনির্দিষ্ট বানান পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন? আমরা অনেক সময় ধরিয়া লই পুরাতন বানানে শৃঙ্খলা আদৌ ছিল না, পুঁথি লেখকগণ যেমন খুশি লিখিতেন। এ প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি সে ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ধরিয়াই সূত্র সন্ধানের চেষ্টা করিয়াছি। প্রসঙ্গতঃ বলি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং 'বৌদ্ধগান ও দোহা' আদর্শ পুঁথির অবিকল প্রতিলিপি। পুঁথির মূল পাঠ যেমন ছিল তেমনই রক্ষিত হইয়াছে। সম্পাদকগণ যেখানে পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করিয়াছেন সেখানেও মূল পাঠটি দেখাইয়াছেন। এই কারণেই এই দুইটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছি। আজকাল অনেকে প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন কালে পাঠ বদলাইয়া "শুদ্ধ" করিয়া দেন। গ্রন্থের মূল পাঠ পাঠককে জানিতে না দিয়া তাহার পরিবর্তে সম্পাদকের মনের মত পাঠ বসানো নীতিসঙ্গত নহে। সর্বসাধারণের পাঠ্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারতের জনপ্রিয় সংস্করণের কথা স্বতন্ত্র।

'বাংলা কারক-বিভক্তি' প্রবন্ধে কারক-বিভক্তির সমস্যাটা কি এবং তাহার জটিলতা কোথায় তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। সে সমস্যার সমাধান সহজ না হইতে পারে কিন্তু অসম্ভব যে নয় তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমা দ্বিতীয়া প্রভৃতি সংখ্যা বাচক বিভক্তিনাম বাংলার পক্ষে অনাবশ্যক। বাংলায় যাহাকে বিভক্তিচিহ্ন বলি সেগুলিই প্রকৃত বিভক্তি। এ কথাটা যদি

মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেই বাংলা ব্যাকরণ খাঁটি বাংলার পথে একধাপ আগাইয়া যাইতে পারে।

নূতন সংযোজনের মধ্যে আছে আর একটি প্রবন্ধ 'ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় শব্দোপকরণ'। আমাদের ভাষায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কথা অনেক শোনা গিয়াছে। কিন্তু ইংরাজের ভাষায় ভারতীয় প্রভাব যে কি পরিমাণ পড়িয়াছে তাহা বড় একটা ভাবিয়া দেখি না। প্রামাণিক ইংরাজী অভিধান Oxford English Dictionary গ্রন্থে ধৃত ভারতীয় শব্দের সংখ্যা প্রায় নয় শত। এই নয় শত মূল শব্দ হইতে জন্ম লইয়াছে এমন ব্যুৎপন্ন শব্দের সংখ্যা কয়েক হাজার হইবে। ভারতীয় শব্দ কবে কেমন করিয়া কোন্ সূত্রে ইংরাজীর মধ্যে প্রবেশ করিল তাহার ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। এই প্রবন্ধে তাহারই একটু আভাস দেওয়া গেল।

আর একটি নূতন প্রবন্ধ 'শব্দ ও প্রবচনে প্রাণী-নাম'। এটিও নাম বিষয়ক রচনা। নামরহস্য পুরাতন প্রবন্ধ, নাম তাহারও উপজীব্য। কিন্তু সে নাম মানুষের। 'শব্দ ও প্রবচনে প্রাণী-নাম' প্রবন্ধে ইতর প্রাণীর নামের কথা বলিয়াছি। জীবজন্তুর নাম অবলম্বন করিয়া যে বহু সংখ্যক শব্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেগুলি শুধু শাব্দিকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে না, সামাজিক ইতিহাসের ছাত্রকেও উৎসাহিত করিবার মত কিছু উপকরণ জোগাইবে।

'সাধুভাষা ও চলিতভাষা'-টিও নূতন সংযোজন। বাংলার সাধু ও চলিত রীতি বিষয়ে সারস্বত লাইব্রেরীর সৌজন্যে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল প্রায় পাঁচ বৎসর আগে। তাঁহাদের সম্মতিক্রমে প্রবন্ধটি সংশোধন ও সম্মার্জন করিয়া বাগর্থের অন্তর্ভুক্ত করিলাম।

ভাষাতত্ত্বের বই 'পাঠ্য' হইলে পড়েন পরীক্ষার্থী সম্প্রদায়। কাজেই পাঠ্য বই সহজে ছাপা হয়। আর আনন্দই যাহাদের উৎস এবং আনন্দদানেই যাহাদের সার্থকতা তেমন বই স্বভাবতই বেশী প্রকাশিত হয় না। তাই হঠাৎ এক আধখানি ভাল বই বাহির হইলে মনটা প্রসন্ন হইয়া উঠে। কিছুদিন আগে প্রকাশিত আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষার ক্রমবিকাশ' নামক মূল্যবান বইটির জন্য এই উপলক্ষে গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানাই।

ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই একটা বিরূপতা দেখা যায়। সুখের বিষয় ইদানীং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ প্রীতিভাজন

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কয়েকটি ছাত্র ভাষাবিষয়ক গবেষণায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও জানি। অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী তাঁহার গবেষণার্থী ছাত্রদের উত্তরবঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। বর্ধমান বীরভূম বাকুড়া পুরুলিয়ায় এখনও অনেক 'জমিন' পতিত আছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় অধ্যক্ষ আমার প্রাক্তন ছাত্র স্নেহভাজন ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়কে বলি, কয়েকজন ভাষানুরাগী ছাত্রকে আবাদের কাজে লাগাইয়া দিন। কৃষি ও কৃষ্টি এক ধাতু হইতেই আসিয়াছে কিন্তু কৃষিতে বড়জোর 'সোনা'ই ফলিতে পারে, কৃষ্টির ফসল আরও মূল্যবান্।

আমার পরমস্নেহাস্পদ ছাত্র অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য অতিশয় যত্নসহকারে এই গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৬

১০৩-ই কাঁকুলিয়া রোড শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কলিকাতা-২৯

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বাগর্থের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণ-প্রণালী' শীর্ষক প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। গ্রিয়ার্সন সাহেব 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থে যে উপভাষাকে দক্ষিণ-পশ্চিমা বাঙ্গালা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এই প্রবন্ধের আলোচ্য ভাষা সেই দক্ষিণ-পশ্চিমা বাঙ্গালা। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা গ্রহণ করেন, তখন বর্তমান লেখককে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার গবেষণাসহায়ক রূপে নিযুক্ত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ওই সময়ে বাঙ্গালা বানানের সংস্কারে মনোযোগী হন এবং ওই সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংকলনের ভার বর্তমান লেখকের হস্তে অর্পণ করেন, 'চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান' তাহারই ফল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাঙ্গালা বানান সংস্কারের যে উদ্‌যোগ হয়, এ প্রবন্ধ তাহার পূর্বেই রচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পিত হয়। 'সর্বভারতীয় লিপি' শীর্ষক প্রবন্ধটি অধিক পুরাতন না হইলেও রচনাকালে ইহার যতখানি মূল্য ছিল আজ সম্ভবতঃ ততখানি নাই, কারণ আজ ভারতের সাধারণ ভাষা ও সাধারণ লিপি নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি লিপি সম্পর্কে একদিন যে বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা থাকায় আগামীকালের পাঠকদের নিকট ইহা কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য বহন করিবে, এমন আশা করা যায়।

আটটি প্রবন্ধের সাতটি সাধুভাষায় লেখা, কেবল একটির ভাষা চলিত, উহা যেমন আছে তেমনই রাখিলাম বদলাইয়া সাধু করিলাম না।

মদীয় অধ্যাপক আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এই গ্রন্থকে যে মর্যাদা দান করিয়াছেন সেজন্য নিজেকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি। ইতি

দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৬। ইংরাজী ১৯৫০ বিনীত

কলিকাতা গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বাগর্থবিজ্ঞান

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ॥

বাক্য ও অর্থের সম্পর্ক নিতান্ত ঘনিষ্ঠ জানিয়াই মহাকবি একদিন পার্বতী-মহেশ্বরকে বাগর্থের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সর্বদা স্থির নহে। বাক্য অনেক সময় অর্থকে অতিক্রম করে, অর্থও সব সময় বাক্যের বন্ধন মানিয়া চলে না।

পশ্চিমের শাব্দিকগণ বাগর্থ-সম্বন্ধের ভঙ্গুরতা দেখিয়া এ বিষয়ে চর্চা করিতেছেন। আমাদের দেশেও কিছু কিছু কাজ হইতেছে। কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতা ও গুরুত্বের অনুপাতে কাজের পরিমাণ অল্প।

ইংরাজীতে বিষয়টির নাম দেওয়া হইয়াছে Semantics বা Rhematology। এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথমটিই অধিকতর প্রচলিত। গ্রীক ভাষায় rhema শব্দের অর্থ 'উক্ত' অর্থাৎ 'যাহা বলা হইয়াছে' এবং semaino শব্দের অর্থ 'সূচিত করা'। এ দেশের শাব্দিকগণ এই বিজ্ঞানটিকে 'শব্দার্থতত্ত্ব' এই বাংলা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 'অর্থতত্ত্ব' শব্দটির দ্বারাই তো সহজে কাজ চলিতে পারে। তবে 'শব্দার্থ' শব্দের ব্যবহার হয় কেন? কারণ, 'অর্থতত্ত্বে'র অন্য অর্থও হইতে পারে এমন আশঙ্কা আছে। Economics সম্পর্কে 'অর্থ' শব্দের বহুল প্রচলন আছে। যেমন,—অর্থনীতি, অর্থশাস্ত্র। এই কারণে 'শব্দ' কথাটিকে অনেকেই বাদ দিতে চান না।

কিন্তু 'শব্দ' কথাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। প্রথমতঃ 'শব্দ' কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা যে অর্থে উহা ব্যবহার করিতে চাই তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা উহার আছে। ঠিক যে কারণে 'অর্থ' শব্দের ব্যবহারে আপত্তি তোলা চলে সেই কারণেই 'শব্দ' কথাটির ব্যবহারেও আপত্তি তোলা যায়। কিন্তু আপত্তির প্রধান কারণ এই যে 'শব্দ' কথাটির মূল অর্থ ধ্বনি। আমরা শব্দকে speech অর্থে ব্যবহার করিতে চাই। অবশ্য সে অর্থেও উহার যথেষ্ট প্রয়োগ আছে এ কথা অস্বীকার করিতেছি না। অধিকতর উপযোগী শব্দ না পাইলে ইহাকেই সানন্দে গ্রহণ করিতাম।

আমাদের প্রস্তাব Semantics-এর বাংলা সংজ্ঞা 'বাগর্থবিজ্ঞান' দেওয়া হউক। Semantics-এর অর্থ the science of meaning। প্রস্তাবিত পরিভাষায় এই অর্থ কি পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে দেখা যাউক।

পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে সকল শব্দের উপযোগিতা সমান নয়। বহুলব্যবহৃত শব্দ অপেক্ষা অনতিপ্রচলিত শব্দ পরিভাষার ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। বস্তুতঃ পরিভাষা একটি চিহ্নমাত্র। এই চিহ্ন যতদূর স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র হয় ততই ভাল। সে হিসাবে 'বাগর্থ' শব্দটির উপযোগিতা 'শব্দার্থ' অপেক্ষা অধিক। 'শব্দার্থ' শব্দের বহুল প্রচলন আছে। বিচ্ছিন্ন ভাবেও 'শব্দ' এবং 'অর্থ'-এর ব্যবহার ভাষায় কিছু অল্প নয়। কিন্তু 'বাগর্থ' শব্দের ব্যবহার অতি অল্পই। অধিকন্তু 'বাক্' বলিয়া কোনো শব্দ বাংলায় পৃথক্ ভাবে ব্যবহৃতই হয় না।

পৃথক্ ভাবে ব্যবহার না থাকিলেও সমাসবদ্ধ পদে বাক্ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 'বাগ্‌বাদিনী' 'বাগ্‌দেবী' আমাদের আরাধ্য দেবতা। সুতরাং বাক্‌শব্দ একেবারে অপরিচিত নয়।

বাক্ শব্দটি আমাদের অভিপ্রেত অর্থ সুন্দররূপে প্রকাশিত করিতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় ওই অর্থেই বাক্ শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। যেমন 'যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ'।

পরিভাষা একটি সংজ্ঞা মাত্র। নিরুক্তি ব্যতীত কোনো সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ নয়। Rhematology-ই বলি আর Semantics-ই বলি, ব্যাখ্যা না দিলে কোনো নামই অভিপ্রেত ভাবটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। তবে যে সংজ্ঞাটি বক্তার অল্পতম আয়াসে অভিপ্রেত ভাবের অধিকতম অংশ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রাখে, পরিভাষা হিসাবে তাহারই যোগ্যতা সর্বাপেক্ষা বেশী। সম্ভবতঃ এই কারণেই Semantics কথাটি Rhematology অপেক্ষা বেশী প্রচলিত হইয়াছে। 'বাগর্থ' শব্দের মধ্যে rhema ও semaino এই দুইটি শব্দের অর্থই অংশতঃ বজায় আছে। সুতরাং এই দুইটি পরিভাষার যে কোনোটি অপেক্ষা বাংলা পরিভাষাটি অধিকতর অর্থ বহন করিবে। সে কারণেও প্রস্তাবিত শব্দটি গ্রহণীয়।

শ্রুতিমাধুর্য পরিভাষার অন্যতম গুণ হওয়া আবশ্যক। যে সংজ্ঞা দুরুচ্চার্য এবং শ্রুতিকটু তাহা সহজে চলে না। 'শব্দার্থতত্ত্ব' অপেক্ষা 'বাগর্থবিজ্ঞান' শুনিতে বোধ হয় ভালই লাগিবে। 'তত্ত্বে'র পরিবর্তে 'বিজ্ঞান' শব্দটি প্রয়োগ করিলে অনুপ্রাসের দ্বারা সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত সুশ্রাব্য হইবে।

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, 'বাগর্থ' শব্দটিকে কালিদাস যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন আমরা প্রায় সেই অর্থেই ইহার প্রয়োগ করিতেছি। 'শব্দার্থ' দ্বারা সে কাজ সুষ্ঠুতররূপে নির্বাহিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কালিদাস 'বাগর্থ' শব্দটি নির্বাচন করিতেন না। একটি মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকে মহাকবি যে শব্দ বসাইয়াছেন তাহা যতদূর সম্ভব ছিদ্রহীন এবং সমালোচনার অতীত করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি নিশ্চয় করেন নাই।

অর্থের পরিবর্তনশীলতা

কোনো ভাষার কোনো শব্দ চিরকাল একই অর্থ বহন করে না। নানা কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হইতে থাকে। ভাষার মূল সূত্র জানিলে এই পরিবর্তনের ধারাটির সন্ধান পাওয়া যায়।

ভাষার সহিত মানবমনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য এই কারণেই একান্ত আবশ্যক। কোনো জাতির সাহিত্য ও ভাষার মধ্য দিয়া তাহার ইতিহাস উদ্ধার করা যেমন অনেকটা সম্ভব হয় তেমনি তাহার সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় জানা থাকিলে সেই জাতির ভাষা অধ্যয়নও সহজ হয়। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বক্তব্যটি পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করি।

ঋগ্‌বেদে 'অসুর' শব্দটি প্রাণদ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সবিতৃ, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা অসুর বিশেষণে সম্মানিত হইয়াছেন। কখনো কখনো দেবতাগণ অর্থে বহুবচনে অসুর শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এতদ্‌ব্যতীত আরও অনেক স্থলে সদর্থে অসুর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অধুনা-প্রচলিত অর্থেও অসুর শব্দ ঋগ্‌বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে বটে তবে তাহা দুই এক স্থলে মাত্র। কিন্তু ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে এবং অথর্ববেদে বর্তমান অর্থে অসুর শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে দেব এবং অসুরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও অসুর পুরাতন অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছে।

পৌরাণিক যুগে অসুর শব্দ পুরাতন অর্থ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া আধুনিক অর্থ (দানব বা রাক্ষস) গ্রহণ করিয়াছে দেখিতে পাই। ইহার ফলে একটি নূতন শব্দ জন্মলাভ করিল। এই নূতন শব্দটি হইতেছে 'সুর'। অসুর এবং দেবের মধ্যে নিয়ত যে যুদ্ধ হইতে লাগিল তাহার ফলে অসুরের অর্থ হইল দেবেতর। অসুর শব্দের প্রথম বর্ণ 'অ' থাকায় এই অর্থ আরও দৃঢ় হইল। এই 'অ'-কে নঞ্‌-সমুদ্ভূত ধরিয়া 'ন সুরঃ' বাক্যে অসুর শব্দের সমাস নিষ্পন্ন হইয়াছে এই অনুমানে 'সুর' শব্দকে বিচ্ছিন্ন করা হইল। এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুর শব্দ দেব অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। প্রাণার্থক 'অসু' হইতে যে অসুর শব্দের উৎপত্তি তাহা লোকের মন হইতে একরূপ মুছিয়া গেল।

প্রাচীন জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের পক্ষে অসুর শব্দের অর্থান্তরলাভের কারণ উপলব্ধি করা বিশেষ কঠিন হইবে না। পারস্যের মজ্‌দা-উপাসক এবং ভারতের বৈদিক আর্যগণের মধ্যে যে যোগ ছিল তাহার প্রমাণ এখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বেদ এবং অবেস্তার ভাষা এবং বিষয়-বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। এই মিলই উভয় জাতির মধ্যে সংযোগের নিদর্শন। মজ্‌দা-উপাসকগণের প্রধান দেবতা অহুর মজ্‌দা বা অহুর। অবেস্তা 'অহুর' এবং সংস্কৃত 'অসুর' অভিন্ন। সেই জন্যই ঋগ্‌বেদের প্রাচীনতর অংশে 'অসুর' দেবতা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

পরবর্তী কালে উভয় জাতির মধ্যে একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। সেই বিরোধ ক্রমশঃ ঘৃণা এবং বিদ্বেষে পর্যবসিত হইল। তাহার ফলেই ভারতীয় আর্যগণ পারসীক আর্যদের দেবতাকে নিজেদের ধর্মশাস্ত্রে ক্রমশঃ দেবতা বলিয়া অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নঞর্থক অসুর (দেবতা নয়) ক্রমশঃ সদর্থক রাক্ষসে পরিণত হইল। এই সম্পর্কে 'বিধবা' শব্দের উল্লেখ সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৈয়াকরণেরা বিধবা শব্দকে নঞর্থক কল্পনা করিয়া 'ধব' এই নূতন শব্দটি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার ফলে 'সধবা' শব্দের উৎপত্তি হইল। রবীন্দ্রনাথ বহুস্বামিকতা অর্থে 'দ্বৈধব্য' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কার্যতঃ শব্দটি নঞর্থক নয়। ইহার মূল এবং ইংরাজী widow শব্দের মূল অভিন্ন। পুরাতন ইংরাজী widewe, ডাচ্ weduwe, জর্মন wittwe, লাটিন viduus এবং গ্রীক eitheos প্রভৃতি শব্দ হইতেও সে পরিচয় পাওয়া যায়।

'অসুর' শব্দের অর্থ হইল রাক্ষস। আবার অন্যদিকে পারসীকগণ হিন্দুর 'দেব' (অবেস্তা 'দএব')-কে তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রে দানব অর্থ দিয়া প্রতিশোধ লইলেন। অবেস্তায় 'দেব' শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস।

ইংরাজী meat শব্দের অর্থ আমাদের জানা আছে মাংস। পুরাতন ইংরাজীতে এই শব্দ খাদ্য অর্থে ব্যবহৃত হইত। যেমন—Thy mete shall be mylk honye and wyne (মধ্য ইংরাজী), It is meat and drink to me to see a clowne (শেক্সপীয়র)। ও দেশের পক্ষে মাংসই প্রধান খাদ্য বলিয়া খাদ্যবাচক meat শব্দটাই ধীরে ধীরে মাংস অর্থ লইয়া বসিল, যদিও প্রবাদে প্রবচনে বাগ্‌বিশেষে পুরাতন অর্থ রহিয়া গিয়াছে। খাদ্যবাচক 'অন্ন' শব্দের বাংলায় 'ভাত' অর্থগ্রহণ তুলনীয়।

উল্লিখিত উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে শব্দের অর্থ স্থান কাল পাত্রাদি অনুসারে পরিবর্তন লাভ করে।

পরিবর্তনশীলতা অনিয়ত

যে কারণে এক শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হইল ঠিক সেই কারণেই যে সকল শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হইবে এমন কোনো মানে নাই। পারসীক 'অসুর' শব্দ বেদে প্রথমে ভাল এবং পরে মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই যে বৈদিক 'দেব' শব্দও অবেস্তায় প্রথমে ভাল এবং পরে বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত হইবে এমন নয়। বস্তুতঃ তাহা হয়ও নাই। অবেস্তার 'দেব' শব্দ পূর্বাপর কেবল 'দৈত্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেবতা অর্থে কোথাও ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না। 'হস্ত' শব্দ হাতীর শুঁড় অর্থে প্রচলিত হইয়াছে, 'শুণ্ড' শব্দ মানুষের হাত অর্থে কেন ব্যবহৃত হইবে না বলিয়া তর্ক করিলে

চলিবে না। মানুষের মন যন্ত্র নয় এবং তাহার কাজকর্মও যন্ত্রের মত সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলে না। ভাষাবিজ্ঞান নিয়ম প্রণয়ন করিয়া ভাষা তৈয়ার করে না, ভাষার গতিপথ অনুসরণ করিয়া কোন্ নিয়মে তাহার কাজ চলিতেছে তাহাই অনুসন্ধান করে মাত্র।

ফারসী 'খুন' শব্দের অর্থ রক্ত। কিন্তু বাংলায় 'খুন' শব্দ হত্যা অর্থেই প্রযুক্ত হয়। তথাকথিত মাদ্রাসা-বাংলার প্রচারক এবং গজল গানের রচয়িতারা 'খুন' শব্দকে রক্ত অর্থে যতই ব্যবহার করুন না কেন অদূর ভবিষ্যতে সাধু বাংলায় ওই অর্থে ইহার ব্যবহার হইবে বলিয়া মনে হয় না; অন্ততঃ এখনো হয় নাই। কেন হইল না বলিয়া কেহ যদি আক্ষেপ করেন তো সে আক্ষেপ নিষ্ফল।

একই মূল হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন ভাষায় কেবল রূপই বদলায় না অর্থও বদলাইয়া যায়। গ্রীক genus (চিবুক) এবং লাটিন gena (গাল) এই দুই শব্দের আকর এক বলিয়াই অনুমিত। ইংরাজী chin শব্দের সঙ্গে যে ইহাদের যোগ আছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইংরাজী chin শব্দের অর্থ চিবুক। Shorter Oxford Dictionary ইহার অর্থ এইভাবে দিয়াছেন, —"The part of the face below the under-lip formed by the prominent extremity of the lower jaw"। ইহা গ্রীক অর্থের অনুবর্তী। জর্মন kinn এবং ডাচ্ kin-এরও একই অর্থ। গথিক kinnus এবং স্কান্দিনেভীয় অনুরূপ শব্দসমূহ লাটিন গণ্ড অর্থকে অনুসরণ করে। সংস্কৃত 'হনু' শব্দটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। ইহার অর্থ চোয়াল। গণ্ড এবং চিবুক অর্থেও 'হনু'র প্রয়োগ দেখি।

কোনো শব্দের অর্থ কেন এরূপ হইল তাহা বলিয়া দেওয়াই শব্দবিজ্ঞানের কাজ। কোনো বিশেষ শব্দের আকৃতি বা অর্থ যদি স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকূল হয় শব্দতাত্ত্বিকগণ হয়তো তাহার কারণও প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু ঠিক অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ শব্দের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হইবে কি না একথা তাঁহারা সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। কোনো ভাষাই সম্পূর্ণ বাঁধাধরা নিয়মে কাজ করে না, করিলে ব্যাকরণে নিপাতন বা আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া কিছু থাকিত না।

বাগর্থ ও চিন্তাধারা

জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা, রুচি ও চিন্তাধারার সহিত ভাষার যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 'পঙ্কজ' শব্দটি প্রথমে পঙ্ক হইতে জাত এই অর্থে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। পরে তাহা পুষ্পবিশেষের বিশেষণরূপেই বহুলভাবে প্রযুক্ত হইতে থাকে। ক্রমশঃ পুষ্পটি উহ্য হইয়া যায় কেবল বিশেষণই

তাহার কাজ চালাইয়া লয়। এইভাবে 'পঙ্কজ' পদ্ম অর্থে প্রচলিত হইয়া গেল। কবির কাব্যে, সাহিত্যিকের রসরচনায়, নাট্যকারের নাটকে শামুক বা গুগলি অপেক্ষা পদ্মেরই আদর এবং প্রয়োগ অধিক, কাজেই উহারা পঙ্কজাত হইলেও পঙ্কজ হইল না।

'আন্নাকালী', 'চায়না' (<চাই না), 'ক্ষান্তমণি' প্রভৃতি শব্দ নামরূপে ব্যবহৃত হইবার মূলে যে কারণটি নিহিত আছে বঙ্গবাসিমাত্রই তাহা জানেন। সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছায়া এই শব্দগুলির উপর কি রকম প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা সুন্দররূপে দেখা যায়। কৌলীন্যপ্রথার যুগে বহুকন্যার পিতা হওয়ার মত দুঃখ আর কিছু ছিল না। কুল গেলেও কৌলীন্য যায় না। তাই নবজাত দুহিতাকে 'চাইনা' বলিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করা হয়। অবশ্য শিক্ষিত ভদ্রসমাজ হইতে এই ধরনের নামকরণ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে।

আবার 'কেনারাম', 'ফেলারাম', 'তিনকড়ি', 'এককড়ি' প্রভৃতি শব্দ এবং উহাদের অর্থ পর্যালোচনা করিলে সমাজ-মানসের আর একটা দিক্ প্রতিফলিত হয়। বন্ধ্যা এবং মৃতবৎসা নারীর নিকটে পুত্রের জন্ম ও দীর্ঘজীবন যে কিরূপ কামনীয় এই শব্দগুলি তাহারই পরিচয় দেয়। যাহার কোনো সন্তান নাই বা যাহার সন্তান হইয়া বাঁচে না, একটি কন্যা আসিলেও সে অনাদর করিতে ভরসা পায় না। সেইজন্য কন্যার নামও 'থাকমণি' দেওয়া হয়। এইসব নামের মধ্যে একটি অন্ধসংস্কারের ইতিহাসও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 'কাঙালী', 'মেথরা', 'গুয়ে' প্রভৃতি গ্রাম্য নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১]

বিদেশ যাত্রাকালে আমরা যখন গুরুজনদের প্রণাম করি তখন তাঁহারা 'এস' বলিয়া বিদায় দেন। এই 'এস' শব্দ যাও অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন বাংলা 'মেলানি' শব্দটিও ওইরূপ। 'বাড়ন্ত' বলি একই কারণে। এগুলিও সামাজিক অবস্থা এবং সমাজের চিন্তাধারার পরিচয় দেয়।

কালপ্রভাব

কোনো বিশেষ শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইবার মূলে যে সকল কারণ ক্রিয়া করে, সময় তাহাদের অন্যতম। আমরা বন্ধুজনবিচ্ছেদকে চিরকালই অশুভ মনে করি। তাহার কারণও সুস্পষ্ট। প্রাচীনকালে যানবাহনাদির অসুবিধা এবং দস্যুতস্করের ভয়বশতঃ লোকে একবার বিদেশ যাত্রা করিলে আত্মীয়স্বজন তাহার প্রত্যাগমনের আশা একরূপ ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু ছাড়িয়া দিব বলিলেই তো মা পুত্রের আশা, স্ত্রী স্বামীর আশা আপনাপন হৃদয় হইতে একেবারে নির্মূল করিয়া দিতে পারেন না। পাইব না—এই আশঙ্কা হয় বলিয়াই পাইবার

১. নামরহস্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কামনা আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপ যখন মনের অবস্থা, তখন দেখা গেল লোকে প্রিয়জনের বিদায়কালে বারংবার ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। সেই ফিরিয়া আসিবার জন্য যে অনুরোধ উপরোধ তাহারই বাড়াবাড়িতে যাইবার অনুমতি চাপা পড়িয়া গেল। লোকে দেখিল যাইবার কথা তো কেহ উচ্চারণ করে না। যেখানে 'যাও' বলিবার কথা, সেখানে 'এস' বলাটাই রীতি হইয়া গেল। এই রীতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া না আসিলে আজিকার দিনে হয়তো জন্মলাভ করিত না।

একদিন টাকার কাজ কড়ি দিয়া চলিত। আজ লক্ষ্মীর ঝাঁপির বাহিরে কড়ির মুখ দেখা যায় না। কিন্তু ভাষায় তাহার কায়েমী স্বত্ব রহিয়া গিয়াছে। আমরা বলি, 'লাগে কড়ি দিবে গৌরী সেন'। বলি, 'ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর'। 'টাকা কড়ি' যাহার অঢেল. খুঁজিয়া দেখুন তাহার ঘরে কয়টা কড়ি পান। যাহার হাতে 'পয়সা কড়ি' আছে বলিয়া আপনার ধারণা তাহার হাতে 'এক কড়া কড়ি'ও পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নূতন শব্দ বা পুরাতন শব্দের নূতন অর্থ উৎপত্তির মূলে উপযুক্ত কালের অনেকখানি কর্তৃত্ব আছে। টাকার বাজার হইতে 'আনা'র নির্বাসন ঘটিয়াছে, কিন্তু পুরাপুরি অর্থে ষোল আনা আজও আছে, আগামী কালও থাকিবে।

বাগর্থ ও ব্যাকরণ

পূর্বেই বলিয়াছি জীবন্ত ভাষা সর্বথা এবং সর্বদা ব্যাকরণ মানিয়া চলে না। যে ভাষা অন্ধের মত ব্যাকরণকে সর্বথা অনুসরণ করিয়া চলে সে ভাষার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃতই তাহার প্রমাণ। অথচ প্রাকৃত ভাষা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া আজ পর্যন্ত সজীবতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

দান অর্থে অনেকে 'অবদান' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। অনেক স্টুডিওর 'নবতম অবদান'-এর বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে। প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকগণ ব্যাকরণের অননুমোদিত পদও ভাষায় ব্যবহার করেন। তথাকথিত অশুদ্ধ পদও বিশেষ বিশেষ অর্থে চলিত হইয়া যায়। বাংলায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত বরুণ-পত্নী অর্থে 'বারুণী' ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ গাহিব অর্থে গাইব ব্যবহার না করিয়া কোনো কোনো স্থলে 'গাব' [১] লিখিয়াছেন। দিলীপকুমার রায়ের রচনায়

১. গাব। ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষে গাহ্ ধাতুর সাধু ভাষায় রূপ হইবে 'গাহিব', চলিত ভাষায় রূপ হইবে 'গাইব'। মূল ধাতুর হ চলিত ভাষায় লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু ই থাকে। ওইরূপ নাহ্ হইতে 'নাইব', সহ্ হইতে 'সইব' ইত্যাদি। কিন্তু মূল ধাতুতে হ না থাকিলে অন্যরূপ হইবে। যেমন, পা ধাতু হইতে 'পাব', যা ধাতু হইতে 'যাব' ইত্যাদি। 'যাব' 'পাব' প্রভৃতি পদের সাদৃশ্যে 'গাব' 'নাব' এইরূপ লিখিলে চলিত ব্যাকরণের বিচারে ভুল বলিয়া গণ্য হইবে।

গাইতে-র স্থলে 'গেতে'[১] দেখিয়াছি। শরৎচন্দ্র লইয়াছি স্থলে 'নিয়াছি'[২] প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্তঃসলিলা অর্থে অনেক স্থলে 'অন্তঃশীলা' ব্যবহৃত হইয়াছে। জিজ্ঞাসু অর্থে কেহ কেহ 'প্রশ্নিল' লিখিয়াছেন। 'সর্পিল'-এর দেখাদেখি নিশ্চয়। উল্লিখিত পদগুলি অধুনা-প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অচল হইলেও পরবর্তী-কালে যে ব্যাকরণ রচিত হইবে তাহাতে শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই কারণেই কবি বলিয়াছেন ঃ

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি ॥

অর্থ-পরিবর্তন

মনের সহিত বাক্যের সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রগাঢ় তাহা জানিলে অর্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রণালীর অনুসরণ করা সহজ হইবে। সেই জন্যই এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইল। আমরা দেখিলাম দেশ, কাল, পাত্র এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অবস্থা মনের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, শব্দের অর্থও সেইভাবে পরিবর্তিত হইতে থাকে।

অর্থ-পরিবর্তনের মোটামুটি তিনটি ধারা আছে : ১. সম্প্রসারণ, ২. সংকোচন, এবং ৩. আরোপণ।

অর্থ-সম্প্রসারণ

যে শব্দের যখন উৎপত্তি হয় তখন তাহার একটি স্বতন্ত্র অর্থ থাকে। সেই শব্দটি তখন বিশেষ কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নিয়োজিত হয়। কালক্রমে দেখা যায়, সেই শব্দ পুরাতন অর্থের বন্ধন না মানিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও নূতন অর্থ অধিকার করিয়া বসে। ইহাকেই অর্থ-সম্প্রসারণ বলা যায়।

কপাল বলিতে ললাট বুঝায়। ওই অর্থেই প্রথমে 'কপাল' শব্দের ব্যবহার হইলেও পরে উহা 'অদৃষ্ট' এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুদের সংস্কার এই যে, মানুষের জীবনে যাহা ঘটিবে, বিধাতাপুরুষ তাহা জীবনের প্রারম্ভেই ললাটে

১. গেতে। ব্যাকরণ অনুসারে 'গাইতে' হওয়া উচিত।

২. ল-ধাতু সাধুভাষার ধাতু, ইহার চলিত রূপ নি। -ইয়াছি সাধুভাষার বিভক্তি, উহার চলিত রূপ -এছি। সুতরাং সাধু ল+ইয়াছি=লইয়াছি এবং চলিত ভাষায় নি+এছি=নিয়েছি। নিয়াছি শব্দে চলিত ধাতুর সহিত সাধু বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে। ইহা ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগ নহে। আবার কেহ যদি সাধুভাষার সহিত চলিত ভাষার বিভক্তি যোগ করিয়া 'লয়েছি' লিখেন, তাহাও গদ্য-ব্যাকরণের নিয়মে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সংস্কারবশতই তাহারা ললাটলিপি বা কপালের লেখা বলিতে অদৃষ্টকেই বুঝিত। পরে লিপি বা লেখা উঠিয়া গেল। শুধু ললাট এবং কপাল অদৃষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। 'এঁঠো' সংস্কৃত আমৃষ্ট হইতে আগত। আমৃষ্টের অর্থ ঘাঁটা বা মাখা, তাহা হইতে অর্থ হইল ভুক্তাবশিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট। ক্রমশঃ ভোজনের পর অধৌত পাত্রাদিও 'এঁঠো'র পর্যায়ে পড়িল। যেমন,—এঁঠো বাসন, এঁঠো হাত। বাংলা দেশে 'এঁঠো' শব্দ কেবল উচ্ছিষ্টার্থক নয়। ইহার আর একটি অর্থ আছে যাহাকে সকড়ি বলা হয়। এখানেও 'এঁঠো' শব্দের অর্থে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। বাংলা 'পরশু' শব্দ অর্থ-সম্প্রসারণের আর একটি নিদর্শন। এই শব্দ সংস্কৃত পরশ্ব (যাহার অর্থ আগামী কল্যের পর দিবস) হইতে আগত। কিন্তু বাংলায় ইহার অর্থ শুধু ভবিষ্যদ্‌বাচী নয় অতীত-বাচকও। আমরা 'পরশু' বলিতে যেমন আগামী কালের পরদিবস বুঝি তেমনই গত কালের পূর্বদিবসও বুঝিয়া থাকি। হিন্দী 'পরসোঁ' শব্দেও ঠিক বাংলার ন্যায় অর্থ সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। ওড়িয়াতে 'পরশু' শব্দের অর্থ বাংলার অনুরূপ। 'বোতল' ও 'গেলাস' আধার-বাচক হইলেও সময়ে সময়ে আধেয়কেও বুঝাইয়া থাকে।

নামবাচক শব্দ বস্তু অর্থে ব্যবহৃত হইলে অর্থের বিস্তার ঘটে। ছেলেরা দুগ্ধাভাবে 'হর্লিক্‌স্' খায়। ব্যাটাভিয়া দেশে উৎপন্ন বলিয়া ফল-বিশেষের নাম 'বাতাবি'। ডি. গুপ্ত ব্যক্তিবিশেষের নাম, তাহা হইতে একটি প্রসিদ্ধ জ্বরের ঔষধ এক সময় ওই নাম পাইয়াছিল। 'দালদা' একটি উদ্ভিজ্জ তৈলের কোম্পানি প্রদত্ত বিশেষ ব্যবসায়িক নাম। এখন 'দালদা' কথাটিকে আমরা উদ্ভিজ্জ তৈলের সাধারণ নাম হিসাবেই ব্যবহার করিয়া থাকি। গঙ্গা নদীবিশেষের নাম, কিন্তু গঙ্গার অপভ্রংশ 'গাঙ্গ' বা 'গাঙ' শব্দের অর্থ নদী অথবা খাল, নদী-বিশেষ নহে।

শুধু নঞ্‌ শব্দের অর্থ কত রকম পরিবর্তন লাভ করে, তাহা লক্ষ্য করিলেই শব্দার্থ-সম্প্রসারণের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নঞ্‌-এর মূল অর্থ 'না'। কিন্তু ক্রমশঃ ওই শব্দ অভাব, অল্পতা, অন্যত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কখনো কখনো নঞ্‌-এর স্বার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। জোরের সহিত 'না' বলায় 'হাঁ' সূচনা করে। দুই নেতিবাচক বাক্য বা শব্দ একত্র মিলিত হইলে সদর্থক হয়—ব্যাকরণের এই যে নিয়ম, ইহার মূলেও বোধ হয় উপরিউক্ত কারণ বর্তমান।

শব্দের সহিত নঞর্থক উপসর্গ এবং প্রত্যয় প্রভৃতির যোগে নেতিবাচক শব্দেরই প্রথম সৃষ্টি হয়। আদি নাই যাহার সে 'অনাদি', সীমা নাই যাহার সে 'অসীম', তল নাই যাহার সে 'অতল,' ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই যাহার তাহার নাম 'অভাব'। এইরূপ জন নাই যে স্থানে তাহা 'নির্জন', যাহা কম্পিত হয় না

তাহা 'নিষ্কম্প'। কড়ি নাই যাহার সে 'নিকড়ে', ঘৃণা নাই যাহার সে 'নিঘিন্নে'। কিন্তু নঞ্-এর অর্থ চিরকাল 'না' রহিল না; ধীরে ধীরে তাহার অর্থ পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

'অভাব' শব্দটির কথাই প্রথমে ধরা যাউক। ইহার মূল অর্থ 'না থাকার ভাব'। যেমন, আলোর অভাব অন্ধকার। কিন্তু এই অর্থ বদলাইয়া অভাবের গৌণ অর্থ হইল 'অল্পতা'। যেমন অন্নের অভাব, ভিক্ষার অভাব, খাদ্যের অভাব ইত্যাদি। আবার তাহা হইতে অভাব শব্দ দারিদ্র্য অর্থেও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। যেমন, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। 'অবুধি', 'অগেয়ানী' 'অবুঝ' প্রভৃতি শব্দের অ অল্পার্থে প্রযুক্ত।

নঞ্ অন্যার্থেও ব্যবহৃত হয়। 'অসুখ' বলিলে বাংলায় শুধু সুখের অভাব বুঝায় না। সুখের অভাব যদি বা বুঝায়, তাহা গৌণতঃ। কিন্তু প্রধান অর্থ হয় 'রোগ'। এইরূপ 'অসিত' অর্থে যাহা সিত বা শ্বেতবর্ণ নহে তাহাই বুঝাইবে এমন নয়। 'অসিত' শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। যথা, অসিতবরণী শ্যামা। 'অপার্থিব' শব্দের অর্থ স্বর্গীয়। 'অলৌকিক' শব্দের অর্থ রহস্যময়।

নঞর্থক শব্দ ও প্রত্যয়াদি যে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহাকে অনেক সময় বিপরীতার্থক করিয়া তুলে। যেমন, 'অমিত্র'। যে মিত্র নয় সে যে শত্রু হইবেই এমন কোনো কথা নাই, তথাপি 'অমিত্র' বলিলে কেবল শত্রুকেই বুঝায়। 'অসুর' বলিলে কেবল সুরবিরোধী রাক্ষস বুঝায়। এখানে নঞ্ বিপরীতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কদর্থে নঞ্ প্রয়োগের অনেক উদাহরণ বাংলায় আছে। 'অঘাট' বা 'আঘাটা' বলিলে খারাপ ঘাট বুঝায়। 'আকাল' শব্দের অর্থও অপ্রশস্ত কাল। 'অকাজ' শব্দ কুকাজ অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'অমানুষ' 'অসময়' 'অপথ' প্রভৃতি শব্দের 'অ'-ও নেতিবাচক নয়, মন্দবাচক। রবীন্দ্রনাথের একটি ছত্র মনে পড়িতেছে :

'অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যান।'

আবার ভারতচন্দ্রের একটি ছত্র উদ্ধৃত করি :

'যত করে মুসলমান সকলি অকাজ।'

'অব্রাহ্মণ' বলিলে অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বুঝায়। 'অকথ্য' শব্দেও নঞের কদর্থ দেখা যায়। 'অনামুখো' যাহার মুখ দেখিলে অমঙ্গল হয়। কোথাও কোথাও নঞ্ অর্থের উৎকর্ষ ঘটায়। 'অনির্বচনীয়' এত সুন্দর যে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। 'অকথ্য' 'অবাচ্য' তুলনীয়। 'অপর্যাপ্ত' পর্যাপ্ত অপেক্ষাও অধিক। 'অসামান্য' 'অসাধারণ' প্রভৃতিও অনেকটা এই পর্যায়ে পড়ে।

মদ্য 'অপেয়' বলিলে পেয় নয় এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। আবার

মন্দ পেয় বলিলেও সুরাপানের যে অপরাধ তাহার গুরুত্ব কমিয়া যায়। এখানে সেই কারণে 'অপেয়' শব্দ নিষিদ্ধ পেয় এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। গোমাংস 'অভক্ষ্য' বলিলেও নিষিদ্ধ ভক্ষ্যই বুঝায়।

খাদ্য পরিবেষণের সময় আমরা যে না বলি তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ কিন্তু সব সময় 'না' নয়। সেইজন্য ব্যাঘ্রঝম্পনের পূর্ব পর্যন্ত ভোক্তার অন্নপাত্রে আহার্য দিবার লৌকিক আদেশ এদেশে প্রচলিত। এইরূপে নঞর্থক শব্দ, প্রত্যয়, উপসর্গ, প্রভৃতির নেত্যর্থ সম্পূর্ণ অপসারিত হইয়া যায়। প্রাচীন বাংলায় এরূপ শব্দের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 'আঘোর পাপে তোর বেআপিল গা।'[১] এখানে 'আঘোর' শব্দের অর্থ ঘোর। 'নাবালক' (আরবী নাবালিগ) শব্দের 'না'-কেও স্বার্থে প্রযুক্ত বলিয়া অনেকে মনে করেন, যদিও সে ধারণা ভ্রমাত্মক।

'আছুক লাভ মোর মূলত আকার'[২]। 'মূলত আকার' ইহার অর্থ 'মূলেই ফাঁক'। √ফার (বিদারণে) হইতে ফাঁক অর্থে ফার শব্দ। আ স্বার্থে প্রযুক্ত। ওইরূপে 'আবাল' বালক অর্থে, 'আবালী' বা 'আবালি' বালিকা অর্থে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় বালিকা অর্থে 'অকুমারী' শব্দের প্রয়োগ সুপ্রচুর। 'অমন্দ' শব্দের মন্দার্থে প্রয়োগও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

অর্থ-সংকোচন

শব্দবিশেষের মূল অর্থের ব্যাপকতা কখনো কখনো কমিয়া যায়। ইহাকেই অর্থসংকোচন বলা হয়।

'অন্ন' শব্দ অদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার মূল অর্থ খাদ্য। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত বলিয়া ক্রমশঃ অন্নের অর্থ সংকুচিত হইতে হইতে এখন কেবল ভাত অর্থাৎ সিদ্ধ চাউলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। 'অন্নপথ্য' তুলনীয়।

'মুনিষ' ও 'মিন্‌সে' মনুষ্য শব্দের অপভ্রংশ হইলেও মানবসাধারণ অর্থে উহাদের ব্যবহার হইবে না।

বাংলায় চলিত বহু বিদেশী শব্দে অর্থসংকোচ ঘটিয়াছে। 'ইস্টিশেন', 'পিওন', 'টিকিট', 'ডাক্তার' প্রভৃতি শব্দ তাহার নিদর্শন। ইস্টিশেন বলিলে সাধারণতঃ railway station, পিওন বলিলে ডাকহরকরা এবং টিকিট বলিলে রেলের টিকিট বুঝায়। doctor শব্দের মূল অর্থ পণ্ডিত। এখন ডাক্তার বলিলে সাধারণতঃ চিকিৎসক বুঝায়। 'পইতা' পবিত্র শব্দের অপভ্রংশ, কিন্তু বহুবিধ পবিত্র দ্রব্যের মধ্যে কেবল উপবীতকেই বুঝায়। 'মৃগ' শব্দ প্রাচীন সংস্কৃতে পশুকে বুঝাইত। মৃগেন্দ্র শব্দে সেই অর্থ এখনো দেখিতে পাওয়া

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

যায়। কিন্তু পরবর্তী কালে মৃগ বলিতে পশুজাতিকে না বুঝাইয়া বিশেষ এক জাতীয় পশুকে বুঝাইল। বাংলাতেও সেই অর্থই প্রচলিত। অবেস্তা ভাষায় 'মরেঘ' শব্দের অর্থ পক্ষিজাতি। এই 'মরেঘ' শব্দ হইতে ফারসী 'মুর্ঘ' শব্দ আসিয়াছে, তাহা হইতেই বাংলা 'মোরগ' এবং 'মুরগী' শব্দের উৎপত্তি। এই 'মোরগ' এবং 'মুরগী' শব্দে অর্থসংকোচন দেখিতে পাই। আজিকার 'কাগজ' বলিলে কেবল খবর কাগজকেই বুঝায়। পূর্ববঙ্গীয় ছাত্ররা খবর কাগজ অর্থে অনেক সময় 'পেপার' বলিয়া থাকেন।

'পাউডার' বলিলে মুখে মাখিবার প্রসাধনচূর্ণ বুঝায়। 'এসেন্স' শব্দের অর্থ সার, কিন্তু বাংলাদেশে 'এসেন্স' বলিলেই পুষ্পসার অথবা একপ্রকার গন্ধদ্রব্যকে বুঝায়। এসব স্থলেও অর্থ সংকুচিত হইয়াছে। ফারসী চাকর শব্দের অর্থ বেতনভুক্ কর্মচারী। কিন্তু চাকর শব্দ কেবল গৃহভৃত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার 'চাকরি' বলিলে শুধু চাকরের কাজ বুঝায় না। 'চাকরে' স্বামী বলিলে কি বুঝায় ?

অর্থ-আরোপণ

কখনো কখনো শব্দের মূল অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া নূতন অর্থ দেখা দেয়। ইহাকে অর্থ-আরোপণ বা অর্থ-বিপর্যয় বলা হয়। 'বুজরুকি' শব্দের অর্থ আমরা জানি ভণ্ডামি এবং 'বুজরুক্' এর অর্থ ভণ্ড, কুটিল বা ছলনাকারী। কিন্তু ফারসী 'বুজুর্গ' শব্দ ('বুজরুক্' যাহার রূপান্তর) ভাল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ সম্মানিত ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানী। 'জ্যেঠামি' শব্দটিও অর্থারোপের দৃষ্টান্তস্থল। সংস্কৃতে 'কৃপণ' শব্দের অর্থ 'কৃপার পাত্র', বাংলায় হইয়াছে ব্যয়কুণ্ঠ। 'ওঝা' (উপাধ্যায়) শব্দের মূল অর্থ পণ্ডিত বা জ্ঞানী, বর্তমান অর্থ রোগ-চিকিৎসক। 'হঠাৎ' সংস্কৃতে বুঝায় অবিমৃষ্যকারিতাবশতঃ ; বাংলায় ইহার অর্থ অকস্মাৎ। 'সহসা' শব্দটিও তুলনীয়।

অর্থপরিবর্তনের কারণ

শব্দের অর্থ যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন লাভ করে, তাহার কারণ কি ? কারণ আছে, কিন্তু সেগুলি মানুষের মনে। মানবমনের চিন্তারাশির সংজ্ঞা এবং সংখ্যা দেওয়া যেমন অসম্ভব, অর্থপরিবর্তনের কারণসমূহেরও ঠিক তাহাই। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে ভাবসংসর্গই (association of ideas) সকল কারণের মূলে ক্রিয়া করে। প্রত্যেক শব্দের মধ্যে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ভাবের আভাস থাকে। কিন্তু শব্দটি শুনিলে প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই যে একরূপ ভাবের উদয় হইবে, এমন নয়। কেহ শব্দটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সব কয়টি ভাবই গ্রহণ করিল, কেহ বা কতকগুলি মাত্র বুঝিতে পারিল, কাহারও মনে আবার

অনুরূপ অন্য ভাবের উদয় হইল। এইগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে অর্থপরিবর্তনের মূলসূত্র কি, তাহা নির্ণয় করা সহজ হইবে।

অনেকগুলি শব্দ আলোচনা করিয়া দেখিলে অর্থপরিবর্তনের কয়েকটি মোটামুটি কারণ নির্ণয় করা চলে, কিন্তু নিঃশেষে সকল কারণ আবিষ্কার করা কখনো সম্ভব হইবে কিনা বলা যায় না। নিম্নলিখিতরূপে কারণগুলির মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়:

১. আলংকারিক প্রয়োগ: (ক) উপমান ও উপমেয় (খ) লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ।

২. সৌজন্য ও শিষ্টাচার: (ক) মুসলমানী আদবকায়দা, (খ) বৈষ্ণবীয় বিনয়।

৩. বক্রোক্তি: (ক) অপ্রিয়তা নিবারণ, (খ) অন্ধ সংস্কার।

৪. ব্যাজোক্তি।

৫. পরিবেশের অনৈক্য (অবস্থাভেদ): (ক) স্থানগত, (খ) কালগত, (গ) পাত্রগত, (ঘ) সমাজগত, (ঙ) বস্তুগত।

৬. ভাবাবেগ।

৭. ব্যষ্টি স্থলে সমষ্টি।

৮. সমষ্টি স্থলে ব্যষ্টি: (ক) দেহের পরিবর্তে অঙ্গের নাম, (খ) এক ঘটনার দ্বারা আনুষঙ্গিক ঘটনার ইঙ্গিত।

৯. অনবধানতা।

১০. অর্থসৃষ্টি।

১১. অর্থের অনির্দিষ্টতা।

১২. গৌণার্থপ্রাধান্য।

১. আলংকারিক প্রয়োগ

আমরা ভাব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার জন্য অনেক সময় বিশেষণ, উপমা প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাকি। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। একই শব্দের মধ্যে একাধিক ভাবের অস্তিত্ব থাকে। বক্তা যখন ভাববিশেষের প্রতি শ্রোতার মন আকর্ষণ করেন তখন এইরূপ বিশেষণ বা উপমার প্রয়োজন হয়। সুশ্রাব্য এবং মনোহারী করিবার জন্যও অলংকার আবশ্যক। এইরূপ প্রয়োগে অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

ভাট মুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখপারাবার ॥—ভারতচন্দ্র

যাঁর নামে পার করে ভবপারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে কর পার ॥—ভারতচন্দ্র
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।—ব্রহ্মসংগীত
অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার।—ধাত্রীপান্না

উপরিউক্ত চারিটি স্থলেই 'পারাবার' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পারাবার শব্দের মূল অর্থ সমুদ্র। সমুদ্রের নাম করিলেই মানুষের মনে নানা ভাবের উদয় হয়। সমুদ্রে জল আছে, তরঙ্গ আছে, মকর কুম্ভীর আছে। সমুদ্র কখনো প্রশান্ত, কখনো বিক্ষুব্ধ। কাহারও নিকটে সমুদ্র মনোহর, কাহারও নিকটে ভয়ংকর। উহা গম্ভীর, গভীর, মহান্, উদার। সমুদ্র নামের সহিত এই সকল এবং আরও নানাবিধ ভাব জড়িত। তাই শুধু পারাবার শব্দে বিশাল জলরাশি বুঝাইলেও উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে 'পারাবার'-এর তিনটি বিশেষ গুণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রথম 'পারাবার' শব্দে আধিক্য বুঝাইতেছে। সমুদ্রে জল অধিক। সেই আধিক্য গুণটার প্রতিই কবির লক্ষ্য। এই কারণে সুখ-পারাবার বলিলে সমুদ্রকে না বুঝাইয়া তাহার একটা বিশেষ গুণকেই বুঝায়। আবার দ্বিতীয় ও চতুর্থ উদাহরণে 'পারাবার' শব্দ দুস্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সমুদ্রের প্রশান্ত মহিমা, গম্ভীর সৌন্দর্য এখানে কবির মনকে আকর্ষণ করে নাই। কেবল উহার সীমাহীন বিস্তারের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য আবদ্ধ। তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'পারাবার' এর গভীরতা এবং গৌণতঃ উহার তারল্য কবির লক্ষ্য। উপমার দ্বারা একই পারাবার শব্দ তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।'—চণ্ডীমঙ্গল

এখানেও 'বিষ' বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। প্রাণের মত প্রিয় বস্তু মানুষের তো আর কিছুই নাই। বিষ সেই প্রাণ নাশ করে। সুতরাং মানুষ তাহাকে অনিষ্টকারী জানিয়া ঘৃণা করে, ভয় করে। আবার হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতি যে সব প্রবৃত্তি মানবের মনকে নিয়ত পীড়িত করে এগুলিও অনিষ্টকারী। 'বিষ' এবং 'দ্বেষ'—অনিষ্টকারিতা ইহাদের সামান্য গুণ। তাই ইহাদের একটা উক্ত হইলেও অন্যটা বুঝাইতেছে। 'মধু' সম্বন্ধেও ওই কথাই বলা যায়। 'মধু' বলিতে উহার প্রধান গুণ মিষ্টতাই কবির লক্ষ্য। 'মুখমিষ্টি' 'ঠোঁটপাতলা' 'হাড় কালি' [১] এই তিনটি কথা দেখুন। প্রথম দৃষ্টান্তে 'মিষ্টি' শব্দটির রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ষড়্‌রসের অন্যতম যে মধুর রস, তাহাকে বুঝাইতেছে না। যে সুন্দর কথা বলে তাহার মুখকে মিষ্ট বলা হয়। 'ঠোঁটপাতলা' লোকের ঠোঁট পাতলা না-ও হইতে পারে। যে ব্যক্তি কথা চাপিয়া রাখিতে পারে না তাহাকে ঠোঁটপাতলা বলা হয়। পাতলা শব্দের ধর্মই এই যে তাহা সহজে

১. যেমন, মাস হয়েছে ভাজা ভাজা হাড় হয়েছে কালি।—ছেলেভুলানো ছড়া।

ছিঁড়িয়া যায় অর্থাৎ তাহা সহজভেদ্য। তাহার দ্বারা কোনো জিনিস আবৃত রাখা নিরাপদ নয়। কারণ আবরণ ভেদ করিয়া তাহা অনায়াসেই বাহির হইয়া আসে। বিপরীত দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, যাহার মধ্য দিয়া কোনো বস্তু সহজে নির্গত হইয়া আসে তাহা 'পাতলা'। সুতরাং যাহার ঠোঁটের মধ্য দিয়া সহজেই কথা বাহির হয় তাহার ঠোঁটকে 'পাতলা' আখ্যা দেওয়া হইল। আবার 'পাতলা' শব্দের মূল অর্থও এই ভাবেই পাওয়া যাইবে। যাহা পত্রের ন্যায় তাহাই পাতলা। হাড় স্বভাবতই শ্বেতবর্ণ। তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, এই কল্পনার মধ্যে অনেকখানি ব্যথার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন। কাঠ আগুনে পুড়িলে কালো হয়। দুঃখও আগুনের সমান। তাহার সংস্পর্শে দেহমধ্যস্থ অস্থি কালো হইয়াছে, এই কল্পনাই 'কালো' শব্দের অর্থপরিবর্তনে সহায়তা করিতেছে। 'কালি' শব্দের মূল অর্থ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু এখানে যন্ত্রণাক্লিষ্ট। আবার লাল কালি শব্দে 'কালি'র অর্থ আর এক প্রকার। সে আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে।

(ক) উপমান এবং উপমেয় ॥ উপমার দ্বারা উপমেয় যেমন অর্থ পরিবর্তন করে উপমানের অর্থও তেমনি বদলাইয়া যায়।

আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে।—ব্রহ্মসংগীত

এখানে অমৃত শব্দে চন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং উপমান 'চন্দ্র' উহ্য থাকিলেও চন্দ্র যে অমৃতার্থক বা অমৃতময় তাহা পাঠকের বুঝিতে বিলম্ব হয় না।[১]

'আকাশ' শব্দের উল্লেখ থাকাতে অমৃতকে একবার উপমেয় বলিয়া ধরিলাম। আবার 'আনন্দ' শব্দের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে হইলে অমৃত উপমেয় নয় উপমান।

'নুন খাই যার গুণ গাই তার' এই প্রবাদ বাক্যে 'নুন' উপমান; উপমেয় ক্ষুদ্র উপকার বা ওইরূপ অন্য কোনো শব্দ উহ্য। কিন্তু সেই উহ্য উপমেয়ের দ্বারাও 'নুনে'র বাচ্যার্থ বদলাইয়া গিয়াছে। এখানে 'নুন'-এর অর্থ অতি তুচ্ছ সাহায্য।

আবার পরস্পরের সাহচর্যে উভয়েই অর্থ বদলায়। তবলার বাদ্য শুনিতে শুনিতে যখন বলি—তবলচির হাতখানি মিঠে, তখন 'হাত'-এর অর্থ বাদ্যধ্বনি এবং 'মিঠে'র অর্থ শ্রুতিসুখকর।

(খ) লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ ॥ মূলকথা শব্দের শক্তি অসীম। একই কথার মধ্যে অসংখ্য ভাবের ব্যঞ্জনা থাকে। বাচ্যার্থ ব্যতীতও অন্যান্য যে সব অর্থ প্রতি শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে আলংকারিক প্রয়োগের দ্বারা সেগুলি প্রকাশিত হয়। তখনই শব্দের নূতন অর্থ জন্মলাভ করিল বলা যায়।

১. 'সুধাকর' প্রভৃতি চন্দ্রার্থক শব্দও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে অর্থ ত্রিধা বিভক্ত : বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ।

আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

এই ছত্রে 'ডাল' বাচ্যার্থে বৃক্ষশাখা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার

যে ডালে করোঁ মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞা পড়ে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

এখানে 'ডাল' শব্দ বৃক্ষশাখা না বুঝাইয়া ব্যঞ্জনার দ্বারা 'আশ্রয়' এই অর্থ বুঝাইতেছে।

পাখীর পক্ষে ডাল আশ্রয়। এস্থলে পাখীর নাম না থাকিলেও 'ডাল' শব্দের দ্বারা আশ্রয় এই ভাবটি বুঝিবার পক্ষে কোনো বাধা হয় না। এখানে ডালের যে অর্থ তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলা হয়।

'বৈকুণ্ঠ' শব্দে বিষ্ণুলোক বুঝি। কিন্তু 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!' রবীন্দ্রনাথের এই ছত্রে বৈকুণ্ঠ শব্দে বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণকে বুঝাইতেছে।

বাচ্যার্থ ব্যতীতও শব্দের লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশের শক্তি আছে বলিয়াই উপমার দ্বারা শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়।

২. সৌজন্য ও শিষ্টাচার

বয়স্ক এবং মান্য ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপে অনেক সময় শব্দের মূল অর্থ বদলাইয়া যায়। মধ্যম পুরুষে গৌরবার্থক যে সর্বনাম পদটি আমরা ব্যবহার করি তাহার মূল অর্থ অন্য রকম ছিল। 'আপনি' শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলজনক। সংস্কৃত আত্মন্ শব্দ হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, আত্মন্ শব্দের অর্থ নিজ।[১] আপন-পর, আপন-খাওয়া, আপনা-আপনি প্রভৃতি কথায় 'আপন' বা 'আপনি' শব্দের মূল অর্থ এখনো বর্তমান। প্রাচীন বাংলায় নিজ অর্থেই বরাবর 'আপন' শব্দের ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক অর্থে ওই শব্দের ব্যবহার অধিক দিন আরম্ভ হয় নাই।[২]

(ক) অপণে অপা বুঝ তু নিঅ মণ।—চর্যাপদ
(খ) অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।—চর্যাপদ
(গ) আপণে মেলিব আসি নাগর কাহ্নে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
(ঘ) আপণা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে আণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে 'আপণ' শব্দের কয়েকটি প্রয়োগ উদ্ধৃত করা হইল। (ক) চিহ্নিত উদাহরণে মধ্যম পুরুষ সর্বনাম 'তু'-এর সহিত আপন শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। আপন শব্দের অর্থ নিজ বা নিজে। সুতরাং তিনি

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থের ৮৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. হিন্দী 'আপ্' শব্দ প্রথম পুরুষেও ব্যবহৃত হয়। 'আপ্ কৌন্ হৈঁ' বলিলে 'আপনি কে' এবং 'ইনি কে' দুই-ই বুঝাইতে পারে।

নিজে, আমি নিজে, প্রভৃতি অর্থে সকল পুরুষের সর্বনামের সহিতই ইহা ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিন্তু মধ্যমপুরুষের সর্বনামের একটা বিশেষ গুণ এই যে, কথোপকথনের কালে উহা উহ্য থাকিলেও অর্থ-প্রকাশের পক্ষে কোনো বাধা জন্মে না। কখন আসিয়াছ ?—বলিলে তুমি কথাটি উচ্চারণ করা অনাবশ্যক। কিন্তু কখন আসিয়াছে ?—বলিতে হইলে কর্তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। কথাবার্তার সময় মধ্যম পুরুষের কর্তা সাধারণতঃ একজনই হইয়া থাকে। প্রথম পুরুষের কর্তা অনেকে হইতে পারে। এই কারণেই মধ্যম পুরুষের কর্তার সহিত 'আপনি' শব্দ প্রযুক্ত হইতে হইতে কর্তা স্বয়ং উহ্য হইয়া গেল এবং 'আপনি' একাই তাহার অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে 'আপনি' নিজেই মধ্যম পুরুষের সর্বনাম-রূপে নূতন অধিকার গ্রহণ করিয়া বসিল, কিন্তু 'নিজ' অর্থও ত্যাগ করিল না।

'আপনি' করিলে দূর আপন মহত্ব।—চণ্ডীমঙ্গল
আপন সাক্ষীতে সাধু হারিল 'আপনি'।—অন্নদামঙ্গল

উপরিউক্ত উদাহরণ দুইটিতে নিজ অর্থেই 'আপনি' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। তবে ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং অন্বয় দেখিয়া গৌণ অর্থটি 'তুমি' অথবা 'সে' তাহা নির্ণয় করা যায়। এখানেও দেখি একলা 'আপনি' তুমি অর্থে বসে নাই।

পরিচয় দেহ আগে কে বট 'আপনি'।—অন্নদামঙ্গল
শিব যদি যান কভু কুচুনির বাড়ী।
ভাবহ 'আপনি' কত কর তাড়াতাড়ি॥—অন্নদামঙ্গল

উল্লিখিত দুইটি উদাহরণে 'আপনি' আর একটি আপন শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকেও বসিয়াছে এবং একাকীই তুমি অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য অন্বয় এবং ক্রিয়াপদের দ্বারাই তাহা বুঝা যাইতেছে। প্রথম উদাহরণের 'বট' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'কর' এই দুই ক্রিয়া মধ্যম পুরুষের পদ।

তুমি অর্থ কোনো রকমে প্রকাশ করিলেও গৌরবসূচক অর্থ এখনো পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু সাহিত্যে না প্রবেশ করিলেও ভাষায় ইহার নূতন অর্থ সম্ভবতঃ ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছিল।

গুরুজনকে কিংবা মান্যব্যক্তিকে প্রথম পুরুষে মহাশয় বা ওইরূপ কোনো শব্দের দ্বারা সম্বোধন করার রীতি সংস্কৃতে আছে। 'ভবৎ' শব্দের ব্যবহারই তাহার প্রমাণ। ইংরাজী your honour-ও ওই ধরনেরই প্রয়োগ। পল্লীগ্রামে এখনো শুনি ;—'মশায়ের নিবাস ?'—অর্থাৎ আপনার বাড়ি কোথায় ? 'কবে আসা হল ?' 'এখন কি করা হচ্ছে ?'—প্রভৃতি প্রয়োগে 'তুমি' কথাটি উচ্চারণ না করিয়া কাজ চালাইয়া লইবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস অনেক সময় প্রকট হইয়া পড়ে। যখন শ্রোতাকে তুমি বলিলে শ্রোতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, আবার আপনি বলিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিবার মত উদারতাও যখন বক্তার থাকে না, তখনই

ভাববাচ্যে বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভাববাচ্যে ক্রিয়ার রূপ প্রথম এবং মধ্যম পুরুষে সমান থাকে বলিয়াই এইরূপ প্রয়োগের প্রচলন।

গৌরবে মধ্যম পুরুষকে প্রথম পুরুষের শব্দের দ্বারা সূচিত করার পদ্ধতি উর্দু ভাষাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। 'হুজুর'[১] শব্দের প্রয়োগ তাহার দৃষ্টান্ত।

বাংলায় 'তুমি'র পরিবর্তে 'আপনি' ব্যবহারের মূলে এইরূপ একটা সম্ভ্রম এবং শিষ্টাচারের ভাবই ক্রিয়া করিয়াছে। আর 'আপনি' শব্দটা তৎপূর্বে ভাষায় 'তুমি আপনি' রূপে 'তুমি'র সহিত ব্যবহৃত হইতে থাকায় মধ্যম পুরুষের ভাবও প্রকাশ করিতেছিল। সুতরাং ওই অর্থে সহজেই প্রচলিত হইয়া গেল। কিন্তু মূলে যে আপনি প্রথম পুরুষের শব্দ তাহা উহার ক্রিয়া পদ হইতেই বুঝা যায়।
'তিনি' শব্দ যে-ক্রিয়াপদ গ্রহণ করে, 'আপনি' শব্দের পাশেও ঠিক সেই পদ বসে। যেমন, 'তুমি কর'। কিন্তু 'তিনি করেন' এবং 'আপনি করেন'। 'তুমি যাবে'। কিন্তু 'তিনি যাবেন' এবং 'আপনি যাবেন'। 'তুমি দেখছ'। কিন্তু 'তিনি দেখছেন' এবং 'আপনি দেখছেন'।

পত্রের পাঠে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা অধিকাংশ স্থলেই কেবল রীতি-রক্ষার প্রয়োজনে। মুখোমুখি দেখা হইলে যাঁহাকে একটি মাত্র প্রণাম করি, চিঠিতে তাঁহাকে 'শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম' জানাই। যাঁহাকে 'মান্যবর' বা 'মাননীয়' বলিয়া সম্বোধন করি তিনি যে প্রকৃতই সম্মানের অধিকারী একথা আমরা ভাবি না। এই সকল শব্দ সম্ভ্রম, সৌজন্য, বিনয় এবং শিষ্টাচারবশতঃ অর্থ পরিবর্তন করিয়াছে। ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষে আমরা যখন কাহাকেও আহারের নিমন্ত্রণ জানাই তখন 'শাকান্নে'র আয়োজন হইয়াছে এই কথাই বলি। কিন্তু মুখ ফুটিয়া যাহাই বলা হউক না কেন শ্রোতার কাছে তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। তাহা না হইলে আহ্বানকারীর গৃহে অতিথি সমাগম হইত কি না সন্দেহ। আমরা যখন 'চা'-এর নিমন্ত্রণ করি তখন শুধু চায়ের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হই না। একালকার নিমন্ত্রণপত্রে সরকারী অতিথিনিয়ন্ত্রণ আইনের উল্লেখ থাকিলেও ভোজনপাত্রে নিরন্তর তাহার অর্থান্তরন্যাস ঘটিতেছে।

(ক) মুসলমানী আদব-কায়দা॥ মুসলমান জাতি শিষ্টাচারের জন্য বিখ্যাত। বক্তা যখন শ্রোতাকে নিজের বাড়ির কথা বলেন তখন তাহা হয় 'গরীবখানা',

১. রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতায় এই ধরনের একটি প্রয়োগ দ্রষ্টব্য :

এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্, 'সম্রাটে'র ছিল এ সাধনা।

'তুমি' দিয়া কবিতা আরম্ভ করিয়াও কবি তোমার অর্থে 'সম্রাটের'—এই প্রথম পুরুষের পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রোতার বাটী 'দৌলতখানা' বলিয়া বর্ণিত হয়। কার্যতঃ 'গরীবখানা'ও প্রাসাদ হইতে পারে এবং মৃৎকুটিরের পক্ষেও 'দৌলতখানা' আখ্যা লাভ বিচিত্র নয়। বক্তা 'আরজি' করেন এবং শ্রোতা 'ফরমাশ' করেন। আইন সংক্রান্ত শব্দগুলি মুসলমানী রীতির প্রভাবে অনেক স্থলে অর্থ পরিবর্তন করিয়াছে। তাই আমরা আবেদনপত্রে 'অধীনে'র নিবেদন জানাই। সরকারী দরখাস্ত প্রভৃতিতে ইংরাজীর ক্ষেত্রেও এই রীতি।

(খ) বৈষ্ণবীয় বিনয়॥ বৈষ্ণবগণের বিনয় অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তাই কেহ কেহ বৈষ্ণবীয় বিনয়কে 'বিনয়তা' বলিয়া পরিহাস করেন। আধিক্যতা (> আদিখ্যেতা)র সাদৃশ্যেই এই পদের উৎপত্তি হইয়াছে কি না জানি না। মহাপ্রভুর 'দাসানুদাস'গণ যখন শিষ্যের বাড়িতে 'পায়ের ধুলো দেন' তখন অন্ততঃ পাঁচ সাত 'মূর্তি'র দর্শন পাওয়া যায়। 'ভোগ' প্রস্তুত হইলে রাধাশ্যামকে 'ভোগ দেখাইয়া' তাঁহারা 'সেবা করেন'। পাতে কিছু থাকিলে গৃহস্থ 'প্রসাদ পায়'। পাপী তাপী উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের 'আবির্ভাব' হয়। 'লীলাবসানে' তাঁহারা 'দেহরক্ষা করেন' বা 'তিরোহিত হন'। আমরা সাধারণ জীব—'জন্ম' 'মৃত্যু'র হাত হইতে কখনো নিষ্কৃতি পাই না।

'বৈষ্ণবীয় বাংলায়' বিনয় এবং গৌরব দুইই আছে। অপরের সম্বন্ধে গৌরব এবং নিজের প্রসঙ্গে বিনয় রক্ষা করিতে হইবে—কথাবার্তার কালে বক্তার এই সচেতন ভাব ভাষার মধ্যে কতকগুলি শব্দের অর্থ পরিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু এ ধরনের প্রয়োগ সাধারণতঃ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। তবে কোনো বিশেষ সম্প্রদায় যখন সমগ্র জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন সেই জাতির ভাষাও সমগ্রভাবেই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

৩. বক্রোক্তি

সোজাসুজি না বলিয়া প্রকারান্তরে যে কথা বলা হয় তাহাকেই বক্রোক্তি বলা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে দীক্ষাদানকারী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে পরিহাসছলে 'কানফুঁকা বাবাজী' বল হইয়া থাকে। 'কানফুঁকা' শব্দের অর্থ—কানে যে ফুঁ দেয় অর্থাৎ ফিসফিস করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করে। ইহা একটি বক্রোক্তির উদাহরণ। মুরগীর স্থলে 'রামপাখী', শুয়ারের স্থলে 'শুঁড়কাটা হাতী' প্রভৃতি শব্দের মধ্যেও বক্রোক্তি আছে।

(ক) অপ্রিয়তা-নিবারণ॥ পরিহাসের উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে ঘুরাইয়া কথা বলা হয় বটে, কিন্তু বাক্যে রূঢ়তা এবং অপ্রিয়তা নিবারণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্রোক্তির মুখ্য কারণ। সত্য হইলেও অপ্রিয় কথা বলিতে নাই—এই উপদেশটি বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেই পালন করেন। তাহার ফলে অনেক শব্দ আক্ষরিক অর্থ

পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রিয়জনের বিদায়কালে 'এস' শব্দ যাও অর্থ সূচনা করে। প্রাচীন বাংলার মিলনার্থক 'মেলানি' শব্দ বিদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'হরিজন', 'দরিদ্রনারায়ণ', 'নমোশূদ্র'[১] প্রভৃতি শব্দের মধ্যে একটি সহৃদয়তার ভাব লক্ষ্য করা যায়। যে মনোবৃত্তির প্রভাবে অন্ধকে অন্ধ এবং খঞ্জকে খঞ্জ বলিতে দ্বিধা বোধ করি, এই শব্দগুলির মূলেও সেই মনোভাব বর্তমান। কলিকাতায় ঝাড়ুদারকে 'জমাদার' বলিয়া সম্বোধন করি। সমগ্র বাংলা দেশে পাচককে 'ঠাকুর' বলিয়া ডাকা হয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাচক ব্রাহ্মণ 'মহারাজ' সম্বোধনে আপ্যায়িত হন। পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষে এবং ওড়িশায় পাচক ব্রাহ্মণকে 'পূজারী বামুন' বা শুধু 'পূজারী' বলিয়া ডাকা হয়। দাসীকে দাসী বা চাকরানী বলিয়া ডাকি না। বলি 'ঝি'। এই ঝি শব্দ দুহিতা হইতে আগত, অর্থ কন্যা। 'শালা' কথাটাই এমন অসামাজিক হইয়া উঠিয়াছে যে স্ত্রীর ভাইকেও শালা না বলিয়া সম্বন্ধী বলি। রাগ করিয়া যাহার সম্বন্ধে শালা বলিবার ইচ্ছা হয় অথচ শালা উচ্চারণ করিতে বাধে তাহাকে 'ব্রাদার-ইন-ল' বলিয়া দুই কুল রক্ষা করি। ৫. (ঘ) দ্রষ্টব্য।

ঘুষ অনেকে দিয়া থাকেন, সুবিধা পাইলে লইতেও আপত্তি করেন না। কিন্তু ভদ্র সমাজে সে কথা উচ্চারণ করিলেই যত গণ্ডগোল। তাই বড়বাবুকে 'ভেট' দিই এবং কর্মচারীদিগকে 'পান' খাইবার জন্য কিছু দিয়া থাকি। বকশিশ অর্থে 'পান' তো চলেই, আজকাল 'চা'ও চলিতেছে। 'ঘুষ' শব্দের রূঢ় নগ্নতা নিবারণের জন্য অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ নানা ধরনের উক্তি প্রচলিত আছে। 'সেলামী', 'পাগড়ি' প্রভৃতি শব্দও ওই পর্যায়ের।

দারিদ্র্যের মত কলঙ্ক মানুষের আর কিছুই নাই। তাই ভদ্রসমাজস্থ দরিদ্র ব্যক্তিকে দরিদ্র না বলিয়া 'তাঁহার অবস্থা ভাল নয়' বলি। আবার কন্যার পিতা কৃষ্ণবর্ণ কন্যাকে 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ' বলিয়া ঘোষণা করেন; ইহা হইতে সেই 'আসমান গোলা'র গল্প মনে পড়ে। বুনিয়াদী বংশের দুই বন্ধু। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ নবাব বাদশাহ ছিলেন, বন্ধুদ্বয়ের কিন্তু বংশগৌরব ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। একদিন এক বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—কি দিয়া ভাত খাওয়া হইল? দ্বিতীয়জন উত্তর করিলেন ;—বিশেষ কিছুই হয় নাই, আসমান-গুল্লার চাটনি আর ভুঁইআণ্ডার কাবাব হইয়াছিল। এই দুইটি মাত্র ব্যঞ্জন দিয়াই আহার সমাপ্ত হইয়াছে। বংশমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন বাদশাহ-বংশধর কচু অর্থে 'ভুঁইআণ্ডা' এবং আমড়া অর্থে 'আসমানগুল্লা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

১. এখানে 'নমো' 'শূদ্র'-এর গৌরব বাড়ায় নাই। 'নমোশূদ্র' 'নমো' নামেই অধিকতর প্রচলিত। সংস্কৃত 'নমস্' শব্দের সহিত ইহার কোনো যোগ সম্ভবতঃ নাই। 'শূদ্র' অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতি। সেইজন্য 'নমো'-এর সহিত 'শূদ্র' যোগ করিয়া উহাদিগকে 'শূদ্র'-এর পর্যায়ভুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে।

স্বামী স্ত্রী এদেশে পরস্পরকে নাম ধরিয়া আহ্বান করেন না। তাই একজন যখন অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চান তখন 'ওগো' বলিয়া সম্বোধন করেন। বাঙালী পাঠককে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ওগো' কবিতাটির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। একজন অপরের উদ্দেশ্যে কথা বলিলে 'উনি' 'তিনি' প্রভৃতি সর্বনাম শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আবার পুত্র কন্যার নাম ধরিয়া 'অমুকের বাবা' 'অমুকের মা' বলিয়াও স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর উল্লেখ করেন।

পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকগণ পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপের কালেও 'অমুকের মা' বলিয়া চালান। অনেক সময় 'অমুকের পো' বলিয়া পুরুষকে এবং 'অমুকের ঝি' বলিয়া স্ত্রীলোককে সম্বোধন করা হয় কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে পিতার নাম না করিয়া পদবীর উল্লেখ করা হয় যেমন ;—'দাসের পো' 'ঘোষের ঝি' ইত্যাদি। পিতার পদবীর স্থলে বৃত্তির উল্লেখ করা হয়। যেমন 'ডাক্তারের পো', 'মাস্টারের পো'। এইরূপ প্রয়োগ কখনো কখনো স্বার্থেও হয় অর্থাৎ যে নিজে ডাক্তার এবং যাহার পিতা ডাক্তারি করেন নাই—এইরূপ ব্যক্তিকেও পল্লীগ্রামে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা 'ডাক্তারের পো' বলিয়া ডাকেন।

(খ) অন্ধসংস্কার ॥ অন্ধসংস্কার এবং ভয়বশতঃ অনেক সময় প্রকৃত শব্দের উচ্চারণ না করিয়া অন্য শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুকে বুঝানো হয়। শিশুরা রাত্রিকালে সাপ বলে না, বলে 'লতা'। একই কারণে ব্যাঘ্রের নাম হইল 'দক্ষিণ রায়'। গাছে ভূত আছে না বলিয়া 'দেবতা' আছেন বলা হয়। আমরা বসন্ত রোগকে 'মায়ের অনুগ্রহ' বলিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করি। ওলাউঠার[১] 'ওলাদেবী'ত্বের মূলেও ভয় এবং অন্ধবিশ্বাস পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। ভাঁড়ারে চাল না থাকিলেও 'নাই' বলিতে নাই। নাই বলিলে যদি চিরকালই না থাকে—এই আশঙ্কা। তাই চাল 'বাড়ন্ত' বলিয়া শব্দের প্রকৃত অর্থের বিপরীত অর্থ বুঝাই। সধবা স্ত্রীলোক শাঁখা খুলিয়া রাখেন না, 'ঠাণ্ডা করিয়া' বা 'শীতলিয়া' রাখেন। যেমন,

কঙ্কণাদি আভরণ 'শীতলিয়া' রাখে।—শিবায়ন

'খুলা' শব্দ উচ্চারণ করিলে যদি সত্যই চিরদিনের জন্যই খুলিয়া ফেলিতে হয় এই ভয়ে শাঁখা বা লোহা সম্বন্ধে এই শব্দ ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।[২]

'আন্নাকালী', 'কেলারাম' প্রভৃতি নামের মধ্যেও অন্ধসংস্কারজাত বক্রোক্তির

১. ওলাউঠা। ওলা = নামা (ভেদ), উঠা (বমি)।

২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'শিথিল' শব্দ হইতে উচ্চারণ-সাদৃশ্যে 'শীতল' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনাদের মুখে 'ঠাণ্ডা করা' কথাটি বিশেষ প্রচলিত। দেবতার 'সন্ধ্যারতি' অর্থেও 'শীতল দেওয়া' কথাটির ব্যবহার আছে।

নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টিপাতকারী বা তাহার অমঙ্গলকামীর মৃত্যু কামনা করিয়া অথবা দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া সন্তানের স্বাস্থ্যাদির উল্লেখ করার মেয়েলী প্রথা এদেশে প্রচলিত। তাই আমরা বলি, 'শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে' অমুক ভাল আছে, 'ষেঠের কোলে' অমুকের বয়স এত বৎসর ইত্যাদি। গুজরাট প্রদেশেও এইরূপ একটি রীতি আছে, প্রাসঙ্গিকবোধে তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। যে ব্যক্তির অসুখ হইয়াছে তাহার নাম না করিয়া অনেক সময় শত্রুর অসুখ হইয়াছে এইরূপ বলা হয়। রামের শত্রুর জ্বর হইয়াছে এই কথা বলিলে বুঝিতে হইবে রামের জ্বর হইয়াছে।

যাহা প্রার্থনীয়, নাম করিলে পাছে সে না আসে, এইরূপ আশঙ্কায় নাম ঘুরাইয়া বলা হয়। মেঘ করিলে ছেলেরা শিল পড়িবে না বলিয়া 'খই' পড়িবে বলে। এখানে 'খই'-এর অর্থ ই শিল।

কোনো কোনো জাতির ধর্মবিশ্বাস এমনই উৎকট যে অধর্ম আশঙ্কায় তাঁহারা অনেক কথা উচ্চারণ করেন না। বৈষ্ণবরা নাকি জবাফুলের নাম করেন না। অন্য নাম করিয়া ইঙ্গিতে তাহা বুঝাইয়া দেন। 'কাটা' শব্দ তাঁহাদের উচ্চারণ করিতে নাই। 'কাটা'র স্থলে তাঁহারা 'বানানো' বলেন। এই সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প আছে। 'দুর্গানগরের মাঠে বেলগাছের তলায় একটি ছাগ শিশুকে দুই খণ্ড করিয়া কাটা হইয়াছে। রক্তে মাঠ ভাসিয়া যাইতেছে'—এই ঘটনাটি জনৈক বৈষ্ণব অপরের নিকট বিবৃত করিতেছেন : 'হাতীশুঁড়োর-মা-নগরের মাঠে তেপাতা-গাছের তলায় বাছাকে দু-খানা করে বানিয়েছে। রসায় মাঠ ভেসে যাচ্ছে।' ইহার একটি রূপান্তর আছে। 'হাতীশুঁড়োর-মা-নগরের মাঠের পুবে তেফড়ঙ্গীর গাছের তলায় গোঁসাইকে এমন বানান বানিয়েছে যে গোঁসাই রসে ডগমগ।' অর্থাৎ 'দুর্গানগরের মাঠের পূর্বদিকে বেলগাছের তলায় গোঁসাইকে এমন ভাবে কাটিয়াছে যে গোঁসাই (যেন) রক্তে ডুবিয়া গিয়াছেন।'

৪. ব্যাজোক্তি

কোনো ভাব শ্রোতার মনে ভালরূপে প্রবেশ করাইবার জন্য আমরা অনেক সময় এমন শব্দ ব্যবহার করি যাহার আক্ষরিক অর্থ লক্ষ্যার্থের ঠিক বিপরীত। যে বোকা তাহাকে 'অতিবুদ্ধি' বলা হয়। যেমন, 'অতিবুদ্ধি'র গলায় দড়ি। বাংলায় 'দেড়চালাকি' বলিয়া একটি শব্দ আছে। উহার অর্থ অতি চালাকি বা বোকামি। গুজরাটীতেও 'দোঢ়চতুর' শব্দ অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহাও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। সংস্কৃতে 'মহাব্রাহ্মণ' 'মহাবৈদ্য' প্রভৃতি শব্দে যে অর্থ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাও ব্যাজোক্তিসমুদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। 'বুদ্ধির ডিপো' বলিয়া যাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করি সে ব্যক্তিকে নির্বোধ বলিয়াই মনে করি।

মিথ্যাবাদী লোককে 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' বলিয়া গালাগালি দেওয়া হয়। 'পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ মনে করিবার' জন্য অনেক 'মহাত্মা'কে 'শ্রীঘরে' বাস করিতে হয়। 'মামাবাড়ি'র আদরও তাঁহাদের অদৃষ্টে দুর্লভ নয়। পুলিসের লোক 'পূর্ণচন্দ্র' গ্রহণ করিয়াও 'অর্ধচন্দ্র' দিয়া সম্মানিত করে। 'কালোবাজার'-এর ঠিকানা কি? সে বাজারের রং কি সত্যই কালো?

৫. পরিবেশের অনৈক্য

পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের সহিত শব্দার্থ-পরিবর্তনের সম্বন্ধ খুব নিকট। স্থান-কাল, রীতি-নীতি প্রভৃতি বদলাইলেই শব্দের অর্থও বদলাইয়া যায়।

(ক) স্থানগত॥ উত্তরপশ্চিম ভারতে 'বিচ্ছু' বলিলে 'কাঁকড়া বিছা' বুঝায় আর এ দেশে 'বিছা' শব্দ লম্বা তেঁতুলে-জাতীয় বিছাকেই বুঝাইয়া থাকে। আমাদের 'শাক' এবং হিন্দী 'শাক' (বা সাক) একই শব্দ, কিন্তু অর্থ পৃথক্। আমরা 'শাক' বলিলে 'অপক্ব' পত্র বুঝি, হিন্দীতে উহার অর্থ 'পক্ব' ব্যঞ্জন। পূর্ববঙ্গে 'বালাম' শব্দে এক ধরনের নৌকা বুঝায়। 'বালামে' করিয়া যে চাল আসে তাহাকে পশ্চিমবঙ্গের লোক 'বালাম' চাল নাম দিল। এইরূপে চাল-বিশেষের নামরূপেই 'বালাম' শব্দ প্রচলিত হইতে লাগিল, মূল অর্থ অন্তর্হিত হইল। ফারসী 'দরিয়া' শব্দের অর্থ নদী, বাংলায় 'দরিয়া' শব্দ সমুদ্র অর্থে ব্যবহৃত। কলিকাতা অঞ্চলে অমুকের 'মেয়ে' বলিলে কন্যা বুঝায়, বাঁকুড়া জেলায় স্ত্রী বুঝাইবে। আমরা 'ক্ষীর' বলিলে ঘন দুগ্ধ বুঝি। ভারতের অনেক প্রদেশে পায়স অর্থে 'ক্ষীর' ব্যবহার হয়।

(খ) কালগত॥ এককালে কড়ির দ্বারা ক্রয় বিক্রয় চলিত। তখন 'কড়ি' শব্দ অর্থরূপে ব্যবহৃত হইত। 'নিকড়ে' শব্দে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন 'কড়ি' শব্দ পৃথক্‌ভাবে ব্যবহার করিলে কেবল কপর্দক বুঝায়। 'দুপুর' (দ্বিপ্রহর) বলিলে সাধারণতঃ দিবা দ্বিপ্রহর বুঝায়, কিন্তু মধ্য রাত্রিকে দুপুর রাত বলিলে দোষ হয় না।

কালের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ খুব নিকট। কালের পরিবর্তনে সাময়িক রীতি-নীতির পরিবর্তন হয়। সুতরাং সামাজিক অনৈক্য আলোচনা প্রসঙ্গে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে সেগুলিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

(গ) পাত্রগত॥ একই শব্দ সকলের কাছে সমান অর্থ বহন করে না। বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কার, সভ্যতা অনুসারে শব্দের অর্থান্তর ঘটে। 'ধর্ম' শব্দ শুনিলে গ্রাম্য কৃষক তাহার এক ব্যাখ্যা দিবে, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের নিকট তাহার অর্থ স্বতন্ত্র, ব্রহ্মবাদীর নিকটে একই শব্দের তৃতীয় অর্থ শুনিতে পাওয়া যাইবে। 'সত্যমিথ্যা', 'সুখ-দুঃখ', 'পাপ-পুণ্য', 'ন্যায়-অন্যায়', 'দোষ-গুণ', 'ভাল-মন্দ' প্রভৃতি শব্দের অর্থ সকলের কাছে সমান নয়। সুতরাং জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা যে

সকল বিষয় অনুভব বা উপলব্ধি করিতে হইবে, সে সকল বিষয়ের অনুভূতির মধ্যেও পার্থক্য থাকিবে। আবার জ্ঞান ও বুদ্ধির পার্থক্য যেখানে যত বেশী, সুখ-দুঃখাদির ভাব সম্বন্ধেও ধারণা ততই বিভিন্ন।

অহিংসার বাণী যে সকল ধর্মপ্রচারক প্রথম প্রচার করেন তাঁহাদের 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল তাহা প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে জানা যায়। কিন্তু বর্তমান যুগে যে সকল পুণ্যকামী মৎকুণ-সমাকুল খাটিয়ায় শয়ন করিয়া ওই ক্ষুদ্র জীবগুলিকে স্ব স্ব দেহের শোণিত এবং খট্টাধিকারিগণকে দক্ষিণা প্রদান করেন তাঁহাদের 'জীবে-দয়া' যে কি নিদারুণ তাহা একবার কল্পনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। 'সতীত্ব' শব্দের অর্থ অত্যন্ত সংকুচিত হইয়াছে। যদি কোনো নারী বিবাহিত পতি ভিন্ন অপর কোনো পুরুষের অনুরাগিণী না হন—অন্য বহুবিধ দোষ থাকা সত্ত্বেও তিনি 'সতী' হইবেন। তিনি চোর হইলেও 'সতী', মিথ্যাবাদী হইলেও 'সতী', এমন কি পুত্রঘাতিনী হইলেও 'সতী'। আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু দেহ পবিত্র রাখার জন্য যে আত্মহত্যা তাহাকে আমরা 'মহাপুণ্য' বলিয়া মনে করি। এইরূপ 'কর্তব্যে'র আদর্শ পাত্রভেদে বিভিন্ন। 'সৌন্দর্যে'র আদর্শ রুচিভেদে বিভিন্ন। 'মনুষ্যত্বে'র আদর্শ মনুষ্যভেদে বিভিন্ন।

(ঘ) সমাজগত॥ সামাজিক আচার ব্যবহার সকল দেশে এক প্রকার নয়। সেইজন্য সম্বন্ধ বাচক শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম। ভারতবর্ষে কোনো ব্যক্তি অপরিচিতা কোনো স্ত্রীলোককে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হয় না। এখানে মাতৃ শব্দের ব্যবহার খুব ব্যাপক। আমরা 'ভাই' বলিলে কেবল ভাইকে বুঝি না। বাংলার পল্লীগ্রামে 'বাবু' ও 'ভাই' এই দুই সম্বন্ধে পল্লীবাসীরা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন করিয়া লয়। ইংরাজী brother শব্দও শুধু সহোদর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ইহা এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোককেও বুঝায়। 'শালা' সম্বন্ধ এদেশে পরিহাসের সম্বন্ধ। 'শালা' বলিয়া পরিহাস করিতে করিতে উহা ক্রমশঃ গালাগালিতে পরিণত হইয়াছে। গালাগালিতে পরিণত হইবারও একটা কারণ আছে। এই শব্দটির মধ্যে একটি আত্মাবমাননার ভাব আছে। আমাদের দেশে কন্যাগ্রহণ করাটাই গৌরবের কাজ। কন্যা যে দেয় সে যেন মহা অপরাধী। তাই যখন 'শালা' বলি তখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ভগ্নীকে গ্রহণ করিয়াছি এইরূপ মনোভাববশতঃ নিজে গৌরব বোধ করি এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি লজ্জা ও সংকোচ বোধ করে। পূর্ববঙ্গে বন্ধুরা পরস্পরের মধ্যে 'বেটা' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে 'বেটা' শব্দের এরূপ ব্যবহার করিলে সাধারণের রুচিকে আঘাত করা হইবে। 'শালা' শব্দ বাংলাদেশে গালিবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে হইতে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে এখন পরিচয় দিবার সময়ও অনেকে এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ করেন। ৩. (ক) দ্রষ্টব্য।

সম্ভবতঃ ইহার ফলেই 'সম্বন্ধী' শব্দের অত বেশী প্রচলন। 'শালা'র অর্থ বদলাইয়াছে বলিয়া সম্বন্ধীর অর্থও বদলাইয়া গেল। আমার জনৈক অবাঙালী বন্ধু কোনো ভদ্রলোকের নাম করিয়া একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেই ভদ্রলোক আমার সম্বন্ধী কি না। সে ভদ্রলোকের যে বয়স তাহাতে তাঁহার পক্ষে আমার শ্যালক হওয়া অসম্ভব, তাই বন্ধুর কথাকে অভদ্রজনোচিত পরিহাস বলিয়াই প্রথমে ভাবিয়াছিলাম। পরে বুঝিলাম তিনি নির্দোষ। 'সম্বন্ধী' শব্দ তিনি আত্মীয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

'বউ' শব্দের অর্থ নব-বিবাহিতা কন্যা। কিন্তু 'বউ' শব্দের ব্যবহার শ্বশুরালয়ে অথবা শ্বশুরের দেশে সীমাবদ্ধ। পিত্রালয়ে কোনো কন্যাই বউ নয়, সকলেই 'ঝি'। বিবাহিতা কন্যা এই অর্থ হইতে বউ শব্দ স্ত্রী অর্থও গ্রহণ করিয়াছে। শ্বশুর পুত্রবধূকে 'বউমা' বলেন। আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য বলিয়া ভাশুরও ভ্রাতৃবধূকে 'বউমা' বলিয়া সম্বোধন করেন। অবিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে 'ঠাকুর' বলিলে দেবতা বা ব্রাহ্মণকে বুঝাইবে। কিন্তু শ্বশুরালয়ে 'ঠাকুর' শব্দে শ্বশুরকেও বুঝাইতে পারে। ঠাকুরপো বা ঠাকুরঝি শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য আজকাল শ্বশুরকেও পুত্রবধূরা 'বাবা' বলিয়া থাকেন। ভাশুর সম্মানে শ্বশুরের সমান, তাই তাঁহাকেও 'ঠাকুর' বলার রীতি ছিল এবং এখনো আছে। ভাশুরকে বট্‌ঠাকুর (বড় ঠাকুর), মেজঠাকুর প্রভৃতি আখ্যায় উল্লেখ করা হয়।

জ্যেষ্ঠতাত বাড়ির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। পিতাও তাঁহাকে মান্য করেন। ঠাকুরদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার সহিত যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ কেবল আব্দারের। তাঁহাকে ভয় না করিলেও চলে। কিন্তু জ্যেঠামশায়ের সহিত সেরূপ সম্বন্ধ নয়। এই জন্যই কোনো ছোট ছেলের মুখে বড় কথা শুনিলে তাহাকে 'জ্যেঠা' ছেলে বলি।

এককালে কন্যা নিজে পাত্র পছন্দ করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেন, সেইজন্য পাত্রের নাম হইয়াছিল বর। কিন্তু এযুগে পাত্রই কন্যা পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতেছেন। প্রথা বদলাইয়া গিয়াছে, কাজেই বর শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হইয়াছে।

(ঙ) বস্তুগত॥ আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি তাহাদের আক্ষরিক এবং উদ্দিষ্ট অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে শব্দ পরিবর্তনের আর একটি বিশেষ কারণ দেখা যাইবে।

'কাপড়' শব্দ প্রথমে কার্পাসজাত বস্ত্রকেই বুঝাইত। কিন্তু এখন আমরা রেশমী বস্ত্রকে 'রেশমী কাপড়' এবং পশমী বস্ত্রকে 'পশমী কাপড়' বলি। উপাদান নূতন হইয়াছে কিন্তু পুরাতন উপাদানের নাম বদলায় নাই। আজকাল সধবা স্ত্রীলোকগণ 'সোনার নোয়া' পরিয়া থাকেন। আমরা 'কাঁসার গেলাসে' জল খাই। 'ঘড়ি' শব্দের অর্থ সময় নিরূপণের যন্ত্রবিশেষ। এই নামের পশ্চাতে

একটি ইতিহাস আছে। প্রাচীনকালে ছিদ্রযুক্ত ঘটে বালুকা বা জল রাখিয়া সময় নিরূপণ করা যাইত। এইরূপ ঘটকে ঘটীযন্ত্র বলা হইত। এইরূপে 'ঘটী' শব্দের সঙ্গে সময়জ্ঞাপকতা ভাবের একটা সংযোগ স্থাপিত হইয়া গেল। তাহার ফলে শুধু 'ঘটী' শব্দই কালনিরূপক যন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।[১] বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে স্প্রিঙের সময় নিরূপক যন্ত্র ঘটীকে অপসারিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহার নামটি নিজে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। 'ঘড়ি' ঘটীর রূপান্তর হইলেও তাহার অবয়বগত কোনো সাদৃশ্যই ইহাতে নাই। তখনকার দিনে 'ঘটী'কে ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইয়া যাইবার কথা কেহ কল্পনাও করিত না। আজকাল আমরা 'হাতঘড়ি' 'ট্যাঁকঘড়ি' স্বচ্ছন্দে বহন করি। ফারসী 'পোলাও' শব্দে মাংসমিশ্রিত ভাত বুঝায় কিন্তু আমরা যে 'ছানার পোলাও' খাই তাহাতে ভাতের বা মাংসের কোনো সংস্রবই নাই। 'ঘৃত' বলিলে গবাদি পশুর দুগ্ধজাত এক প্রকার স্নেহদ্রব্যকে বুঝায়, কিন্তু 'ভেজিটেবল ঘি' যে সম্পূর্ণ নিরামিষ তাহা সকলেই জানেন। যে 'তুলি' দিয়া চিত্রকর ছবি আঁকেন তাহা কোনো কালে হয়তো তুলার দ্বারা প্রস্তুত হইত কিন্তু এখন উহা পশুলোম অথবা পাট অথবা নাইলনে নির্মিত হয়, তুলার সহিত উহার কোনো সম্বন্ধ নাই। তৈলসিক্ত কাপড়ের পলিতা দিয়া প্রদীপ জ্বালাইবার প্রথা অতি পুরাতন। ওই পলিতার নাম 'বাতি'। সংস্কৃত বর্তিকা হইতে বাতির উৎপত্তি। 'বাতি' শব্দ ক্রমশঃ পলিতা হইতে প্রদীপ অর্থ গ্রহণ করিল। উহা হইতে আমরা বৈদ্যুতিক আলোকেও 'বাতি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। হিন্দীতেও 'বিজলী বত্তী' বলে।

মোটরগাড়ির প্রচলনের পূর্বে লোকে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইয়া চলিত। মোটরে 'হাঁক' দিবার কোনো প্রয়োজন হয় না, তথাপি বড়লোক মোটর 'হাঁকাইয়া' চলেন। ইংরাজীতেও রেল, মোটর প্রভৃতি যন্ত্রযানের চালনা সম্বন্ধে drive শব্দের প্রয়োগ অনেকটা ওই প্রকারের।

৬. ভাবাবেগ

'মারাত্মক' অপরাধ, 'অসম্ভব' কথা, 'অদ্ভুত' আচরণ, 'ভীষণ' সমস্যা, 'ভয়ংকর' গোলমাল প্রভৃতি কথায় বিশেষণগুলির আক্ষরিক অর্থ যতটা 'ভয়ানক'—ব্যবহারিক অর্থ ততটা নহে। আমরা স্বভাবতই সব কথাকে কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতে চাই। ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, বিরক্তি প্রভৃতি ভাবের আতিশয্য ঘটিলে এইরূপ অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। তাহারই

১. নির্দিষ্ট সময়ে যে পুরু কাংস্যচক্রে হাতুড়ির ঘা দিয়া বাজানো হয় তাহারও নাম 'ঘড়ি'। ক্লক সময় নিরূপণও করে এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজিয়াও থাকে। সুতরাং তাহার পক্ষে 'ঘড়ি' নামটি গ্রহণ করা আরও সহজ হইল।

ফলে উল্লিখিত প্রকারের শব্দসমূহের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যায়। সন্দেশটা কি 'ভীষণ' মিষ্টি! ছেলেটা 'ভয়ানক' দুর্দান্ত হয়েছে! এই ধরনের প্রয়োগ সচরাচর শোনা যায়।

যিনি পত্নীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, তোমার হাতে যদি জল খাই তো 'আমার নামই অমুক নয়,' তাঁহার নাম প্রকৃতই যে বদলাইয়া যায় তাহা নহে, যদিচ পত্নীর হাতের জল রাগ পড়িয়া গেলেই তিনি পান করেন। এই সকল শপথবাক্যের যে জোর, অতিব্যবহারের ফলে তাহা কমিয়া যায়। 'মা কালীর দিব্যি' 'Upon God' প্রভৃতি যে সব শপথবাক্য পথে-ঘাটে শুনিতে পাওয়া যায়, উহাদের উপর আস্থা স্থাপন করে কয়জন?

লোকটা 'দারুণ' খাওয়া খেয়েছে বলিলে 'দারুণ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ রক্ষিত হয় না। মারের চোটে 'পিতার নাম ভুলাইয়া দিবার' কথা তথাকথিত ভদ্রলোকের মুখেও শোনা যায়। 'এসেছ?—তবে আর কি?—একেবারে আমার মাথা কিনেছ।' 'কি করবে?—এই আমার শ্রাদ্ধ!'—প্রভৃতি বাক্যে ক্রোধবশতঃ যে সব কথার ব্যবহার হইয়াছে যথা-অর্থে সেগুলির প্রয়োগ হয় নাই। অতএব বিস্ময়াদি ভাবের উচ্ছ্বাসে যে সকল বাক্য বা শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেই যদৃচ্ছা-বিজল্পিত বচনগুলি কেহ যেন সর্বত্র পরমার্থরূপে গ্রহণ না করেন।

৭. ব্যষ্টিস্থলে সমষ্টি

সন্ধ্যার মূল অর্থ সন্ধিকাল। প্রাতঃ সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, সায়ং সন্ধ্যা প্রভৃতি কথায় সেই মূল অর্থই রক্ষিত হইয়াছে। দুই 'সন্ধ্যা' দুই মুঠা খাই—এরূপ প্রয়োগও বিরল নহে। কিন্তু 'সন্ধ্যা' বলিলে এখন আমরা কেবল দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালকেই বুঝি। এই অর্থে সন্ধ্যা শব্দের সমধিক ব্যবহার উহার অর্থের সংকোচ সাধন করিয়াছে। লিখিবার জন্য আমরা যে কালি ব্যবহার করি তাহা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ—এই কালো রঙের জন্যই উহার 'কালি' নামকরণ, যদিচ লিখিবার কালি ছাড়াও অনেক বস্তুরই রং কালো।[১] মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে স্ত্রীলোকের নামের সহিত 'বাঈ' শব্দ যোগ করার রীতি আছে।[২] যেমন,—মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ ইত্যাদি। ওই সকল দেশের নর্তকীরাও দেশাচার অনুসারে নিজ নিজ নামের সহিত 'বাঈ' শব্দ যোগ করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল পেশাদার নর্তকী বাংলাদেশে আসিয়া নৃত্য গীতের দ্বারা অর্থোপার্জন করিতেন তাঁহারা ওই কারণে 'বাঈ' নামেই পরিচিত হন। 'বাঈনাচ' অথবা 'বাঈজি নাচ' শব্দে তাহা লক্ষ্য করা যায়। 'বাঈ' বলিলে প্রকৃতপক্ষে ওই

১. 'সমষ্টি স্থলে ব্যষ্টি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. যেমন, আমরা দেবী যোগ করি।

সব দেশের সকল রমণীকেই বুঝানো উচিত। কিন্তু তত্তৎদেশের রমণীসমাজের সহিত বাংলা দেশের সম্যক্ পরিচয় ছিল না। বাংলাদেশ উত্তর-পশ্চিমের নারী জাতির একটি সম্প্রদায়কে মাত্র দেখিয়াছিল। সুতরাং সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত যে পদবী, তাহা কেবল সেই সম্প্রদায়েরই পদবী বলিয়া মনে করিয়াছে। 'লালপানি' বলিলে রক্তবর্ণ জলমাত্রকেই বুঝানো উচিত, কিন্তু তাহা না বুঝাইয়া উহা রক্তবর্ণের তরল পদার্থবিশেষকেই বুঝায়। 'কালাপানি'র অর্থ আমাদের কালো জল নয়।

৮. সমষ্টি স্থলে ব্যষ্টি

অনেকের দ্বারা যেমন একের অর্থ প্রকাশিত হয় তেমনি একের দ্বারাও অনেকের অর্থ সূচিত হইয়া থাকে। 'কালি' শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ তরলপদার্থ-বিশেষ। কিন্তু লাল নীল সবুজ প্রভৃতি যে কোনো রঙের তরল পদার্থকেই আমরা 'কালি' আখ্যা দিই। 'বাঈ' শব্দে এক সম্প্রদায়ের নর্তকী বুঝায় সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু আমরা বাঙালী নর্তকীর নাচকেও 'বাঈনাচ' বলি। হিন্দী 'ঢব' শব্দে এক প্রকার চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র বুঝায়। ইহার সহযোগে গীত হইবার জন্য এক প্রকার সংগীতের নাম হইল 'ঢব' বা 'ঢপ' সংগীত। তাহা হইতে অন্যান্য আরও কয়েক প্রকারের সংগীতের 'ঢপ' সংগীত নাম হইয়াছে, যদিচ সে সকল সংগীতে 'ঢপ' যন্ত্র ব্যবহার হয় না। বাংলা দেশের পুলিস কন্‌স্টেবলরা এক সময় লাল পাগড়ি পরিত। শিরোভূষণটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। তাই আমরা লাল পাগড়ি বলিলে পুলিস কন্‌স্টেবল বুঝিতাম। তাহা হইতে 'লাল পাগড়ি' শব্দ আরও ব্যাপকভাবে পুলিস কর্মচারী-মাত্রকেই বুঝাইত। অথচ সকল পুলিস কর্মচারীই যে লাল পাগড়ি পরিত তাহা নয়। তথাপি 'লাল পাগড়ি' বলিলে সকলের কথাই মনে পড়ে। পুলিস বিভাগের মধ্যে 'লাল পাগড়ি' পরিহিত ব্যক্তিদের সহিতই আমাদের পরিচয় ছিল বেশী। পথে বাহির হইলেই তাহাদের দর্শন মিলিত। এই জন্যই অর্থের প্রসার এবং আরোপ দুইই হইয়াছে। সম্প্রতি শিরস্ত্রাণের রং ও রূপ দুই-ই বদলাইয়াছে তবু লাল-পাগড়ি শব্দটা ভাষায় রহিয়া গিয়াছে। একালে নূতন বাজার বসিয়াছে 'কালোবাজার'। তাহার রং কি কালো?

(ক) দেহের পরিবর্তে অঙ্গের নাম॥ অঙ্গবিশেষের নাম করিয়া অনেক সময় সমগ্র দেহকে বুঝানো হয়। এই ধরনের অর্থ-পরিবর্তনও কতকটা উপরিউক্ত শ্রেণীর অনুরূপ।

আমরা যখন কাহারও 'শ্রীচরণ' দর্শন মানসে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়ি তখন শুধু শ্রীচরণ দুইটিই দেখিতে চাই না। রাগ করিয়া যাহার 'মুখ' দেখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি সে যদি মুখ ঢাকিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে

রাগ বাড়ে বই কমে না। যে কিশোরীটির 'পাণি' প্রার্থনা করি তাঁহাকে সম্পূর্ণ এবং সমগ্রভাবেই কামনা করি। হাফিজ কি সত্য সত্যই শুধু প্রিয়ার গালের 'কৃষ্ণ তিলটি'র মূল্যস্বরূপই সমরকন্দ আর বোখারা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন? দীন দরিদ্রের বাড়িতে যখন বড়লোক 'পায়ে'র ধুলা দেন তখন সশরীরে আসিয়াই দেন, লোক মারফত প্রেরণ করেন না।

(খ) এক ঘটনার দ্বারা আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত॥ অঙ্গবিশেষের দ্বারা যেমন সমস্ত দেহ সূচিত হয়, তেমনি প্রধান বস্তুবিশেষের দ্বারা আনুষঙ্গিক অনেক বস্তুকেই বুঝায়। এক ঘটনা তৎসম্পৃক্ত অন্যান্য ঘটনার কথা প্রকাশ করে।

আমরা 'পান' খাই বলি, কিন্তু চুন খয়ের সুপারির কথা উহ্য রাখি। 'ভাত' খাইয়াছি বলিলে ডাল তরকারিও খাইয়াছি ধরিতে হইবে।

'লালবাতি জ্বালা'র অর্থ দেউলিয়া হওয়া। 'ধামা ধরা'র অর্থ খোশামোদ করা। 'পায়ে পড়া'র অর্থ মিনতি করা।

৯. অনবধানতা

অজ্ঞতা ও অনবধানতা হেতু শব্দের নানাবিধ অপপ্রয়োগ এবং অর্থান্তর ঘটে। ঔদাসীন্য অথবা প্রয়োগকারীর প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ জনসাধারণ অনেক সময় তাহা মানিয়া লয়। 'অবদান' শব্দ তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সিনেমা কোম্পানির নবতম 'অবদান' প্রায়ই বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

আমরা 'সুতরাং' 'তথাচ' 'হঠাৎ' প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত অব্যয় ব্যবহার করি তাহাদের অধিকাংশই মুল অর্থ হারাইয়া নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। সংস্কৃতে 'এবম্' শব্দের অর্থ এইরূপ, বাংলায় 'এবং' ওই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। যে বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া মানে না অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না তাহাকে 'নাস্তিক' বলা হইত। কিন্তু এখন যে ব্যক্তি দেশাচার মানে না তাহাকেও নাস্তিক বলা হয়। 'ম্লেচ্ছ' শব্দ প্রথমে কোনো বিশেষ জাতি এবং দেশ অর্থে ব্যবহৃত হইত। এখন 'ম্লেচ্ছ' বলিলে কদাচারী বুঝায়। 'পাষণ্ড' শব্দে এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বুঝাইত। কিন্তু এখন উহার অর্থ হইয়াছে নিষ্ঠুর। 'বুজরুক' (ফারসী বুজুর্গ) শব্দটি বাংলায় কিরূপ অর্থান্তর লাভ করিয়াছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 'শেওড়াফুলি' 'বেগমফুলি' প্রভৃতির সাদৃশ্যে লোকে 'পায়নাফুলি'কে এক প্রকার অপরিচিত ফুল বলিয়াই মনে করে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। ওই শব্দটি ইংরাজী pine-apple-এর অপভ্রংশ। কাঠের এবং লোহার মিস্ত্রীরা ইংরাজী rivet শব্দের স্থানে 'রিপিট' উচ্চারণ করে। 'রিপিট' কথার মূল অর্থ যাহাই হউক না কেন, মিস্ত্রী সমাজে উহার অর্থ লইয়া কখনো অনর্থ বাধিবে না। আমরা 'আরাম চেয়ারে' (arm-chair) বসিয়া বসিয়া এমনই আরামে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, উহার arm (হাত

রাখিবার স্থান) দুইটি আছে কিনা সে দিকে দৃক্‌পাত করি না। তাই arm বিহীন চেয়ারকেও 'আরাম-চেয়ার' বলি।

কিছুদিন আগেও চিঠিপত্রে বিধবা বুঝাইতে স্ত্রীলোকের নামের শেষে 'দেব্যাঃ' (ব্রাহ্মণের পক্ষে) এবং 'দাস্যাঃ' (শূদ্রের পক্ষে) লেখার রীতি ছিল। আইন-সংক্রান্ত দলিলপত্রে এখনো এ রীতি বর্তমান আছে দেখা যায়। এই রীতির মূলে একটি ইতিহাস আছে।[১]

১০. অর্থসৃষ্টি

শুধু অনবধানতা বা অজ্ঞতা নয়, লেখকের বা প্রয়োগকর্তার স্বেচ্ছাচারিতাও অনেক সময় অর্থপরিবর্তনের কারণ হয়।

'বারুণী' শব্দের এক অর্থ ; কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও মধুসূদন ওই শব্দকে কেবল শ্রুতিমধুর হইবে বলিয়া বরুণের স্ত্রী অর্থে প্রয়োগ করিলেন।

'প্রদোষ' শব্দের অর্থ রজনীমুখ, কিন্তু উষাকাল অর্থেও রবীন্দ্রনাথ ওই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

জানালা (পর্তুগীজ জানেলা) শব্দের ধ্বনিসাম্যে এবং বাতায়নের আকৃতি অনুসারে রবীন্দ্রনাথ 'জালায়ন' শব্দ চয়ন করিয়াছেন। জালনির্মিত অয়ন অর্থাৎ গতিপথ এই ব্যাসবাক্যে জালায়ন শব্দের সমাস নিষ্পন্ন করিলে উহার আক্ষরিক অর্থ হয় জাল বা জালের রাস্তা। তাহা হইতে উহার গবাক্ষ এই অর্থ দিয়াছেন।

স্বেচ্ছাচারমাত্রই নিন্দনীয় নয়। এইরূপ নূতন শব্দ সৃষ্টির ফলে ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়।

১, অমুকের লেখা এই অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার। এখনো পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা অমুক শর্মণঃ বলিয়া অনেক লেখার শেষে নাম স্বাক্ষর করেন। 'দেব্যাঃ' 'দাস্যাঃ' পদবীর মূলেও ওই ব্যাপার। কিন্তু কেবল বিধবার নামের সঙ্গে ইহার যোগ হইল কেন? সধবা ও কুমারীর নামের সঙ্গেও তো হইতে পারিত!

বাঙালী স্ত্রীলোকদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন পূর্বকালে ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল তাহাও নিতান্ত অল্প। সুতরাং স্ত্রীলোকেরা চিঠিপত্র একরকম লিখিতেনই না। লিখিবার দরকারও হইত না। কেবল পতিপুত্রহীনা অনাথাদের সম্পত্তিরক্ষার জন্য কাগজ পত্র লিখিতে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখাইতে) হইত। দলিল পত্রে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিবার বেশী প্রয়োজন হইত। পুরুষের পদবী (শর্মণঃ দাসস্য প্রভৃতি)-র নজিরে তাঁহাদের নামের শেষে 'দেব্যাঃ' ও 'দাস্যাঃ' লেখা হইতে লাগিল। কিন্তু বিধবার নামই অধিক লিখিত হওয়ায় এই পদবীগুলি বিধবার পদবী বলিয়াই অনুমিত হইয়া গেল। পরে সধবা ও কুমারীরা যখন লিখিতে আরম্ভ করিলেন তখন 'দেব্যাঃ' ও 'দাস্যাঃ' হইতে পৃথক করিয়া 'দেবী' ও 'দাসী' শব্দ ভিন্ন বিভক্তিতেই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এখন 'দাসী'ও উঠিতে বসিয়াছে, দাসপত্নীও 'দাসী' হইতে লজ্জাবোধ করেন। এখন অ-দেবপত্নী রমণীরাও 'দেবী'। যাঁহারা দেবপত্নী তাঁহাদের তো কথাই নাই। ফলে 'দেবী' পদবীর ব্যবহার বাড়িয়াছে। তবে 'দেব্যাঃ' এখনো সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই।

১১. অর্থের অনির্দিষ্টতা

এমন অনেক শব্দ আছে যাহারা বিশেষ একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে না। 'ভদ্রলোক' ও 'ভদ্রমহিলা' এই শব্দদ্বয় ইংরাজী gentleman ও lady এই দুই শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী শব্দ দুইটির ব্যবহার যেমন অত্যন্ত ব্যাপক, বাংলা শব্দ দুইটিরও তেমনই। সুতরাং 'ভদ্রলোক' বলিলে ভদ্রাভদ্র সকলকেই বুঝায়। 'ভদ্র' শব্দের আক্ষরিক যে অর্থ 'ভদ্রলোকে' তাহা রক্ষিত না হইয়া পরিবর্তিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে যে সকল রাজাকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে তাঁহাদিগের অনেকের রাজত্ব হয়তো পঞ্চগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজচরিত্রের বর্ণনায় শুধু বাঙালী কবিরাই যে এইরূপ অর্থাতিশায়ী বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নহে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এইরূপ শব্দাড়ম্বরের প্রাচুর্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার 'কাদম্বরী চরিত্র' সমালোচনাপ্রবন্ধে বলিয়াছেন 'যদিও সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে শূদ্রক বিদিশা-নগরীর রাজা, কিন্তু অপ্রতিহতগামী ভাষা ও ভাবের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে, তিনি—চতুরুদধি-মালামেখলায়া ভুবোভর্তা'। আবার সেকালের কবিরা চাটুকারিতায় যেমন মুক্তকণ্ঠ ছিলেন, নৃপতিবর্গও উপাধি বিতরণে তেমনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সকল উপাধির দ্বারা উপাধিধারীর বৈদগ্ধ্যের পরিমাণ যথাযথভাবে নিরূপণ করা যায় না। কবিকঙ্কণ, রায়গুণাকর, বিদ্যাদিগ্‌গজ, বাচস্পতি প্রভৃতি উপাধি তাহার সাক্ষ্য।

রাজদত্ত উপাধি অনেক সময় বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সেই সব শব্দের আক্ষরিক অর্থ যাহাই হউক না কেন, কার্যতঃ সেগুলি কেবল কোনো বিশেষ বংশ বা পরিবারের পরিচয় দিয়া থাকে। চক্রবর্তী পদবীধারী অনেক লোক আছেন যাঁহারা দুইবেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থানও করিতে পারেন না। বংশের কোনো ব্যক্তি অগাধ পাণ্ডিত্যবশতঃ হয়তো 'পণ্ডিত' উপাধি পাইয়াছিলেন। বংশধরেরা তাঁহার গুণ পাইল না কিন্তু উপাধিটি পৈতৃক সম্পত্তির সহিত অধিকার করিয়া রহিল। কাজেই তাহারা না পড়িয়াও 'পণ্ডিত' হইল। 'মজুমদার' শব্দের অর্থ রাজস্বের হিসাব-রক্ষক। মুসলমান আমলে যাঁহারা রাজসরকারে ওই কর্ম করিতেন তাঁহারা 'মজুমদার' বলিয়াই অভিহিত হইতেন। তাহা হইতে উহা 'কুলপদবী' রূপে বংশানুক্রমে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। সুতরাং অর্থ পরিবর্তিত হইল।

ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে আধুনিক বৃত্তিগুলিও কুলপদবীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'বটলিওয়ালা,' 'এঞ্জিনীয়র', 'কন্ট্রাক্টর' প্রভৃতি তাহার নিদর্শন।

'বিলাত' শব্দের অর্থ বিদেশ। তাহা হইতে উহা ইংলণ্ড অথবা আরও ব্যাপকভাবে ইউরোপকেও বুঝায়। আবার 'বিলাতী' জিনিস বলিলে প্রধানতঃ

ব্রিটিশ দ্রব্যকে বুঝায়। জাপানী জিনিস বিলাতী নয়, কিন্তু টম্যাটোর নাম 'বিলাতী' বেগুন। গোল আলুকেও অনেক সময় 'বিলাতী' আলু বলা হয়।

আজকাল ইংরাজী friend শব্দের অনুকরণে 'বন্ধু' শব্দটা খুব প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। প্রবীণ অধ্যাপকও ইউরোপীয় প্রথায় নবীন ছাত্রকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করেন। বিলাতী আদব-কায়দার প্রভাবে 'বন্ধু' শব্দের অর্থ অতিবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অমুক অমুকের 'বন্ধু'—এই কথা বলিলে তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রীতিবন্ধন থাকিতেই হইবে, এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। সুন্দর শিশু দেখিল আমরা মিষ্টি (ইংরাজীর অনুবাদ) বলি, রসনেন্দ্রিয়ের যাহা এক্তিয়ারভুক্ত তাহার দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ চালাই।

কিছুদিন আগেও বাংলা দেশে কেবল ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীলোকগণই নামের শেষে 'দেবী' লিখিতেন। এখন 'দেবী' শব্দের ব্যবহার জাতিবিশেষে নিবদ্ধ নহে। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের রমণীরাই আজকাল নামের শেষে 'দেবী' লিখিতেছেন। এখন থিয়েটার বায়স্কোপের অভিনেত্রীরাও দেবী। বিদেশী মহিলারাও মধ্যে মধ্যে শখের ভারতীয় নাম লইয়া প্রান্তে একটি 'দেবী' সংলগ্ন করেন। (অনবধানতা শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) ইংরাজীতে নামের শেষে যে Esq. লেখা হয় তাহাও প্রথমে আমাদের 'দেবী'র মতই সমাজের একটা বিশেষ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে প্রযুক্ত হইত। কিন্তু পরে Esq.-এর গৌরব এদেশীয় 'দেবী'র মত একাকার হইয়া যায়। এখন Esq.-এর ব্যবহার বিরল।

'খাওয়া' ধাতুর মূল অর্থ ভোজন করা। কিন্তু ইহা ক্রমশঃ কিরূপ সীমাহীন ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। খাবি, মাথা, মার, ধাক্কা, বিষম, হোঁচট, ঘুষ এমন কি ঘণ্টা পর্যন্ত খাইবার ব্যবস্থা বাংলা ভাষায় আছে।

'লাগা'র অর্থ সংলগ্ন হওয়া। কিন্তু রসগোল্লা যখন মিষ্টি 'লাগে' এবং মেয়েটিকে যখন মন্দ 'লাগে' না, তখন অর্থ সুদূরবিস্তৃত হইয়া পড়ে। 'লাগা'র আর এক অর্থ প্রয়োজন হওয়া। যেমন কাজটা করতে দু-ঘণ্টা 'লাগবে'। 'লাগে' টাকা দিবে গৌরীসেন।

'কাটা'র অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু রেলের যাত্রীরা টিকিট 'কাটে' বা 'কাটায়' কেন? টিকিট-বিক্রেতা পাঞ্চ্ করিয়া দেয় বলিয়া কি? যে বই পোকায় 'কাটে' তাহার সারবত্তা বুঝিতে পারি কিন্তু লেখকের নামেও তো কোনো কোনো বই দিব্য 'কাটিয়া' যায়। পোকার দাঁত আছে, নামের কি আছে? বেফাঁস কথা একটা মুখ হইতে বাহির হইয়া গেলে জিব 'কাটি'। আসলে কাটিবার ভঙ্গী করি মাত্র। বৈষ্ণবী তিলক 'কাটে', মাঝে মাঝে ছড়াও 'কাটে'। মাস্টারে ভুল 'কাটে', কাটুনী সুতা 'কাটে', অকাজে সময় 'কাটে'। বড়লোকেরা চেক 'কাটে', হুণ্ডি 'কাটে' কিন্তু এ পর্যন্ত কাহাকেও নোট কাটিতে দেখি নাই। গরম দুধে টক পড়িলে ছানা 'কাটিয়া' যায়; শুনিয়াছি

তেঁতুল গুলিয়া খাওয়াইয়া দিলে মদের নেশাও 'কাটিয়া' যায়। গাইয়ের স্বর এবং বাজিয়ের তাল 'কাটা' স্বাভাবিক। নর্তকী রত্নমালার তাল না 'কাটিলে' 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কি হইত? কিন্তু সাঁতারে 'কাটিবার' কি আছে বোঝা যায় না। জল বোধ করি। আমার যে বন্ধুটির 'ঠোঁটকাটা' বলিয়া সুনাম আছে তাঁহার ঠোঁট সম্পূর্ণ অক্ষত। সমাজে 'কানকাটা' লোকেরও অসদ্ভাব নাই। যাহাকে 'দু-কান কাটা' বলি তাহার একটি কানও কাটা নয়। যে দোকানদার নিত্য গলা 'কাটে' তাহার কিন্তু ফাঁসি হয় না। যুক্তিমাত্রই 'অকাট্য' নয়।

'ধরা'রও নানা অর্থ। ঠাণ্ডা লাগিলে মাথা 'ধরে', ওল খাইলে গলা 'ধরে'। বয়স হইলে চুলে পাক 'ধরে'। উনন 'ধরে', ওষুধ 'ধরে', পেট 'ধরে', বৃষ্টি 'ধরে'। যাহাদের ধরিবার কথা নয় তাহারাও দোষ 'ধরিতে' পারিলে ছাড়ে না। বেশী আঁচে হাঁড়ি চড়াইলে ভাত 'ধরিয়া' যায়। 'ধরাধরি' না করিলে চাকরি বাকরি পাওয়া কঠিন।

'মারা' মানে প্রহার করা অথবা তাহারও অধিক একেবারে হত্যা করা। কিন্তু চাল 'মারা', পকেট 'মারা', উঁকি 'মারা', মটকা 'মারা', আড্ডা 'মারা', প্রভৃতির মধ্যে কোথাও 'মারা' ক্রিয়ার মুখ্যার্থে প্রয়োগ হয় নাই। হাতে না 'মারিয়া' ভাতে 'মারেন' এমন বন্ধু বিরল নয়।

১২. গৌণার্থ-প্রাধান্য

শব্দের প্রধান অর্থের সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো এক বা একাধিক গৌণ অর্থও দেখা দেয় এবং সেই গৌণ অর্থ ভাষায় চলিত হইয়া যায়।

'মোট কথা' শব্দে মোটের অর্থ বোঝা যায়। ইহার অর্থ হইতেছে যে, যতগুলি কথা বলা হইয়াছে তাহার অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া সারাংশ যতটুকু, কেবল সেইটুকুই। 'মোট' শব্দের মূল অর্থ 'সমষ্টি', কিন্তু গৌণ অর্থ 'অত্যাবশ্যক'।

'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ 'গৃহ'। কিন্তু এখন কেবল 'দেবালয়' অর্থেই ইহার ব্যবহার একরূপ সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

'বাসর' (<বাসহর <বাসঘর <বাসগৃহ) শব্দের অর্থ থাকিবার ঘর। তাহা হইতে ইহার অর্থ হইল, বরবধূ প্রথম যে কক্ষে শয়ন করে সেই কক্ষ।

'হিন্দু'[১] শব্দটি সিন্ধু শব্দজাত। প্রাচীন পারসীকগণ সিন্ধুকে 'হিন্দ্' বা 'হিন্দু' বলিতেন। তাহা হইতে সিন্ধু নদী যে প্রদেশে প্রবাহিত তাহার নাম হইল 'হিন্দ্' এবং তদ্দেশের অধিবাসীরা 'হিন্দু' নামে পরিচিত হইল। ফারসী ভাষায় 'হিন্দু' শব্দ 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কালে অনেক ভারতীয়কে বন্দী করিয়া পারস্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে দাসরূপে

১. সংস্কৃত স = ফারসী হ।

বিক্রয় করা হয়। তাহার ফলে ফারসীতে 'হিন্দু' শব্দ ক্রীতদাস অর্থেও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। 'হিন্দু' শব্দ যে প্রথমে সিন্ধুপ্রদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইত তাহার প্রমাণ অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কিন্তু দেশ অর্থে 'হিন্দু' শব্দ ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া গেল, তাহার ফলে আবার নূতন করিয়া (হিন্দুস্তান>) 'হিন্দুস্থান' শব্দের উৎপত্তি। 'হিন্দুস্থান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—হিন্দে যাহারা বাস করে তাহাদের দেশ। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রমতে 'ভবানীপতি' লিখিলে যে দোষ হয় ইহারও সেই দোষ। 'গোলাপ-জলে'রও এই অবস্থা।

'মালা ঘোরালেই বৈরাগী হয় না', 'এমন পদার্থ ছেড়ে মালা জপে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে', 'মালা জপ মিছে মন নেই পিছে' প্রভৃতি প্রবাদে মালা ঘোরানো বা মালা জপার অর্থ ইষ্টমন্ত্র বা নাম জপ করা। মালার একটি একটি গুটি সরাইয়া জপের সংখ্যা রাখা হয় বলিয়া মালা শব্দটাই প্রায় মন্ত্রের অর্থ লইয়া বসিয়াছে। মন্ত্র জপ করিতেছেন অর্থে 'মালা করছেন' এরূপ প্রয়োগও শুনিয়াছি। ইংরাজীতেও অবিকল এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছে 'count your beads' বাক্যাংশে। নৈষ্ঠিক খ্রীস্টানগণও মালা ঘুরাইয়া উপাসনা করেন। ফলে মালা কথাটাই উপাসনার অর্থ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে।

যে কারণগুলি উল্লিখিত হইল উহাদের শ্রেণী বিভাগ সুসম্পূর্ণ হইতে পারে না। প্রধান কারণগুলিকে যতদূর সুশৃঙ্খলভাবে পারা যায় সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সাজাইবার পদ্ধতিও যে সম্পূর্ণ নির্দোষ হইয়াছে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

উদাহরণস্বরূপ যে সকল শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছি সেগুলি যথাস্থানে বসাইবারই চেষ্টা করিয়াছি। তবে তাহাদের অনেকগুলি স্থানান্তরেও বসানো চলে, কারণ একই শব্দের অর্থপরিবর্তনে অনেক সময়েই একাধিক কারণ বর্তমান থাকে।

বাগর্থ ও স্ফোটবাদ

বাক্ ও অর্থ এই দুইয়ের প্রকৃতি বিচার প্রসঙ্গে আধুনিক শব্দতাত্ত্বিকগণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন। বাগর্থ-বিজ্ঞান (Semantics) হইল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি কনিষ্ঠ শাখা। কিন্তু কনিষ্ঠ হইলেও পণ্ডিতসমাজে ইহার গুরুত্ব অনুভূত হইয়াছে, ভাষাতত্ত্বের ছাত্রগণ ইহার দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছেন। তথ্যের সন্ধান সংকলন এবং তাহার মধ্য হইতে তত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষেও কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে কাজ আরম্ভ হইয়াছে বলিলাম, সে কাজ আধুনিক রীতির। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে পথের প্রবর্তন করিয়াছেন আমরা সেই পথ অনুসরণ করিতেছি। সে পথ বিজ্ঞানসম্মত এবং সেই কারণে প্রশস্ত। অল্প সময়ে অনেক কাজ করিবার ইহাই উপযুক্ত পন্থা। একটিকে লইয়া দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। সংসার হইয়াছে জটিল, পৃথিবীর রূপ নিত্য বদলাইতেছে, মানুষের প্রয়োজন বাড়িয়া যাইতেছে, তাহার উপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব সৌধের দ্বার প্রতিদিন উন্মুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসু মানুষকে আহ্বান জানাইতেছে। এখন বিশেষজ্ঞকেও বিশেষের সহিত কিছুটা নির্বিশেষকেও জানিতে হয়। কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ দীর্ঘকালের সাধনায় যে ফল লাভ করিয়াছিলেন তাহার মূল্য দিতে যেন কার্পণ্য না করি। তাঁহারা যে ঋক্‌থ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পরিচয় লইতে হইবে এবং বর্তমানকালে কি ভাবে ও কি পরিমাণে তাহার সদ্ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। পূর্ব পশ্চিম আর কোথাও যদি নাই মেলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মিলিবেই এবং মিলাইতে পারিলে আমাদেরই লাভ। শব্দার্থ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মনীষিগণ কিভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

তাঁহাদের সকল সিদ্ধান্তের সহিত সকলের মতৈক্য ঘটিবে না। ঘটিবার কথা নয়, কারণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেই ঐকমত্য ছিল না। একই বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত সম্প্রদায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিয়াছেন। বৈয়াকরণ যাহা বলেন নৈয়ায়িক তাহা মানেন না। নৈয়ায়িক যাহা বলেন মীমাংসক তাহার প্রতিবাদ করেন। এমনি করিয়া তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া তত্ত্বে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সব চেষ্টা হয়তো সার্থক হয় নাই, সকল সন্ধান হয়তো চরম লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু এই চেষ্টা ও সন্ধানের মধ্য দিয়া যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি ও গভীর মননশীলতার পরিচয় রহিয়া গিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। পশ্চিমের সকল পণ্ডিতই ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাণিনির দান শ্রদ্ধা সহকারে স্বীকার করেন। কিন্তু শব্দার্থ বিচারের ক্ষেত্রে ভারতীয়

শাস্ত্রকারগণের যে দান আছে তাহার সহিত আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্রগণের পরিচয় অল্প। সুখের বিষয় এ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

বাগর্থ-বিজ্ঞানের আলোচনায় স্ফোটবাদ ভারতীয় দার্শনিক প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় দান। 'স্ফোট' কি? উত্তরে বলা হইয়াছে 'স্ফুটতি প্রকাশতেঽর্থোস্মাদ্ ইতি স্ফোটঃ। বাচক ইতি যাবৎ।' যাহা হইতে অর্থ প্রকাশিত হয় তাহাই স্ফোট অর্থাৎ কিনা বাচক। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এ ব্যাখ্যা তেমন সন্তোষ-জনক হইল না। যাহা দ্বারা অর্থ স্ফুটিত হয় তাহাই স্ফোট একথা বলায় 'স্ফোট' সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বিশেষ বৃদ্ধি পাইল না। 'বাচক' শব্দটির দ্বারাও নয়।

আরও সরল করিবার চেষ্টায় কেহ ব্যাখ্যা করিলেন,—'স্ফুটতি স্ফুটীভবত্যস্মাদ্ অর্থ ইতি স্ফোটোঽর্থপ্রদায়কঃ'। যাহার সাহায্যে অর্থ স্ফুটীকৃত হয়, যাহার দ্বারা অব্যক্ত অর্থ ব্যক্ত হয়, যাহা অর্থের প্রদায়ক তাহাই স্ফোট। এই ব্যাখ্যার দ্বারাও স্ফোট-এর পরিচয় বিশেষ স্পষ্ট হইল না।

পতঞ্জলির ব্যাকরণ মহাভাষ্যেই 'স্ফোট' কথাটির সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—'স্ফোটঃ শব্দঃ'। অর্থাৎ স্ফোট হইল সেই শব্দ যাহার দ্বারা অর্থ অভিব্যক্ত হয়। শব্দ এখানে কেবল অর্থের প্রতীক মাত্র, তদ্‌ব্যতিরিক্ত আর কিছু নয়। 'সূর্য' কথাটি শোনা মাত্র আকাশচারী এক জ্যোতিষ্কের কথা মনে পড়ে। 'সূর্য' শব্দটি আমাদের নিত্যপরিচিত বহুদূরবর্তী ওই অগ্নিগোলকটির প্রতীক। স্ ঊ র্ য্ অ এই ধ্বনিগুলি কেবল সূর্য নামক বস্তুটিকে প্রকাশ করিবার উপায় মাত্র।

'স্ফোটঃ শব্দঃ, ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ।' স্ ঊ র্ য্ অ এই ধ্বনি কয়টির কোনোটিই সূর্যের দ্যোতক নহে। ওই ধ্বনিগুলির নিজের কোনো অর্থ নাই, এগুলি এই শব্দের গুণ।

স্ফোট এবং ধ্বনি দুইই শব্দের আত্মা। 'দ্বৌ শব্দাত্মানৌ।' দুইয়ের মধ্যে স্ফোট হইল শব্দতত্ত্ব অর্থাৎ শব্দের শাশ্বত উপাদান, ইহাই শব্দের সারবস্তু, ইহা নিত্য এবং অবিভাজ্য। ধ্বনিগুলি অনিত্য, একবার উচ্চারণ করিলেই তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু স্ফোটের স্ফুটন ক্রিয়ার ইহারা সহায়ক হয়। ইহাই ধ্বনির কাজ।

যাস্ক 'স্ফোট' এই শব্দটি ব্যবহার না করিয়াও তাঁহার 'নিরুক্তে' ঔডুম্বরায়ণের মত খণ্ডন প্রসঙ্গে স্ফোটতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। স্ফোটতত্ত্ব সম্পর্কে দার্শনিকের মনে চিন্তার সূত্রপাত হয়তো আরও আগে হইয়াছে, কিন্তু লিখিতভাবে তাহার নিদর্শন ইহার পূর্বে আর পাওয়া যায় না। যাস্ক বলিতেছেন,—'ইন্দ্রিয়নিত্যং বচনমিতি ঔডুম্বরায়ণঃ। তত্র চতুষ্ট্বং নোপপদ্যতে যুগপদুৎপন্নানাং বা শব্দানাম্ ইতরেতরোপদেশঃ শাস্ত্রকৃতো যোগশ্চ।'

ঔডুম্বরায়ণের মতে শব্দকে নাম (বিশেষ্য), আখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ ও

নিপাত এইরূপ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না। কারণ, দ্রুত উচ্চারিত ধ্বনিপরম্পরা ব্যতীত শব্দের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবিদ্যমান। যাস্ক ইহারই প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, শব্দের এইরূপ শ্রেণীবিভাগে বাধা হইবার কোনো কারণ নাই, যেহেতু শব্দ ব্যাপ্তিমান্।

আমরা কর্ম পরিচালনার জন্য শব্দের সাহায্যে সংজ্ঞাকরণ করিয়া থাকি, ব্যক্তি বস্তু বা ভাবকে এক একটি শব্দের দ্বারা নামাঙ্কিত করি। শব্দের এই প্রকাশন ক্ষমতাই তাহার ব্যাপ্তিমত্ব।

ভাবপ্রকাশের জন্য মানুষ আদৌ শব্দের উপর নির্ভর করিল কেন এই মৌল প্রশ্নটির দিকে যাস্কের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তিনিই সর্বপ্রথম এই প্রশ্নের একটি যুক্তিসহ উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বলা হইয়াছে শব্দের ব্যাপ্তিমত্ব অর্থাৎ প্রকাশন-শক্তি আছে বলিয়াই সংজ্ঞা-করণের জন্য শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু 'ব্যাপ্তিমত্ব' নামক গুণটি কি শব্দেরই একক সম্পত্তি? তর্ক উঠে,—'ব্যাপ্তিমত্ব' গুণ তো অভিনয়েরও আছে। হস্তসঞ্চালন, অক্ষিসংকোচন প্রভৃতির সাহায্যেও তো মানুষ মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে। তবে তাহার দ্বারাই শব্দের কাজ নির্বাহিত হউক না! অভিনয়েরও ব্যাপ্তিমত্ব আছে সত্য, কিন্তু শব্দ সাহায্যে ভাবপ্রকাশ যত সহজে সাধিত হয় অভিনয়ের দ্বারা তত সহজে হয় না এবং তত সুনিশ্চিতরূপেও হয় না। অর্থাৎ অভিনয়ের শুধু ব্যাপ্তিমত্তা আছে অণীয়স্ত্ব নাই, ব্যাপকতা আছে বিশেষকতা নাই। 'ব্যাপ্তিমত্তাত্তু শব্দস্যাণীয়স্ত্বাচ্চ শব্দেন সংজ্ঞাকরণম্ ব্যবহারার্থম্ লোকে।' ব্যাপ্তিমত্তা এবং অণীয়স্ত্ব শব্দের এই দুইটি গুণ আছে বলিয়াই তাহার সংজ্ঞাকরণের পক্ষে উপযোগিতা সর্বাধিক।

যে ঔদুম্বরায়ণের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যাস্ক শব্দগুণ নিরূপণ করিলেন তাঁহাকেই এক হিসাবে স্ফোটবাদের প্রথম প্রবর্তক বলা চলে। তাঁহার মত কি? না, 'ইন্দ্রিয়নিত্যং বচনম্'। বাক্য একান্তরূপেই ইন্দ্রিয়নির্ভর। বক্তার মনে এবং শ্রোতার মনে বাক্য ব্যতীত আর কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। বক্তা যখন বলে, 'জল পড়ে' তখন সমগ্র বাক্যটিই জলপতন বাচক একটি বিশেষ ভাবের অবিচ্ছিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য এক ধ্বনিমূর্তিকেই শ্রবণেন্দ্রিয় সাহায্যে গ্রহণ করিয়া মনের মধ্যে স্থাপন করে। এক মন হইতে আর এক মনে যাহা গেল তাহা 'জল পড়ে'। 'জল পড়ে' এই বাক্যের মধ্যে জ্ ল্ প্ এবং ড়্ এই চারিটি ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে, ইহা ছাড়া কয়েকটি স্বরধ্বনিও আছে। কিন্তু ওই ধ্বনিগুলির কোনো স্বাতন্ত্র্য রহিল না, ওগুলি নিতান্তই গৌণ হইয়া গেল। 'জল পড়ে' সমগ্র বাক্যটি একটি বিশেষ ভাবকে এক মন হইতে বহন করিয়া অন্য মনে স্থাপন করিল বটে, কিন্তু যে উপাদানগুলি দিয়া বাক্যটি রচিত হইয়াছিল সেগুলির স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্ত হইল।

বৈয়াকরণ বলিতেছেন, স্ফোট নিত্য, অপরিবর্তনীয়, অবিভাজ্য। কিন্তু ধ্বনির

নিত্যতা নাই। স্ফোট-কে ব্যক্ত করিয়াই সে বিলুপ্ত হয়, নিজে কোনো অর্থ বহন করে না।

বৈয়াকরণের এই মত সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠিয়াছে। ধ্বনির কোন্ গুণ গ্রাহ্য? ব্যস্তত্ব না সমস্তত্ব? একটি ধ্বনি কি একলাই স্ফোট ব্যক্ত করিতে পারে? না, একাধিক ধ্বনির সমাহারের প্রয়োজন?

যদি বলি একটি ধ্বনি একক ভাবেই স্ফোটার্থ প্রকাশে সক্ষম তাহা হইলে প্রথম ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তো কার্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে, প্রথম ধ্বনি উচ্চারিত হইবার পর দ্বিতীয় ধ্বনির আর কোনো প্রয়োজন থাকিবে না। 'ক' উচ্চারণ করিলে ভক্তের মনে 'কৃষ্ণ' নামের উদয় হইতে পারে, কিন্তু ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখন গৃহিণীকে অন্ন চাহিব তখন কেবল মাত্র 'ক' ধ্বনিটির সাহায্যে সুফল ফলিবার আশা কোথায়? শিশু যখন অস্পষ্ট স্বরে মা বলে তখন আমরা ধরিয়া লই সে মা-কে ডাকিতেছে। উহার সহিত আরও অনেক কথা ধরিয়া লই। কিন্তু আমাদের ধারণার সহিত শিশুর ইচ্ছার সম্পূর্ণ মিল না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ধ্বনিসমূহ 'ব্যস্ত' হইয়া সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে না।

তবে কি 'সমস্ত' ভাবেই তাহারা ভাব প্রকাশ করে? স্ফোটবাদ মানিয়া লইলে তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ, ধ্বনি যখন অনিত্য, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যখন সে অস্তিত্ব হারায় তখন অনেকগুলি ধ্বনির সমাহার হইবে কি করিয়া? দ্বিতীয়টি যখন উচ্চারণ করিতেছি প্রথমটি তখন অবিদ্যমান।

স্ফোটবাদীরা প্রত্যুত্তরে বলেন,—ধ্বনি যেমন ব্যস্ত ভাবে তেমনি সমস্ত ভাবে স্ফোট প্রকাশে ক্রিয়া করে। শব্দের প্রথম বর্ণ অর্থাৎ প্রথম ধ্বনিটিই স্ফোট ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু অন্য বর্ণগুলিও একেবারে অনাবশ্যক নয়। ভর্তৃহরি বলিতেছেন,—'সামস্ত্যেন তু তদ্ব্যক্তিঃ সর্বান্তে মণিতত্ত্ববৎ।' প্রথম বর্ণ বা ধ্বনির দ্বারা যে স্ফোট ব্যঞ্জিত হয় অন্যান্য বর্ণগুলির সাহায্যে তাহা স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হয়—যেমন বারংবার পর্যবেক্ষণ করিয়া মণিকার মণির তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

'বাক্যপদীয়' ভর্তৃহরি প্রণীত শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ক বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে স্ফোটতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ভর্তৃহরি শব্দকে অরণিস্থ অগ্নির সহিত তুলিত করিয়াছেন। কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি নিহিত থাকে, বোধের মধ্যে তেমনি শব্দের অবস্থান। অগ্নি যে জ্বলে তাহার অন্য কারণ। শব্দ যে ধ্বনির বাহকতায় প্রকাশ লাভ করে তাহারও কারণ স্বতন্ত্র।

অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ প্রকাশান্তরকারণম্।
তদ্বচ্ছব্দোঽপি বুদ্ধিস্থশ্‌শ্রুতীনাং কারণং পৃথক্॥

এই যে বুদ্ধিস্থ শব্দ ইহাই স্ফোট। অগ্নি নিজে প্রকাশিত হয়, সে স্বপ্রকাশ।

আবার সে অন্যকেও প্রকাশিত করে। অন্ধকারে একটি প্রদীপ জ্বলিলে দীপ-শিখাটি যেমন দেখি, তেমনি সেই শিখার আলোক যাহার উপর পড়ে তাহাকেও দেখিতে পাই।

গ্রাহ্যত্বং গ্রাহকত্বঞ্চ দ্বে শক্তী তেজসো যথা।
তথৈব সর্বশব্দানাং এতে পৃথগবস্থিতে ॥

অগ্নির স্বপ্রকাশন এবং অন্যপ্রকাশন এই দুইটি ধর্মকেই বলা হইয়াছে গ্রাহ্যত্ব এবং গ্রাহকত্ব। অগ্নির ন্যায় শব্দেরও গ্রাহ্যত্ব এবং গ্রাহকত্ব এই দুই শক্তি আছে। স্ফোট নিজে প্রকাশিত হয় এবং ধ্বনিকে প্রকাশিত করে। ব্রহ্ম যেমন স্বপ্রকাশ, স্ফোটও তেমনি স্বপ্রকাশ। এই স্ফোট বা শব্দতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন।

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ ॥

এই জগতের যাবৎ প্রক্রিয়া সেই শব্দরূপ ব্রহ্মেরই বিবর্ত মাত্র—সেই শব্দব্রহ্ম, যাঁহার না আছে আদি না আছে অন্ত না আছে পরিবর্তন; যিনি অনাদি অনন্ত অক্ষর এবং এক, বিবিধ শক্তির আশ্রয়ে যাঁহাকে অনেক বলিয়া মনে হইতে পারে, যে বহুত্ব ভ্রান্তিমাত্র কিন্তু সত্য নয়।

শব্দের বহুত্ব নাই, বহুত্ব আছে ধ্বনির। এতদ্ব্যতীত ধ্বনি বিভিন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। যখন একটি বাক্য উচ্চারিত হয় তখন বাক্যের উপাদান বর্ণগুলি সব যুগপৎ নির্গত হয় না, পরম্পরা-ক্রমে নির্গত হয়। 'ক্রম' এবং 'বহুত্ব' এ দুইটি হইল ধ্বনির ধর্ম। আমরা ভুল করিয়া এই ধর্মকে শব্দের উপর অরোপ করিয়া বসি।

স্ফোট শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহাই হউক না কেন উহার নিহিতার্থ যে সুস্পষ্ট নয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সেই কারণেই ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে মত-মতান্তরের এত আধিক্য। বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক এবং মীমাংসক সম্প্রদায় স্ফোট প্রসঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, নানা জনে নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। একজন যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন অন্যের হাতে তাহা খণ্ডিত হইল। আর একজন প্রবলতর যুক্তি হানিয়া তাহাকেও প্রতিখণ্ডিত করিলেন। কাহারও যুক্তি একেবারে উপেক্ষা করিবার মত নয়। তাই তর্কজাল ক্রমশঃ জটিল হইতে থাকে।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার The Principal Upanishads গ্রন্থে 'স্ফোট'কে দ্বিমূর্তি-বিশিষ্ট একটি অবিভাজ্য ভাব (idea) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই দ্বিমূর্তির একটি হইল শব্দ আর একটি হইল অর্থ। কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরর অচ্ছেদ্যতা বুঝাইবার জন্য যে বাক্ ও অর্থের উপমা দিয়াছিলেন তাহা

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কালিদাস বাক্ ও অর্থের মধ্যে যে একটি একান্ত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুভব করিয়াছিলেন ততটা না করিলেও অনেকেই শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে একটা সংযোগ আছে একথা অস্বীকার করেন না। এ সংযোগ যাঁহারা মানিয়া লন তাঁহারাও সকলে স্ফোটতত্ত্ব পুরাপুরি মানিতে চান না। বস্তুতঃ উপলব্ধিতেই বাধা। শাব্দিক যখন শব্দের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন তখন শব্দশাস্ত্রের ছাত্র, যথার্থ অভিনিবেশ থাকিলে, তাহা অল্পবিস্তর বুঝিবে। কিন্তু দার্শনিক যখন শব্দ ও ব্রহ্মকে অভিন্ন বলেন তখন ব্রহ্ম যথাপূর্ব অনুপলব্ধই থাকিয়া যান, তদুপরি শব্দ সম্পর্কে যে সামান্য ধারণাটুকু ছিল সেটুকুরও ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই কারণেই 'স্ফোট'-এর একটি সর্বসম্মত সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। প্রাচীনগণও যে নিঃসংশয় ছিলেন না তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে।

আধুনিক ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন, 'স্ফোট' আসলে শব্দের অর্থ ছাড়া আর কিছু নহে। কেহ বা উহাকে একটি প্রত্যয় (notion) মাত্র মনে করেন। আবার রাধাকৃষ্ণনের মত কেহ কেহ উহাকে ভাব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুশীলকুমার দে অনবয়ব শব্দের ধ্বনি বলিয়া স্ফোট-এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের ব্যাখ্যায় যে তিনি নিজেই খুশী হইতে পারেন নাই তাহা বুঝিতে পারি যখন তিনি স্ফোট-কে কিছুটা অতীন্দ্রিয় ধরনের ভাব বলিয়া উল্লেখ করেন। কীথ (Keith) 'স্ফোট'-কে একটি রহস্যময় সত্তা (mysterious entity) বলিয়া মনে করেন। 'বেদান্ত সূত্র'-এর ইংরাজী অনুবাদগ্রন্থে জর্জ থিবো (George Thibaut) 'স্ফোট' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে, একটা শব্দের বর্ণরূপ উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া শব্দটিকে স্বীকার করা বৈয়াকরণিক অবাস্তবতা (grammatical fiction)। অঙ্গী যখন আছে তখন অঙ্গও আছে, অবয়বী অবয়ব হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র এই কথাটিই সহজে বুঝিবে। সে বুঝিবে অর্থবান্ ধ্বনি-সমষ্টিই হইল শব্দ, এবং শব্দের যে অর্থবত্তা তাহাই 'স্ফোট'। দর্শনের পক্ষে এ কথা যথেষ্ট না হইতে পারে কিন্তু ভাষাতত্ত্বের কাজ এই ব্যাখ্যার দ্বারা অনেকটা চলিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রাতিশব্দ্য

মনুষ্যজগতের মত শব্দ জগতেও একটা শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা দেখা যায়। সবাই সব কিছু করিতে পারে না। যে জমি চাষ করিয়া ধানের ফসল ফলায় কাপড় বুনিবার কাজ তাহার হাতে ভাল হইবার কথা নয়। অথচ মানুষের দুই-ই চাই। ক্ষুধাও নিবারণ করিতে হইবে এবং লজ্জাও অনিবার্য নহে। চাষী বল, তাঁতী বল, কামার বল, কুমার বল, সামাজিক শ্রেণীবিভাগ এইভাবেই গড়িয়া উঠিল।

শব্দের ক্ষেত্রেও তাই। দেহের যে অংশটা দিয়া কাজ করি তাহার নাম দিলাম কর। যে অঙ্গ দুইটা দিয়া চলি সে দুইটাকে বলিলাম চরণ। যে পাখীটা কা কা করিয়া ডাকে তাহার নাম দিলাম কাক। রক্তের যে রং তাহার নাম দিলাম লাল। তেঁতুলের যে স্বাদ তাহাকে বলিলাম টক। গায়ে রোদ লাগিলে যে অনুভূতি হয় তাহাকে বলিলাম তাপ। পৌষ মাসের রাত্রিতে খালি গায়ে বাড়ির বাহির হইলে যাহা বোধ করি তাহার নাম দেওয়া হইল শীত। দীর্ঘকাল পেটে খাদ্য না পড়িলে খাইবার যে ইচ্ছা হয় তাহাকে বলিলাম ক্ষুধা, জল পান করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহার নাম দিলাম তৃষ্ণা। এক একটি বস্তু বা ভাব বা কার্য বুঝাইবার জন্য আদি যুগের মানুষ এই রকম এক একটি শব্দ তৈয়ার করিয়া লইয়াছে। সকল ভাষার ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। কাজ চালাইবার জন্য ইহার প্রয়োজন হইয়াছে। কর যখন বলিয়াছে তখন সে হাত-ই বুঝিয়াছে, পা বুঝে নাই। চরণ যখন বলিয়াছে, তখন তাহার দ্বারা হাতের কাজ করাইয়া লইবার কথা তাহার মাথায় আসে নাই। কাক বলিলে সে কোকিল ভাবিল না, টকের স্বাদকে সে ঝাল বলিল না। প্রিয়ার অধর এবং অলকদাম লইয়া কাব্য করিবার পূর্বে লাল এবং কালো রং এবং তদ্বাচক শব্দ দুইটা সে আয়ত্ত করিয়া লইল।

কি কারণে কোন্ বস্তু কোন্ ক্রিয়া বা কোন্ ভাবের কি নাম হইল সে প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে। একই বস্তুকে একজাতি tree এবং আর এক জাতি বৃক্ষ কেন বলিল। একই ক্রিয়া এক জাতির পক্ষে কৃ ও অন্য জাতির পক্ষে do কেন হইল, একই ভাবকে এক জাতি কেন সত্য বলিয়া অভিহিত করিল আর এক জাতি কেন ttuth নাম দিল—তাহাও কম কৌতূহলের বিষয় নহে। কিন্তু সে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত।

সভ্যতার উন্মেষকালে মানুষ যখন প্রথম কথা বলিতে আরম্ভ করিল শব্দের দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে শিখিল তখন তাহার উপকরণ অল্প। বস্তুতঃ অভাবের অনুভূতিই তাহার বেশী ছিল না। অভাববোধ যত তীব্র

হইতে লাগিল, অভাবজ্ঞাপনের উপায়স্বরূপ ততই একটি একটি করিয়া শব্দ সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বিভিন্ন অঞ্চলস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এই ভাবে বিভিন্ন ধরনের শব্দ রচিত হইল। এমনি করিয়াই হইল পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার পত্তন।

কালক্রমে একই ভাব বা বস্তু বুঝাইবার জন্য একই ভাষায় একাধিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতে লাগিল। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দসংখ্যাও ক্রমশই বাড়িয়া যাইতে থাকে। যে ভাষা যত বড় সে ভাষার শব্দসংখ্যা তত বেশী, প্রতিশব্দের সংখ্যাও সেই কারণে অধিক।

অমরকোষে স্বর্গশব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে এতগুলি নাম আছে,—স্বর্, অব্যয়, নাক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয়, সুরলোক, দ্যু, দিব (দ্বিবচন বলিয়া দ্যৌ দিবৌ আছে, আমরা প্রাতিপদিকের রূপটাই দিলাম) এবং ত্রিপিষ্টপ। দেবতার নাম,—অমর, নির্জর, দেব, ত্রিদশ, বিবুধ, সুর, সুপর্বন্ সুমনস্, ত্রিদিবেশ, দিবৌকস্, আদিতেয়, দিবিসদ্, অদিতিনন্দন ইত্যাদি। এক শ্রীকৃষ্ণের নামই অষ্টোত্তর শত। সেগুলির সবকয়টিই কি পরস্পরের প্রতিশব্দ ?

আমরা প্রতিশব্দ কথাটিকে যে অর্থে ব্যবহার করি সংস্কৃতে সে অর্থে ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। সংস্কৃতে প্রতিশব্দের অর্থ প্রতিধ্বনি। আমরা ইংরাজী synonym এই কথাটির বাংলা করিয়া লইয়াছি প্রতিশব্দ। synonym আসিয়াছে গ্রীক sunonumon হইতে, যাহার অর্থ সমার্থক। sun = syn সম, onoma নাম। একই বস্তু বা ভাবের যখন একাধিক নাম হয় তখন ওই নামগুলিই পরস্পরের synonym বা প্রতিশব্দ।

তবে কি 'গড্' এই ইংরাজী শব্দটিকে বাংলা 'ঈশ্বর' শব্দের প্রতিশব্দ বলিব ? ফরাসী 'রঁাদিভূ' কি 'আড্ডা'-এর প্রতিশব্দ ? গড্ এবং ঈশ্বর সমার্থক, রঁাদিভূ এবং আড্ডাও কতকটা সমার্থক। সমার্থকতাই যদি প্রতিশব্দের একমাত্র অথবা প্রধানতম লক্ষণ হয় তবে ইহারা প্রতিশব্দ বলিয়া অবশ্যই গণ্য হইবে। না, সমার্থক হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের প্রতিশব্দ বলিব না এই কারণে যে, ইহারা এক ভাষার শব্দ নয়। আমরা যখন প্রতিশব্দ কথাটি ব্যবহার করি তখন একটি বিশেষ ভাষার কথাই মনে ভাবি, একাধিক ভাষার কথা ভাবি না। অবশ্য এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় আসিয়া কখনো কখনো তাহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন সে যে অন্য ভাষার শব্দ তাহা ধরা পড়ে না, সে ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটিবে না। 'লেখনী'র চলতি প্রতিশব্দ 'কলম'—একথা বলিলে দোষ হইবে না, যদিও 'কলম' শব্দ আরবী হইতে প্রাপ্ত। তাই বলিয়া হিন্দী 'সিয়াই' বাংলা 'কালি'র প্রতিশব্দ হইবে না।

আসল কথা প্রতিশব্দ হইবে একই ভাষার শব্দ। মার্জারের প্রতিশব্দ বিড়াল, cat নহে। মার্জারের যে অর্থ বিড়ালেরও সেই অর্থ, এবং সেই

অর্থে উভয় শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে। প্রচলনের মাত্রায় ন্যূনাধিক্য থাকা স্বাভাবিক। বিড়াল যতটা প্রচলিত মার্জার ততটা নয়। কিন্তু মার্জারের প্রচলন এতটা অল্প নয় যে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিবার অবকাশ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু ভঙ্গীতে লেখা বিড়াল প্রবন্ধ যখন পড়ি তখন তাহার মধ্যে 'মার্জার' শব্দ দেখিয়া থমকাইতে হয় না। কিন্তু 'মেকুর' শব্দটাকে বিড়ালের প্রতিশব্দের পর্যায়ে ফেলিব কি না ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বাংলা ভাষার আদর্শ অভিধানে বিড়ালের প্রতিশব্দ অথবা অর্থ হিসাবে 'মেকুর' শব্দের অন্তর্ভুক্তি হয় নাই, হওয়ার কথা নয়। শব্দটি প্রাদেশিক, যদিও বিড়াল অর্থেই ইহা অঞ্চলবিশেষে পরিচিত। অর্থ এক হইলেও ইহাকে বিড়ালের প্রতিশব্দ বলিতে বাধাটা হইতেছে কোথায়? বাধা এই যে 'মেকুর' শব্দটা এই অর্থে বঙ্গভাষী জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত নয়। সাহিত্যেও ইহাকে দেখা যায় না। হয়তো লোক-সাহিত্যের কোথাও কোথাও ইহার দেখা মিলিতে পারে। আসলে শব্দটির সার্বত্রিকতা গুণের অভাব। এক ভাষাভাষী লোকসমাজের মৌখিক শিষ্ট আলাপে অথবা সাহিত্যিক শিষ্ট ভাষায় যে শব্দ কোনো বিশেষ অর্থে কোনো বিশেষ শব্দের প্রতিশব্দ রূপে সমগ্র ভাষাঞ্চলে বহুলপ্রচলিত তাহাকেই সার্বত্রিকতা গুণের অধিকারী বলিতেছি। পূর্ববঙ্গে 'শিল'-এর প্রতিশব্দ 'পাটা' প্রচলিত, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পাটার প্রচলন নাই। 'পানি' শব্দটা পানীয় হইতে আসিয়াছে এবং বাংলায় জল অর্থে ইহার ব্যবহারও আছে। বাংলাভাষী মুসলমান সমাজে জল অর্থে পানির ব্যবহার সুপ্রচলিত, কিন্তু বাঙালী হিন্দুর কথায় বা সাহিত্যে পানির প্রচলন নাই। সার্বত্রিক নয় বলিয়াই শিলকে পাটার বা পানিকে জলের প্রতিশব্দ বলিতে বাধা হয়।

প্রতিশব্দের পক্ষে অর্থের সাম্য ও সার্বত্রিকতা ছাড়াও আর একটি গুণ থাকা আবশ্যক, সেটি হইল অর্থের সাকালিকতা অর্থাৎ সমকালবর্তিতা। 'ছাওয়াল' শব্দ শিশু অর্থে আজ কেবল পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। কিন্তু একদিন সমগ্র বাংলা দেশ জুড়িয়া এই অর্থেই ছাওয়াল শব্দের প্রচলন ছিল। চতুর্দশ শতকে রাঢ়ের কবি ছাওয়াল শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আজ পশ্চিমবঙ্গে ইহার ব্যবহার নাই। আজ ইহার সাকালিকতা গুণের অভাব। সুতরাং বর্তমান কালে বালকের প্রতিশব্দ রূপে ছাওয়াল শব্দের ব্যবহার করা চলিবে না।

প্রতিশব্দের প্রধান লক্ষণ অর্থসাম্য বা একার্থকতা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন অনেক প্রতিশব্দ আছে যাহারা আংশিকভাবে একার্থক। 'কুটা' এবং 'কাটা' উভয়ের অর্থ এক হইয়াও এক নয়। পাঁঠা কাটি কিন্তু মাছ কুটি, এবং আলু-বেগুনও কুটিয়া থাকি। 'লাফ' ও 'ঝাঁপ' অনেকটা একার্থক, কিন্তু পুরাপুরি নয়। উভয়ের মধ্যে একটুখানি পার্থক্য আছে। এক লাফে কেহ কেহ পাঁচিল টপকাইয়া যায়, তেমন তেমন বীর হইলে লাফ দিয়া সমুদ্র পার

হইতেও পারে। পুরাণে তাহারও নজির মিলিবে। দুরন্ত ছেলেরা গাছের ডাল হইতে অনায়াসে মাটিতে লাফাইয়া পড়ে। ঝাঁপ দিতে হইলে সাধারণতঃ জল থাকা দরকার, আগুন হইলেও চলে। পাহাড়ের উচ্চ চূড়া হইতে সমুদ্রে যে পড়িবে সে কি লাফ দিয়া পড়িবে? না, ঝাঁপ দিয়া পড়িবে? নিশ্চয় ঝাঁপ দিয়াই পড়িবে। রাজপুত বীরাঙ্গনারা আগুনে লাফাইয়া পড়িতেন, না ঝাঁপাইয়া পড়িতেন? 'ঝাঁপাইয়া পড়িতেন'-টাই কানে ভাল লাগিতেছে মনে হয়। 'লম্ফ ঝম্প' যতই করি না কেন দুইটিই পাশাপাশি থাকিবে, একের স্থান আর এক জন সম্পূর্ণরূপে দখল করিতে পারিবে না। ইংরাজী jump ও leap ক্রিয়ার ব্যবহারে যে পার্থক্য আছে এই প্রসঙ্গে তাহাও লক্ষ্য করা যায়।

'দোলা' ও 'ঝোলা' সমার্থক। অভিধানে একের অর্থ বলিয়া অন্য শব্দটির ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নিরুপায় হইয়া প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিলেও শব্দ দুইটিকে পুরাপুরি একার্থক বলা যায় না। দোলার অগ্রপশ্চাৎ গতি আছে দোলনায় তার টের পাওয়া যায়। কেবল অগ্রপশ্চাৎ কেন চক্রাবর্ত গতিও আছে, নাগরদোলায় সেটা দেখিতে পাই। যে 'চতুর্দোলায়' চড়িয়া বর বিবাহ করিতে যায় তাহা চারিদিকে দোলে না, এবং বস্তুটাও দোলনা নয়, তাহা একটা শিবিকা মাত্র। চারিজন বাহক বহন করিয়া লইয়া যায় বলিয়া নাম হইয়াছে চতুর্দোলা। তবে 'দোলা' কথাটা নিরর্থক নয়। এক সময় দোলাটাকেই বহনপাত্ররূপে ব্যবহার করা হইত। স্ত্রীলোক বা রোগীকে বহন করিবার জন্য যে ডুলির প্রচলন কিছুকাল আগেও গ্রামাঞ্চলে দেখিয়াছি—এবং যাহা এখনো সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই—তাহার সহিত দোলার সম্পর্ক আছে। ডুলির মূল দোলিকা। দোলার স্থান অধিকার করিল শিবিকা, তখনো পূর্ব নামটা রহিয়া গেল। তবে মনুষ্যস্কন্ধে বাহিত হয় বলিয়া দোদুল্যমানতা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না। দোলায় গতি আছে, ঝোলায় গতির অভাব বা অল্পতা। কলিকাতায় অফিসের ফেরত গৃহমুখী ট্রামযাত্রীরা যখন বাদুড়-'ঝোলা' হইয়া ফিরিতে থাকেন তখন তাঁহারা যে একেবারে নড়েন না তাহা নহে, তবে সে নড়াটা ঠিক দোলার পর্যায়ে পড়ে না। বাংলা অভিধানে কিন্তু 'ঝুলন'-এর অর্থ আছে 'দোলন'। ওইরূপ 'ঝুলা'র অর্থ 'দোলা' এবং 'ঝুলনা'র অর্থ 'দোলনা' দেওয়া হইয়াছে। একদিন ঝুলায় দোলায় হয়তো অমিল ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রায় তাহার প্রমাণ আছে। কিন্তু আজ সহজে বলিতে পারিব না,—'ঝুলা'র প্রতিশব্দ 'দোলা'। গৃহ হইতে ঘর আসিয়াছে তবু আজ 'গৃহ' আর 'ঘর' পুরাপুরি একার্থক নয়। 'খাট' 'চৌকি' 'তক্তাপোশ'ও এই পর্যায়ে পড়ে। 'অনির্বচনীয়' এবং 'অকথ্য' দুইয়েরই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যাহা বলা যায় না। যদি বলি 'বসন্তকালে প্রকৃতি যে শোভা ধারণ করে তাহা অকথ্য' অথবা যদি বলি 'এমন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখে এমন

অনির্বচনীয় অশালীন কটুকাটব্য বাহির হইবে ইহা ভাবিতেও পারি নাই',— তাহা হইলে ভাষারীতি নিশ্চয়ই লজ্জিত হইবে।

মোট কথা, প্রতিশব্দ বলিতে সমার্থক শব্দই বুঝিব তাহা সত্য, তবে অর্থের সেই সমতা মাত্রায় কখনো কিছু বেশী কখনো বা কিছু কম হইতে পারে।

সূক্ষ্ম ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে সর্বাত্মক প্রতিশব্দ সুলভ হইবার কথা নয়। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যাপারে এত চিন্তা করিবার অবকাশ থাকে না। কেহ লেখেন 'সাহিত্যের ইতিহাস', কেহ লেখেন 'সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' আবার কেহ বা লেখেন 'সাহিত্যের ইতিকথা'। উদ্দেশ্য একই। একজন গ্রন্থকারই হয়তো ছোট বড় মাঝারী তিনখানা বই লিখিলেন, তিনটার তিনরকম নাম দিলেন —ইতিহাস ইতিবৃত্ত ইতিকথা। অর্থনীতি, অর্থবিদ্যা, অর্থবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র— Economics বুঝাইতে এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। এই চারিটি ছাড়া আরও দুই একটা থাকিতে পারে। ভাষাতত্ত্বে 'স্বরভক্তি' ও 'বিপ্রকর্ষ' একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণের জন্য আমরা যে ব্যাকরণ পাঠ্যরূপে নির্ধারণ করিয়া থাকি তাহার একটির সংজ্ঞার সহিত আর একটির সংজ্ঞার মিল নাই। অর্থাৎ একটি বিষয় বুঝাইবার জন্য একাধিক সংজ্ঞার ব্যবহার হইতেছে।

ইংরাজীতে he goes এই বাক্যে go ক্রিয়ার কোন্ কাল? আমরা জানি present indefinite। বাংলায় ইহাকে কোন্ কাল বলিব? present মানে বর্তমনে। ইহার মধ্যে দ্বিধা নাই। কিন্তু indefinite? বাংলায় ইহার অর্থ করা হয় 'সাধারণ' 'সামান্য' 'নিত্য' 'নিত্যবৃত্ত'। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়— এই বাক্যের কাল নির্ণয় করিতে দিলে পরীক্ষার্থী যদি 'সাধারণ বর্তমান', 'সামান্য বর্তমান,' 'নিত্য বর্তমান', 'নিত্যবৃত্ত বর্তমান' এই চারিটির যে কোনো একটি লেখে তাহা হইলেই সে পুরা নম্বর পাইবে। ভালই হউক মন্দই হউক এই শব্দগুলি পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসাবে চলিয়া গিয়াছে।

-ইল প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াশব্দগুলিকে কি কাল বলিব? অধিকাংশ ব্যাকরণে 'সাধারণ অতীত' আছে। একটি ব্যাকরণে 'ইদানীন্তন অতীত' দেখিলাম। 'সাধারণ' এবং 'ইদানীন্তন' দুই শব্দের মধ্যে অর্থের মিল নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু কোনো অভিধানে এই শব্দ দুইটির মধ্যে একটিকে অন্যটির অর্থ বলিয়া উল্লেখ করিবে না। তাহা হইলে ইহাদের প্রতিশব্দ বলিব কি? আসলে শব্দ দুইটি এখানে পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। একটি বিশেষ কালবিভাগ সূচিত করিবার জন্য দুইজন বৈয়াকরণ দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দ দুইটি এখানে সাধারণ শব্দের কাজ না করিয়া বৈয়াকরণিক সংজ্ঞার কাজ করিতেছে। দুইটি শব্দ দুইটি স্বতন্ত্র বস্তুর সংজ্ঞা নয়, একই বস্তুর দুই সংজ্ঞা। সে দিক দিয়া প্রতিশব্দ বলিতে বাধা নাই। কিন্তু দেখিতে হইবে দুইটি শব্দেরই সার্বত্রিকতা

গুণ আছে কি না। যদি দেখি 'ইদানীন্তন' শব্দটি সাধারণ অর্থে এই ক্ষেত্রে বেশী প্রচলিত নয়, তাহা হইলে প্রতিশব্দরূপে গণ্য হইবার পক্ষে ইহার যোগ্যতা কম বলিব।

-ইয়াছিল প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের কাল কেহ বলেন 'পুরাঘটিত' অতীত, কেহ বলেন 'তদানীন্তন' অতীত। উপরের মন্তব্য ইহাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

বাংলায় কতকগুলি ধাতু আছে যাহাদের সম্পূর্ণ রূপ মিলে না, অন্য ধাতুর দ্বারা ইহাদের নিজেদের অভাব পূরণ করিয়া লইতে হয়। যেমন,—যায় যাইবে, গেলাম গিয়াছিলাম। যাইবে-র স্থানে গাইবে অথবা গেলাম-এর স্থলে যেলাম হইবে না। যা ধাতুর সম্পূর্ণ রূপ নাই, গি ধাতুরও সম্পূর্ণ রূপ নাই। এই রকম ধাতুকে 'অসম্পূর্ণ' ধাতু বলা হইয়াছে। কেহ বা 'পঙ্গু' ধাতু নাম দিয়াছেন। 'পঙ্গু' এবং 'অসম্পূর্ণ'—ইহারা কি পরস্পরের প্রতিশব্দ? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর তখনই দিতে পারিব যখন নিঃসংশয়ে বলিতে পারিব বৈয়াকরণ যে অর্থে ইহাদের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সার্বত্রিক হইয়াছে অথবা হয় নাই।

বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রসঙ্গে বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে যে শব্দ সমার্থক গণ্য হইতে পারে নির্বিশেষ ব্যবহারে তাহাদের অনাত্মীয়তা অস্বাভাবিক নয়।

এক শব্দের সমার্থক যত শব্দই পাওয়া যাক না কেন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে একটির সঙ্গে আর একটির কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য হয়তো নির্দেশ করা কঠিন কিন্তু উপলব্ধি করা কঠিন নয়। যে কোনো একটি রচনার মধ্য হইতে একটি শব্দ তুলিয়া দিয়া তাহার বদলে অন্য একটি শব্দ বসাইবার চেষ্টা করিলেই এই বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝা যাইবে। 'জল পড়ে। পাতা নড়ে।' এই দুইটি বাক্যের অন্তর্গত চারটি শব্দের স্থলে চারটি প্রতিশব্দ বসাইবার চেষ্টা করিয়া দেখুন।

বাক্যের অভিপ্রেত অর্থের সহিত বক্তার বা লেখকের হৃদয় মন মেজাজের বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাহার মধ্য হইতে একটি শব্দ অদলবদল করিলেই অর্থেরও অদলবদল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কোনো শব্দকেই আর একটি শব্দের সর্বাত্মক প্রতিশব্দ বলা চলে না—এই মতটির মূলে অনেকখানি সত্য আছে।

অর্থের বিভিন্নতা বিচার করিলে প্রতিশব্দকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি শব্দ ধরিয়া শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা দেখা যাক।

১. 'মৃত্যু' ও 'তিরোভাব।' মৃত্যু ও তিরোভাব—এই শব্দ দুইটি সমার্থক বটে। কিন্তু মৃত্যুর বদলে সর্বক্ষেত্রে তিরোভাব ব্যবহার করা চলে না। রামা শ্যামার তিরোভাব হয় না। তিরোভাব হয় মহাপুরুষের। মৃত্যু নির্বিশেষ, তিরোভাব সবিশেষ। তিরোভাব মৃতের মহত্ত্ববাচক। মৃত্যু কথাটি সকলের সম্বন্ধেই ব্যবহার করা চলে। বুদ্ধ খ্রীষ্ট শ্রীচৈতন্য—ইঁহাদের তিরোভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস যখন ইঁহাদের মৃত্যুর কথা আলোচনা করে তখন ঐতিহাসিককে কেহ

দোষ দেয় না। যাঁহাদের তিরোভাব ঘটে তাঁহাদের সকলেরই মৃত্যু হয়, কিন্তু যাঁহাদের মৃত্যু হয় তাঁহাদের সকলেরই তিরোভাব ঘটে না। তিরোভাব, তিরোধান, লোকান্তরপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ, গঙ্গালাভ, পরলোকগমন, পটোল তোলা, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা, ইহলোক ত্যাগ করা প্রভৃতি মরণবাচক কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছই মৃত্যুর মত এমন নির্বিশেষ নয়। তিরোভাব মৃত্যুর প্রতিশব্দ বটে কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়, ক্ষেত্রবিশেষে।

২. 'ধূর্ত' ও 'চতুর'। ধূর্তও চালাক, চতুরও চালাক। কিন্তু চতুরের চাতুর্য মনকে ততটা বিদ্বিষ্ট করে না, ধূর্তের ধূর্ততা যতটা করিয়া থাকে। 'ধূর্ত'-এর মধ্যে নিন্দাভাবটা প্রকট। সমার্থক দুই শব্দের মধ্যে একটি নির্বিশেষ আর একটি নিন্দাবাচক। 'গোঁড়া' ও 'রক্ষণশীল' এই শব্দ-দুইটিকেও ওই পর্যায়ে ফেলা যায়। রক্ষণশীলতা সর্বদা নিন্দনীয় নয়, কিন্তু গোঁড়ামিকে কেহ সমর্থন করে না। নিন্দা বিদ্বেষ বা ঘৃণার মাত্রা কোথাও কোথাও অত্যধিক হয়। যেমন,—পূর্ববঙ্গীয় বাঙাল, মুসলমান নেড়ে, হিন্দুস্থানী খোট্টা বা ছাতুখোর, মাড়োয়ারী মেড়ো, ধৃষ্ট বেল্লিক। আলোচ্য শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত বলা চলে।

৩. 'চুমু' ও 'হামি'। প্রবাসী পিতা পত্রযোগে শিশু সন্তানকে 'চুমু' ও 'হামি' দুইই পাঠাইতে পারেন। চুমুটা নির্বিশেষ। স্বামী-স্ত্রীর পত্রেও এ বস্তুটার আদানপ্রদান চলিতে পারে। কিন্তু 'হামি'টা আদরণীয় শিশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'বেড়ানো' 'বেড়ুকরা', 'জুতা' 'জুতুয়া' প্রভৃতি রূপ তুলনীয়। এই পর্যায়ের একটি শব্দ নির্বিশেষ আর একটি শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪. শিশুর ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যাহা বয়স্ক লোকের মুখে মানায় না। বয়স্কের ভাষায় যাহা 'মনান্তর' বা 'বিচ্ছেদ' শিশুর ভাষায় তাহা 'আড়ি'। 'মনান্তর' বা 'বিচ্ছেদ'কে নির্বিশেষ বলা যায়। কিন্তু 'আড়ি' শিশুর মুখের কথা।

৫. 'ভাজ' 'ভ্রাতৃজায়া'। 'ভ্রাতৃজায়া' নির্বিশেষ। ভ্রাতৃজায়া হইতেই 'ভাজ' আসিয়াছে, অর্থও একই। কিন্তু পুরুষের মুখে ভাজ শব্দের ব্যবহার প্রচলিত নয়। ননদ ভাজ প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলোকের ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়।

৬. 'জলখাবার' 'জলপান'। পল্লীগ্রামে মুড়ি মুড়কি প্রভৃতি খাবারকে জলপান বলা হয়। জলখাবার হিসাবে মুড়ি-মুড়কিরই একদিন সমধিক প্রচলন ছিল বলিয়া জলপান শব্দটি জলখাবার অর্থেই ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতেই ছাত্র-বৃত্তি অর্থে জলপানি শব্দের প্রয়োগ। বর্তমানে জলখাবার ও জলপান-এর অর্থ এক হইলেও ব্যবহারের ক্ষেত্র পৃথক্। 'জলপান' পল্লীবাসীর মুখের কথায় কখনো কখনো শোনা যায়, কিন্তু 'জলখাবার'-এর ব্যবহার সর্বত্র। 'জলখাবার' নির্বিশেষ, 'জলপান' গ্রামের ভাষা।

৭. 'প্রভৃতি' 'দিগর'। দলিল দস্তাবেজের প্রথাসিদ্ধ ভাষায় অনেক শব্দের

ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, যে গুলির অর্থ অভিন্ন হইলেও সর্বত্র প্রয়োগ হয় না। 'প্রভৃতি' ও 'দিগর' একার্থক। কিন্তু প্রভৃতি সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 'দিগর' কেবল আদালতী ভাষায়। 'দিগর'-এর অনুরূপ আরও একটি শব্দ আছে 'বগয়রহ্'। ইহারও একই অর্থ।

৮. আমরা চালের গুঁড়াকে 'চাল গুঁড়ি' বলি, ইহাই নিবিশেষ নাম। কিন্তু ময়রার মুখে ইহার নাম 'সবেদা'। প্রথমটি নির্বিশেষ, দ্বিতীয়টি ব্যবসায়িক। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিশেষত্বের কথাও আসিয়া পড়ে। যেমন—'পাচক' 'বাবুর্চি', 'রান্নাঘর' 'বাবুর্চিখানা'।

৯. 'মার' 'ধোলাই', 'দম্ভ' 'ডাঁট'। মার অর্থে 'ধোলাই' শব্দটি 'রকবাজ' ছেলেদের মুখে শোনা যায়। দম্ভ বা অহংকার অর্থে 'ডাঁট' শব্দও ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। লিখিত সাহিত্যে, অন্ততঃ শিষ্ট সাহিত্যে, এইসব শব্দ এখনো স্থান না পাইলেও, বহুল প্রচলনের ফলে কথ্য ভাষায় শিষ্ট সমাজের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। 'মার' 'দম্ভ' নির্বিশেষ ; 'ধোলাই' 'ডাঁট' অশিষ্ট।

১০. 'প্রবেশ করিল' 'পশিল'। প্রবেশ করিল ও পশিল সমার্থক বটে। কিন্তু 'প্রবেশ করিল'কে যেমন সর্বত্র ব্যবহার করিতে পারি, 'পশিল'কে তেমন পারি না। 'পশিল'র ব্যবহার কেবল কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'জয় করিয়া' 'জিনি', 'লাভ করিলাম' 'লভিনু', 'ত্যাগ করিয়া' 'ত্যজি', 'ছিল' 'আছিলা', 'খনন করিয়া' 'খননি'—এই যুগলশব্দগুলির এক একটি কি অন্যটির প্রতিশব্দ ?

আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে প্রতিশব্দের শ্রেণীর সংখ্যা আরও বাড়ানো যাইতে পারে কিন্তু তাহার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। প্রতিশব্দের যতগুলি বিভাগ এখানে প্রদর্শিত হইল সেগুলিকে দুইটি স্থূল ভাগে বিভক্ত করা চলে, সে বিভাগ নির্ভর করিবে অর্থের প্রকৃতির উপর। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কতকগুলি শব্দের অর্থ তন্মুখী (Objective) আর কতকগুলি মন্মুখী (Subjective)।

যে সকল প্রতিশব্দের অর্থ তন্মুখপ্রধান সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক স্থান-পরিবর্তন কখনো কখনো সম্ভব হইতে পারে। 'চাদর' আর 'উড়ানি' এই দুইটি শব্দের কথাই ধরা যাক। এই দুইটি শব্দ সমার্থক, কিন্তু অংশতঃ। বাঙালীর জাতীয় পরিচ্ছদ 'ধুতি-চাদরের' অন্তর্ভুক্ত যে চাদর তাহাকে 'উড়ানি' বলা চলে। আমরা গরমের দিনে পাঞ্জাবির উপর যে ফিনফিনে পাতলা চাদর গায়ে ফেলিয়া বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাই তাহাকে উড়ানি বলি। শুধু 'চাদর' বলিলেও আপত্তি করি না। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চাদরের অন্য অর্থ। পশমী আলোয়ানকেও চাদর বলি, শয্যাবরণকে চাদর বলা হয়, এমন কি লোহার পাতকেও চাদর বলিয়া থাকি। 'পাতলা' ও 'রোগা' এই শব্দদুইটিও ওইরূপ ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তনসহ। কৃশকায় মানুষকে 'রোগা'ও বলি 'পাতলা'ও বলি। কিন্তু লঘু তরল অঘন প্রভৃতি অর্থে যখন 'পাতলা' শব্দের ব্যবহার হয় তখন তাহার বদলে 'রোগা' বসিবে

না। পাতলা কাপড় পাতলা দই চলিবে কিন্তু রোগা কাপড় রোগা দই চলিবে না।

তন্মুখার্থপ্রধান শব্দের পারস্পরিক স্থানবিনিময় সর্বক্ষেত্রে না হইলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে তাহা দেখা গেল। কিন্তু মন্মুখার্থপ্রধান শব্দের ক্ষেত্রে তাহা প্রায় অসম্ভব। প্রাণত্যাগ করা এবং পটোল তোলার মধ্যে তন্মুখী অর্থের কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু মন্মুখী অর্থের ব্যবধান দুস্তর। ফলে একটির বদলে অন্যটির ব্যবহার সম্ভব হইবে না। মানুষকে যে হত্যা করে সে নরঘাতক সে খুনী, সমাজে সে নিন্দিত। কিন্তু শত্রুকে যে হত্যা করে সে বীর, যত অধিকসংখ্যক শত্রুপক্ষীয় মানুষকে সে হত্যা করিতে সমর্থ হইবে আপন সমাজে তাহার বীর্যবত্তার খ্যাতি সেই পরিমাণেই বাড়িবে। কিন্তু নরহত্যা ও বীর্যবত্তা সমার্থক বলিয়া গণ্য হইবে না। মন্মুখার্থপ্রধান একার্থক শব্দে পারস্পরিক পরিবর্তনের অবকাশ কম। অর্থে মিল থাকিলেও ইহাদের প্রতিশব্দের পর্যায়ে ফেলা কঠিন।

প্রতিশব্দ নিরূপণ করিবার একটি সহজ উপায় হইতেছে বিচার্য শব্দদ্বয়ের বিপরীতার্থের সন্ধান করা। 'সন্ধি' শব্দটির কথাই ধরি। এই শব্দের অনেক অর্থ। যেমন,—সংযোগ বা সংযোগকাল (যুগসন্ধি, বয়ঃসন্ধি), দেহগ্রন্থি, ঐক্যস্থাপন, দুই বর্ণের মিলন, সন্ধান (সঙ্গেতে দামাল নন্দী যে জানে স্বপ্নের সন্ধি।—কবিকঙ্কণ), সিঁধ ইত্যাদি। সন্ধির প্রতিশব্দ কি জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব? 'মিলন'ও বলিতে পারি, 'গ্রন্থি'ও বলিতে পারি, 'সন্ধান'ও বলিতে পারি। প্রসঙ্গের উপর উত্তরের বিশুদ্ধি নির্ভর করিবে। যদি 'সন্ধি' শব্দের দ্বারা দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের কথা চিন্তা করি তাহা হইলে মিলন শব্দটা খাপ খাইতে পারে কিন্তু 'গ্রন্থি' বা 'সন্ধান' কাজে লাগিবে না। 'সন্ধির' বিপরীতার্থক শব্দ অনেক হইতে পারে কিন্তু একটি অতি পরিচিত বিপরীতার্থক শব্দ আছে, সেটি হইল 'বিগ্রহ' অর্থাৎ যুদ্ধ। অর্থের দিক দিয়া ইহা 'মিলন'-এর বিপরীত; 'গ্রন্থি' বা 'সন্ধান'-এর নয়। সুতরাং যুদ্ধ কলহ মনান্তর প্রভৃতি প্রসঙ্গে সন্ধির প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইবার যোগ্যতা কেবল 'মিলন'-এরই আছে 'সন্ধান' বা 'গ্রন্থি'র নাই। গুরু শব্দের অর্থ 'ভারী' ও 'আচার্য'। 'ভারী' শব্দটি তখনই 'গুরু'র প্রতিশব্দ হইতে পারে যখন ইহা লঘুর বিপরীত। 'আচার্য' শব্দটিকে 'গুরু'র প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে যখন দেখিব 'গুরু'র বিপরীত হিসাবে শিষ্য শব্দের প্রয়োগ করা সম্ভব। গুরুনিতম্ব বলিলে যেমন আচার্যের নিতম্ব বুঝাইবে না, গুরুবাক্য বলিলেও তেমনি ভার-সম্পন্ন বাক্য বুঝাইবার কথা নয়। 'স্ত্রী'র প্রতিশব্দ 'নারী'ও হইতে পারে 'পত্নী'ও হইতে পারে। যে স্ত্রীর বিপরীতার্থ স্বামী তাহার প্রতিশব্দ পত্নী, যাহার বিপরীতার্থ পুরুষ তাহার প্রতিশব্দ নারী।

সমার্থক শব্দ নিরূপণ করিবার জন্য বিপরীতার্থের সাহায্য কতকগুলি ক্ষেত্রে

লওয়া চলে বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এ-নিয়ম ফলপ্রদ নয়। খাওয়া অর্থে 'আহার' 'ভোজন' 'ভক্ষণ' এই তিনটি কি পরস্পরের প্রতিশব্দ? অর্থাৎ যে কোনো একটির বদলে কি আর একটি ব্যবহার করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর বিপরীতার্থের সূত্র ধরিয়া পাওয়া যাইবে না। বস্তুতঃ নাওয়া খাওয়া শোওয়া বসা চলা প্রভৃতি ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া আর কি হইতে পারে? সুতরাং সে দিক দিয়া সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের দেখিতে হইবে একই বাক্যের মধ্যে এক শব্দের পরিবর্তে আর কোন্ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি।—আমরা মুখ দিয়া আহার করি, যাঁহারা নিরামিষ আহার করেন, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হন, মিতাহারী ব্যক্তিরা সহসা রোগাক্রান্ত হন না, এবেলা এইখানে আহার করিয়া যাও, অনাহারে অর্ধাহারে কোনো রকমে দিন কাটিতেছে, তিন দিন আহার হয় নাই—উল্লিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যে কয়টি 'আহার' শব্দ আছে সেগুলির পরিবর্তে আর কোনো সমার্থক শব্দ বসানো যায় কি না দেখা যাক্। প্রথম বাক্য 'আমরা মুখ দিয়া আহার করি' ইহার বদলে যদি বলি 'আমরা মুখ দিয়া ভোজন করি'? তাহা হইলে কি বাক্যটির উন্নতি ঘটে? সম্ভবতঃ নয়। 'ভোজন' অপেক্ষা 'আহার'টাই বেশী সংগত মনে হয়। 'আমরা মুখ দিয়া ভক্ষণ করি' এটা কেমন হইবে?—এটা শুনিতে আরও খারাপ মনে হইতেছে। দ্বিতীয় বাক্যটিতেও ভোজন যদি বা চলে ভক্ষণ কিছুতেই চলিবে না। 'মিতাহারী'র স্থলে 'মিতভোজী' চলে, 'মিতভক্ষী' অসম্ভব। চতুর্থ বাক্যেও 'আহার'এর স্থলে ভোজন চলিলেও 'ভক্ষণ' চলিবে না। 'অনাহার' 'অর্ধাহার'-এর বদলে 'অভোজন' 'অভক্ষণ' বা 'অর্ধভোজন' 'অর্ধভক্ষণ' কখনোই চলিবে না। 'তিনদিন আহার হয় নাই'-এর স্থলে 'তিন দিন ভক্ষণ হয় নাই' কখনো বলিব না। এমন কি 'তিন দিন ভোজন হয় নাই' বলিলেও ভাল শুনাইবে না। তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা দেখিতেছি 'আহার'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'ভোজন' শব্দটা অনেকদূর পর্যন্ত চলে কিন্তু 'ভক্ষণ' একেবারেই চলে না।

'ভক্ষণ' ক্রিয়াটায় খাওয়া বুঝায় বটে কিন্তু তাহার সহিত একটা জান্তবতার ছোঁয়াচ আছে, ভক্ষণ ব্যাপারটা নির্দোষ নয়। 'বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে ভক্ষণ করে', 'যেই রক্ষক সেই ভক্ষক'—এস্থলে ভক্ষ্ ধাতুর প্রয়োগ দিব্য চলে। খাওয়া অর্থে 'অদন' 'অশন' প্রভৃতি আরও শব্দ আছে। অভিধানে 'খাদন' শব্দ পর্যন্ত ধরা হইয়াছে। কিন্তু পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসাবে সব কয়টি শব্দকে যত্র তত্র ব্যবহার করা যায় না।

আসল কথা, প্রচলনই প্রতিশব্দের মুখ্য নির্দেশক। যে শব্দ যে অর্থে এক জায়গায় ব্যবহার করার কথা কল্পনা করা যায় না সেই শব্দ সেই অর্থেই আর এক প্রসঙ্গে স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইতেছে। অন্ন খাদ্য ভক্ষ্য ভোজ্য—এই শব্দগুলির অর্থ প্রায় একই, কিন্তু যে কোনো স্থানে যে কোনোটিকে ব্যবহার করা যাইবে না। স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থে ব্রাহ্মণকে যে চাল ডাল ইত্যাদি খাদ্য

বস্তু উৎসর্গ করি তাহা 'ভোজ্য'। তাহা 'খাদ্য'ও নয়, 'ভক্ষ্য'ও নয়, 'আহার্য'ও নয়। আর কিছুদিন পরে পিতৃপুরুষ আমাদের হাত হইতে যাহা পাইবেন তাহার নাম 'রেশন'। তাহাও অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অখাদ্য অনাহার্য এবং অভক্ষ্য কিন্তু বহুল প্রচারের ফলে একদিন উহাই খাদ্য শব্দের প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়াইলে বিস্মিত হইব না।

প্রাচীন বাংলা ভাষার বানান পদ্ধতি

পুরাতন বাংলা পুঁথির বানানে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না এইরূপ একটি ধারণা আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই ধারণাটি কি সম্পূর্ণ সত্য? একটু অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে প্রথম দৃষ্টিতে যাহাকে অনিয়ম বলিয়া মনে করা হয় তাহার মধ্যেও কয়েকটা নিয়মের সূত্র আবিষ্কার করা যাইতে পারে। সে নিয়ম আদ্যন্ত নীরন্ধ্র ও নির্বিকল্প না হইতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্য হইতেই তৎকালীন লিপিকারগণ কোন্ ধ্বনি বুঝাইতে সাধারণতঃ কোন্ বর্ণ ব্যবহার করিতেন তাহার একটা নির্দেশ পাওয়া যাইবে। যে যে স্থলে বিকল্প বর্ণের ব্যবহার হইয়াছে সে সকল স্থলে ব্যবহৃত বর্ণের সংখ্যানুপাত বিচার করিয়াও তাঁহাদের পক্ষপাত নিরূপণ এবং সে পক্ষপাতের কারণ অনুসন্ধান করা চলিতে পারে। তাহারও প্রয়োজন আছে।

বাংলা পাণ্ডুলিপির অভাব নাই। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা বহু সহস্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির বয়স লইয়া মতভেদ থাকিলেও তাহার প্রাচীনত্ব লইয়া মতান্তর নাই একথা প্রায় জোর করিয়া বলা যায়। প্রধানতঃ ওই পুঁথিকে অবলম্বন করিয়াই আমরা এই আলোচনায় অগ্রসর হইব। চর্যাপদের পাণ্ডুলিপিও তুলনা করিব।

প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণকালে সম্পাদকগণ অনেক সময় পুঁথির বানান শোধন ও সংস্কার করেন। অর্থাৎ সম্পাদকের ধারণায় যাহা অশুদ্ধ আপন মত অনুযায়ী তাহার পরিবর্তন করেন। সর্বসাধারণের পাঠ্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারতের ক্ষেত্রে এরূপ সম্পাদনা সমর্থিত হইতে পারে, কিন্তু গবেষকের কাছে এরূপ গ্রন্থের মূল্য অনেক কমিয়া যায়। ভাষাবিজ্ঞান যাঁহাদের আলোচনার বিষয় এইরূপ শোধিত 'সংস্কৃত' সংস্করণ তাঁহাদের কিছুমাত্র কাজে লাগে না। সৌভাগ্যক্রমে বাংলার প্রাচীনতম দুইটি নিদর্শন চর্যাপদ (চর্যাচর্যবিনিশ্চয়) ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থ দুইটি যথাযথ মুদ্রিত করিয়াছেন। মূল কবি বা কবিগণের অনুসৃত বানানের পরিচয় তাহাতে পাই বা না পাই যে লিপিকারদের

হাতে প্রাপ্ত পুঁথিগুলি লিখিত তাঁহাদের হাতের, স্মৃতরাং তাঁহারা যে কালের মানুষ সেই কালের, বানানরীতির কতকটা পরিচয় পাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল পুঁথি থাকায় সন্দেহস্থলে পাঠ মিলাইয়া লইবারও সুযোগ পাওয়া যাইতেছে।

একটি বা দুইটি পুঁথি অবলম্বন করিয়া একটা যুগের বানানপদ্ধতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এমন কি একই কালের একাধিক পুঁথিও যথেষ্ট সহায়ক হইবে না যদি সেই পুঁথিগুলি একই অঞ্চলের লিপিকারদের হাত হইতে বাহির হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ছিলেন রাঢ়ের মানুষ, বীরভূমের অধিবাসী। কেহ কেহ তাঁহাকে বাঁকুড়ায় টানিতে চান। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা লইয়া তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, বাঁকুড়া ও বীরভূমের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য অল্প, সেকালে অল্পতর ছিল।

আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে স্থূলতঃ রাঢ় বাংলার পুরাতন নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতেছি এবং ইহাতে যে বানানরীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহাকে পুরাতন বাংলার (রাঢ়ীয় বাংলার বলিতে হয় বলুন) বানানরীতির আদর্শ বলিয়া ধরিতেছি। হাতের লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের নয় তাহা একরকম স্থিরীকৃত হইয়াছে। তথাপি বানানপদ্ধতি তাঁহারই। লিপিকারের হাত পড়ায় সে বানান একটু আধটু এদিক ওদিক হইতে পারে কিন্তু মূল লেখকের বানানরীতি পরিবর্তিত হইবার কারণ নাই।

বানানে স্বরবর্ণ প্রয়োগের রীতিটি প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এখানে আমরা কেবলমাত্র অ-ও, অ-আ, ই-ঈ, উ-ঊ এই কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আধুনিক বাংলায় 'অ' এবং 'ও' লইয়া একটা সমস্যার উদয় হইয়াছে। নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রথম স্বর কি? 'অ' না 'ও'? 'অছি কচু কপি খোয়ে (বেল) ননী পরী পোড়েন মোজুদ মোতি মোদো (মহুয়া) সোয়ার (ঘোড়) হবুচন্দ্র গোবুচন্দ্র পোইতা অজুহাত অছিলা কোতল ঘড়েল তোয়ের দোখনে নতুন বোড়ে মকদ্দমা মশগুল মোউ হলুদ মোহন্ত' ইত্যাদি। এই জাতীয় বহু শব্দের আদ্যস্বরে বিকল্প প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা ছাড়া আদিতে অকার যুক্ত বহু ক্রিয়াপদের আদ্যক্ষরেও এই সমস্যা। √হ ধাতু হইতে 'হল' না 'হোল'? 'হত' না 'হোত'? √কর্ ধাতু হইতে 'করেছে' না 'কোরেছে'? 'করত' না 'কোরত'? √বল্ ধাতু হইতে 'বলে' না 'বোলে'? 'বলতে' না 'বোলতে'?

অন্ত্যস্বরে বিপদ আরও বেশী। -ত, -ইত, -ল, -ইল, -ছিল প্রত্যয়ান্ত অতীত কালের সকল ক্রিয়াপদেরই বিকল্প ব্যবহার চলে, এবং দুই প্রকার অনুজ্ঞাতেও অবস্থা একরূপ। উত্তম পুরুষের ভবিষ্যতেও তাহাই।

ক্রিয়াপদ ছাড়াও শব্দপদ অনেক আছে। যেমন, 'কোন কত আধ (আধো

আধো) ভাল বার (দ্বাদশ) দড় আঠাল' না 'কোনো কতো আধো ভালো বারো দড়ো আঠালো' ?

শব্দমধ্যস্থ বর্ণেও কোথাও কোথাও সংশয় দেখা দেয়। যেমন, 'আদবে আপস তুলট থিতবে পৌছল দুপর এচড় তুখড়' না 'আদোবে আপোস তুলোট থিতোবে পৌছোল দুপোর এঁচোড় তুখোড়' ?

আধুনিক বাংলার এই অ-কার ও-কার সমস্যাকে স্মরণে রাখিয়া পুরাতন বানানে অ-কার ও-কার প্রয়োগের পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

আধুনিক বাংলা বানানের অ এবং ও-এর বিকল্প ব্যবহারের কারণ কি ? কারণ সুস্পষ্ট। অ-বর্ণের উচ্চারণ স্থানবিশেষে ও হইয়া গিয়াছে। একদিন যেখানে অ লিখিয়া অ উচ্চারণ করিতাম আজ তাহারই কয়েক স্থলে অ এবং কয়েক স্থলে ও উচ্চারণ করি, আবার কোথাও কোথাও অ এবং ও-এর মধ্যবর্তী একটা অনির্দিষ্ট উচ্চারণও শোনা যায়। ও ধ্বনি যতই প্রবলতা, প্রসার এবং প্রাধান্য পাইতে থাকে ততই বানানে অ-এর পক্ষে অচঞ্চল থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। পূর্বে উদ্ধৃত শব্দগুলির যুগ্ম বানানই তাহার দৃষ্টান্ত।

উচ্চারণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বানানের পরিবর্তন হইলেই সমস্যা মিটিয়া যাইত, কিন্তু মানুষের হাত তাহার জিহ্বা অপেক্ষা অনেক বেশী রক্ষণশীল বলিয়া একদিনে সে পরিবর্তন হইতে দেয় না। তাহারই ফলে বানানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সকল বর্ধিষ্ণু এবং গতিশীল ভাষার ক্ষেত্রেই এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। ইংরেজী ভাষার বানানরীতিই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পুরাতন বাংলায় অ এবং ও স্বরের ব্যবহার সম্পর্কে তেমন কোনো সংশয় ছিল না। একালে অ-কারের উচ্চারণ যেমন অনেকখানি সংবৃত হইয়া আসিয়াছে সেকালে তেমন ছিল না, অন্ততঃ ততটা ছিল না। এখন অ-এর বিবৃত উচ্চারণ বিরল। পদান্তের অ-স্বর ও হইয়া যায়। পদমধ্যবর্তী অ-এর অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। পদের আদিতেই অ-কে বিবৃতরূপে পাওয়া যায়, সেও কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে, কিন্তু পুরাতন বাংলায় অ-এর বিবৃত উচ্চারণ এতখানি আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই। তাই অ এবং ও ব্যবহারের ক্ষেত্র অনেকটা নির্দিষ্ট ছিল।

প্রথমে পদান্তস্থিত ও-কারের কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্ত্য ও-কারের দেখা কদাচিৎ মিলে। উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ সর্বকালেই চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত ও গ্রহণ করে। যেমন 'আইলোঁ আছিলোঁ আণিলোঁ আয়িলোঁ করিলোঁ খেপিলোঁ চড়িলোঁ ছাড়িলোঁ জাণাইলোঁ পারিলোঁ আণাওঁ এড়াওঁ কহোঁ জীওঁ ঝুরোঁ যাওঁ ধরোঁ নহোঁ নারোঁ যাচোঁ পুছোঁ এড়িবোঁ আণাইবোঁ খায়িবোঁ জায়িবোঁ দিবোঁ চিন্তিবোঁ নারিবোঁ পিন্ধিবোঁ তেয়াগিবোঁ' ইত্যাদি।

'আয়িলাহোঁ জিলাহোঁ পড়িলাহোঁ বাড়িলাহোঁ' প্রভৃতিও উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।

অন্ত্য ওঁ-র চন্দ্রবিন্দু কয়েক স্থলে লুপ্ত হইয়াছে। যেমন, 'আইলো আছিলো আণো কহো কৈলো খাইলো চুম্বো' ইত্যাদি।

দুই চারিটি ক্ষেত্রে ও-কারও লুপ্ত হইয়াছে। তবে তাহার সংখ্যা নিতান্তই কম। সুতরাং উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার পদান্তে ও-কার থাকাই রীতি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি, অন্ত্য অ-কার ব্যতিক্রম।

প্রাচীন বাংলায় উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে অন্ত্য ও-কারের ব্যবহারে মোটামুটি একটা নিয়ম অনুসরণ করা হইত। ও-কারবিহীন উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ দুই চারিটির বেশী দেখা যায় না। যেমন, 'আসি যাই দেখি চাহি রহি লই জাণী সুণী'। এগুলির মধ্যে কয়েকটি কর্মভাববাচ্যের রূপও হইতে পারে। বাকী সবই ও-কারান্ত। এই ও-কারান্ত ক্রিয়াপদগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

(১) বর্তমান কাল। মূল ধাতু+ওঁ।—'কহোঁ হওঁ কাটোঁ পুছোঁ ঘাটোঁ ঝুরোঁ তোলোঁ চাহোঁ নহোঁ ধরোঁ পৈসোঁ বুলোঁ যাওঁ জীওঁ গাওঁ নারোঁ'। 'আণো খোজো চুম্বো' ইত্যাদি।

মূল ধাতু+অ+ওঁ।—জাণওঁ পইসওঁ পরসওঁ বোলওঁ। মূল ধাতু+আ+ওঁ। প্রেরণার্থে অথবা স্বার্থে ণিজন্ত।—'আণাওঁ বুঝাওঁ খেলাওঁ পোহাওঁ যোগাওঁ'।

মূলধাতু+ইআর+ওঁ।—'কহিআরোঁ'।

ওঁ-এর এর স্থলে কোথাও কোথাও এ্যোঁ বসিয়াছে। যেমন, 'পাওঁ পাএ্যোঁ, জীওঁ জীএ্যোঁ'।

(২) অতীত কাল। মূল ধাতু+ইল+ওঁ। ওঁর স্থলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ও।—'আইলোঁ আছিলোঁ ছুয়িলোঁ জাগিলোঁ ছাড়িলোঁ বসিলোঁ বান্ধিলোঁ জিণিলোঁ খেপিলোঁ উপেখিলোঁ উদ্ধারিলোঁ নেহালিলোঁ নির্ম্মাইলোঁ পাঠাইলোঁ পাতিলোঁ পালিলোঁ'। 'আইলো আছিলো চড়াইলো'।

ধাতুর -ইল বিভক্ত্যন্ত রূপ+আহ+ওঁ।—'আয়িলাহোঁ জিলাহোঁ পড়িলাহোঁ হৈলাহোঁ'।

মূল ধাতু+ইত+ওঁ।—'দিতোঁ, মরিতোঁ'।

(৩) ভবিষ্যৎ কাল। মূল ধাতু+ইব+ওঁ। 'আণিবোঁ আণায়িবোঁ রহিবোঁ চিন্তিবোঁ জাণায়িবোঁ ছাড়ায়িবোঁ থুয়িবোঁ নাসিবোঁ (না আসিবোঁ) নারিবোঁ নিবেদিবোঁ'।

ভবিষ্যৎ কালে ওঁ-এর পরে স্বার্থে ক বা র প্রত্যয়ের ব্যবহার কয়েকটি স্থলে দেখা যায়। যেমন 'দিবোঁর, নিবোঁক'। এক্ষেত্রে ও-কারটি থাকিলেও উহা আর অন্ত্য ও-কার রহিল না।

উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যতীত শব্দান্তে ও-কারের ব্যবহার বিরল। দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র দেখা যায়।

হো বা ও অনুসর্গ যোগে। আধুনিক বাংলায় আমরা even এবং also অর্থে যে 'ও' অব্যয়টির প্রয়োগ করি তাহা তখনও ছিল। ইহা ছাড়া আরও একটি অব্যয় ছিল হো। ও আসিয়াছে অপি হইতে আর হো আসিয়াছে খলু হইতে।

ও যখন কোনো শব্দের পাশে বসে তখন শব্দান্তস্থিত ব্যঞ্জনের সহিত ও-কার রূপে সংযুক্ত হইয়া যায়। ব্যঞ্জনের সহিত যে স্বর পূর্ব হইতে সংযুক্ত ছিল তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া দেয়। যেমন, একো (একও নয়), তাহাকো (তাহাকেও নয়), কাহাকো (কাহাকেও নয়)। 'একো তাহাকো' প্রভৃতি শব্দকে ও-কারান্ত বলিতে হইবে।

ও অপেক্ষা হো-র ব্যবহারই বেশী। যেমন, 'এহো সেহো তাহাকেহো তোহ্মাহো অদ্যাপিহো তবেঁহো'। হো এখানে ও-এর মত শব্দের সহিত অঙ্গাঙ্গী হইয়া যায় নাই কিন্তু শব্দের অঙ্গীভূত হইবার দিকেই যে তাহার প্রবণতা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি তাহার প্রমাণ। 'কথো (কত+হো), এখো (এক+হো), এভোঁ (এবেঁ+হো), কোহ্নো (কোন+হো), কভোঁ (কবেঁ+হো), তভোঁ (তবেঁ+হো), আহ্রো (আর+হো)'।

'এহো সেহো তাহাকেহো তোহ্মাহো' প্রভৃতি শব্দকে ও-কারান্ত বলিতে আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু 'কথো এখো এভোঁ তভোঁ আহ্রো'-কে ও-কারান্ত শব্দ অবশ্যই বলিব।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই সকল ক্ষেত্রে ও-কারের বিকল্প নাই। পদান্তস্থিত ও-কারের আর দুই একটি উদাহরণ দিই।

'উদাওঁ' (<উদ্দাম)। পদান্তস্থিত ম যখন ম-ত্ব হারায় ওঁ-রূপ গ্রহণ করে। উদ্দাম তাই উদাওঁ হইয়াছে। উদাঅঁ হয় নাই। বস্তুতঃ অঁ-অন্ত কোনো শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখি নাই।

'ছো' (ছু+অ) একাক্ষর ও-কারান্ত অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদ। অর্থ—স্পর্শ কর। অনুজ্ঞার ও-কারান্ত পদ এই একটি মাত্র পাওয়া যায়। সর্বত্রই অ-কারান্ত। যেমন,—'আইস বইস স্থণ স্থণহ রাখ রাখহ দেহ তেজ (ত্যাগ কর) তেজহ জাণহ দিআর কর ঘুচ'। ছো-র ক্ষেত্রে যে ওকার দেখিতেছি তাহাও মূলতঃ অ। অব্যবহিত পূর্ববর্তী উ-এর প্রভাবে ও হইয়াছে ।

লো গো তো এই একাক্ষর অব্যয়গুলি ও-কারান্ত, কিন্তু ইহাদের বিকল্প ল গ ত রূপও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যুগপৎ দেখা যায়।

পো। পুত্রার্থক 'পো' এবং বিকল্প 'পোঅ' দুইটি রূপই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই। 'পোঅ' যেমন পো এর পূর্ববর্তী রূপ, 'ছোঅ' তেমনি ছো এর পূর্ববর্তী রূপ, শেষের অ লুপ্ত হইলে পো এবং ছো থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছোঅ নাই কিন্তু থাকিতে পারিত। শয়ন কর অর্থে 'সোঅ' আছে। বাঁচাও অর্থে 'জিআঅ' আছে। বিকল্প 'জিআ' রূপও আছে।

পোহো, মোহো। পো-এর বিকল্পে একটি পোহো পদ পাইতেছি। এই পোহো-র হো কিন্তু অপ্যর্থক হো নয়।

এবেঁ কেহে রাধা পাতসি মায়া মোহো।
এহা ত না ভুলে আর নান্দের পোহো ॥
—রাধাবিরহ।

মোহোর সহিত মিল রাখিবার জন্য পোহো করা হইয়াছে। পূর্বেই দেখিয়াছি পুত্র হইতে (পুত্র) পো সহজ ভাবেই আসে এবং তাহাই সর্বত্র আছে কিন্তু এস্থলে শুধু পো থাকিলে ছন্দে বাধিয়া যায়। মোহো বানানটি লক্ষণীয়। 'মোহ'-এর হ-এ ও-কার দেওয়ার কোনো সংগত কারণই নাই, এই হো মো-এর ও-স্বরের প্রভাবের ফল।

পদমধ্যে ও-কার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ-মধ্যস্থিত (আদ্য ও অন্ত্য নয়) ও-স্বর বিরল। তৎসম বা প্রায়-তৎসম কয়েকটি শব্দে মধ্যবর্তী ও-কারের দেখা পাওয়া যায়। যেমন, 'দামোদর সহোদর যশোদা মনোরথ উপভোগ আরোপ আরোপিল চকোর বিমোচিলোঁ অশোক হিলোল (<হিল্লোল) প্রবোধিআঁ প্রবোধিতেঁ সম্বোধ সম্বোধেঁ'।

যে-সব শব্দের আদ্যস্বরে ও-কার আছে তাহাদের পূর্বে নঞর্থক অ বা আ বসিলেও ও-কারের পরিবর্তন হয় না। যেমন, 'অকোপ অবোল আবোল আঘোর আতোষ'। এই সকল শব্দের ও-কারকে কার্যতঃ আদ্য ও-কারই বলা উচিত।

আঁকোড় (< অঙ্কোট) এবং আকরোল (< আক্ষোট) শব্দে কো এবং রো-এর ও-কার মূল শব্দের প্রভাবজাত।

আঁওলা (< আমলক) শব্দে ম হইয়াছে ওঁ। উদাওঁ তুলনীয়। ওঁ-এর নাসিক্যধ্বনি পূর্ববর্তী আ-স্বরে আশ্রয় লইয়াছে। নোআঁইল > নোঁআইল (নম্ > নবঁ > নোঁ)।

অপর হইতে প্রাপ্ত আওর শব্দের মধ্যে ও-স্বর আছে বটে কিন্তু অ-স্বরও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। 'আওর' এবং 'আঅর' দুই বানানই যুগপৎ পাওয়া যাইতেছে।

শব্দ-মধ্যবর্তী ও-স্বর আর কয়েকটি শব্দে দেখা যায়। অহোনিশি, —শী (<অহর্নিশ)। অন্ততঃ সাতবার এই শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। হো একবারও হ হয় নাই। চর্যায় অহণিশি পাই।

নান্দো। নান্দোঘরে এবং নান্দোবালা শব্দে ন্দ-এ ও-কার কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। অ-কারান্ত নান্দ শব্দেরও অভাব নাই। যেমন, 'নান্দসুত, নান্দঘোষ'।

বাটোআড়, বাটোয়াড়ী। বাটোআড় একবার এবং বাটোয়াড়ী একবার ট-এ ও-কার বানান দিয়া পাওয়া গিয়াছে কিন্তু বাট (<বর্ত্ম) শব্দ একবারও বাটো

হয় নাই। বাটোআড় শব্দ ব-শ্রুতির সুন্দর নিদর্শন। প-ধ্বনি লুপ্ত হওয়ায় বাটপাড় হইল বাটআড়। অ-সন্নিহিত আ-এর উচ্চারণসৌকর্যের জন্য অন্তস্থ ব ধ্বনির আগম। বাংলায় অন্তস্থ ব-এর ধ্বনি আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র বর্ণ নাই। ও-কার তাহারই কাজ করিতেছে। বাটোয়াড়ী শব্দে অন্তস্থ য়-এর ব্যবহারও লক্ষণীয়, আধুনিক বাংলার ক্ষেত্রেও ব-শ্রুতির কাজ 'য়' দিয়া চালাইয়া লওয়া হয়। অন্তস্থ ব-এর অভাবে য়-এর ব্যবহার তখনই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

বাটোয়াড়-এর অনুরূপ শব্দ ঘাটোআল (<ঘট্টপাল), রাখোআল (<রক্ষাপাল)। ঘাট (<ঘট্ট) স্বতন্ত্রভাবে অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু ঘাট-আল বানান একবারও পাওয়া যায় নাই। ঘাটআলের ট, হয় ব-শ্রুতির ফলে ও-কার, নয়তো য়-শ্রুতির ফলে ই-কার, গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঘাটোআল এবং ঘাটিআল দুইটি রূপই পাইতেছি।

'বেশোআর' আসিয়াছে বেশবার হইতে। 'আশোআশ' আসিয়াছে আশ্বাস হইতে। এখানেও অন্তস্থ ব-এরই ধ্বনি।

কেরোআল (<কৃপীটপাল), কণ্ঠোআল (<কর্ণ্ঠভাল)। এই শব্দ দুইটিও বাটোআড় ঘাটোআল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। চর্যায় কেডুআল পাই।

আগোলসি অর্গল হইতে। আপোষ এবং আপোঙষ এই দুই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক এই শব্দ দুইটিকে √ পিষ ধাতু হইতে উৎপন্ন মনে করেন। ভিলোল আর একটি শব্দ যাহার মধ্যে ও-কার পাই, সম্পাদক মনে করেন ইহা ভল্লী (অর্থ লোধ্রবৃক্ষ) হইতে আগত। এই চারিটি শব্দের মধ্যবর্তী 'ও' ব্যুৎপত্তির দ্বারা সমর্থিত নয়। 'গোল পোষ লোল' শব্দের প্রভাব এখানে পড়িয়াছে নাকি?

পদের আদিতে ও বা আদ্যক্ষরে ও-কার। তৎসম বা তদনুরূপ শব্দের আদ্য ও বা ও-কার অপরিবর্তিত থাকে। যেমন, 'ওষ্ঠ ওঁকার কোমল গোপাল গোবিন্দ গোকুল তোষ তোষণ ভোজ মোহন যোগ রোগ লোক লোচন লোভ শোণিত শোভ সোদর দোহণী দোষ দোষসি'।

ও-কারান্ত সংস্কৃত শব্দের তদ্ভব রূপেও আদ্য ও-কার অপরিবর্তিত থাকে, যেমন, 'কোঁঅলী (<কোমল), গোঠ (<গোষ্ঠ), গোত (<গোত্র), গোআল, গোসাঞি, ঘোড়াচুল (<গোষ্ঠ-)'।

স্বরসংগতির ফলে উ স্থানে ও অথবা উ-কারের গুণ ও-কার। 'গোটা (<গুট্‌ট <গুর্ত <গৃত), কোঁঅরী (<কুমারী), সোবন (সুবর্ণ), ছোলঙ্গ (<সুরঙ্গ), তোলে, তোলহ'। (তুল তুলিল তুলিবাক তুলিঞাঁ প্রভৃতি উকারাদি পদও আছে)। 'তোহ্মা তোহ্মে তোমার তো তোঞ তোত তোর'। (তুহ্মি তুহ্মী তুঞি শব্দও আছে)। 'মোঞি মোঞে মোকেঁ মো মই মএ (<ময়া';

যোঁআলে (<জুঅ- <যুগ-), যোড়াইতেঁ যোড়িআঁ যোড়িলো যোড়ে'। (যুড়ী যুড়ীবাক জুড়িআঁ জুড়িল জুড়িহে প্রভৃতি উ-কারান্ত পদও আছে)।

ওলাহ ওলাহা (<অব+লভ্) ওহাড় (<অব+বেষ্ট)। সংস্কৃতের অব প্রাকৃতে ও হইয়া যায়। এই জাতীয় আদ্য 'ও' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপরিবর্তিত থাকে। যেমন, 'থোপ' (<স্তবক)।

প্রাকৃতে ঔ নাই। ঔ প্রাকৃতে ও হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঔ হইতে প্রাপ্ত ও আদ্য অক্ষরে বর্তমান থাকে। যেমন, 'চোর গোরা গোরী'।

ছোট শব্দটি অজ্ঞাতমূল, ইহার আদিতে ও, অন্তে অ। আমরা যে একালে 'ছোটো' বানান করিতে যাই পুরাতন বানানে তাহার সমর্থন পাই না।

এবার চর্যাপদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। চর্যার অন্তে ও বা ওঁ-যুক্ত কোনো ক্রিয়াপদই পাওয়া যায় না। উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে ওঁকারের পূর্ববর্তী রূপ হুঁ (এবং হু) বর্তমান। 'অচ্ছহুঁ করহুঁ খেলহুঁ জানহুঁ' তখনও 'অচ্ছোঁ করোঁ খেলোঁ জানোঁ' হয় নাই। ৩৫-সংখ্যক পদে "এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহে" এই ছত্রের 'অচ্ছিলেঁ' শব্দটিকে কেহ কেহ লিপিকর-প্রমাদ বলেন। তাঁহারা মনে করেন হাঁউ যখন কর্তা তখন ক্রিয়াবিভক্তি 'লেঁ' না হইয়া 'লোঁ' হইবে ; লিপিকর 'ো' (ও-কার) লিখিতে 'ে' (এ-কার) লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অচ্ছিলেঁর অচ্ছিলোঁ হওয়া উচিত। অচ্ছিলেঁ ভুল হইতে পারে কিন্তু ওই স্থলে 'অচ্ছিলোঁ'-ই যে বসিবে সে অনুমানের সমর্থনে বলিষ্ঠ যুক্তি নাই।

অন্ত্য ও-কার যুক্ত যে কয়টি শব্দ চর্যায় পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

'ভো লো' (একাক্ষর) এবং 'অলো আলো'—এই কয়টি সম্বোধনবাচক অব্যয়। 'তো মো জো সো' এই চারটি একাক্ষর সর্বনাম এবং 'জইসো তইসো তইসেঁ' এই তিনটি সর্বনামজাত অব্যয়।

অ-কারান্ত তৎসম বা প্রায়-তৎসম শব্দ 'উন্মত্ত শবর বিশেষ' চর্যায় 'উন্মত্তো শবরো বিশেসো' হইয়াছে। প্রাকৃতের ধ্বনিপ্রকৃতি তখনও বর্তমান। প্রাকৃতে অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনে ও-কার আসে। 'বিশেষ, উমত্ত, সবর' রূপও চর্যায় আছে। তদ্ভব শব্দেও দুই একটি ক্ষেত্রে অন্ত অকারের স্থলে ও-কার আছে। যেমন,—ভান্তো (<ভ্রান্ত), রত্তো (<রক্ত)। আর একটি শব্দ আছে 'কিন্তো'। তাহাকে এই দলের মধ্যে ফেলিলাম না কারণ তাহা একটি শব্দ নয়, কিম্ এবং তো দুইটি শব্দ মিলিয়া কিন্তো হইয়াছে। তো শব্দের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

লক্ষ্য করিবার বিষয় একাক্ষর অ-কারান্ত শব্দ তিনটি মাত্র আছে। 'ম, ণ'

এবং 'থ'। ম-এর বিকল্প মো পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য দুইটির বিকল্প ও-কারান্ত রূপ নাই।

চর্যাপদে শব্দমধ্যবর্তী ও-কার নাই বলিলেই হয়। স্বমোহ, চৌকোটি, সংবোহেঁ, মনগোঅর, দুখোলেঁ, উল্লোলেঁ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দে যে ও-কার দেখিতেছি ওগুলি কার্যতঃ মোহ, কোটি, বোহ, গোঅর, খোল, লোল এই শব্দগুলির আদ্যস্বর। একটি শব্দ আছে দুন্দোলী। ইহার মধ্যস্থ ও-কারটিও দোল শব্দের আদ্যস্বর।

মোহোর শব্দে হো-এর ও-কার মো-এর প্রভাবজাত।

চর্যায় আদ্য ও-কার। মূল সংস্কৃত শব্দের আদ্যস্বর ও-কার হইলে তদ্ভবশব্দের আদ্যস্বরেও সাধারণত ও-কার হয়। যেমন, 'গোঅর (<গোচর), গোহাল (<গোশালা), জোই (যোগী), বোহে (<বোধ), জোইনী (যোগিনী), বোহি (<বোধি), জোহ্না (<জ্যোৎস্না), বোড়ো (<বোড্র), কোঠা (>কোষ্ঠ)'।

উ-কারের গুণে ও-কার। 'তোলি (<তুল্), তোড়িঅ (ত্রুট্), পোথি (<পুস্ত), বোল (ব্রূ), কোঞ্চা (<কুঞ্চিকা), ওড়িআণে (<উর্ধ্বে), হো (<ভূ), সোষই (শুষ্যতি)'।

পরবর্তী অন্তস্থ ব-এর প্রভাবজাত ও। 'দো (<দ্বি), সোনে (<স্বর্ণ), থোপ (<স্তবক)'।

অ, আ, য়। আধুনিক কালে 'অ' 'আ' এই দুইটি স্বর শব্দের আদিতে ভিন্ন স্বতন্ত্র বসে না। মধ্যে বা অন্তে অ স্থানে য় হয়। আ-এর পরিবর্তে য়া লিখি। প্রাচীন বাংলায় অ আ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। যেমন চর্যায়,—'অমিঅ, আদঅ (অদ্বয়), ইন্দিঅ (ইন্দ্রিয়), ইন্দিআল, ইন্দিবিসআ, উআস (উদাস), উইআ (উদিত), উইজঅ (উৎপদ্যতে অথবা উদ্‌বীজয়তি), ওড়িআণে, করঅ, কাঅ, কাঅর, কাআ, কিঅত, কেডুআল গঅণ, গঅবর, গরুআ, গোঅর, চিঅরাঅ, চীঅণ, ছাঅ, জাগঅ, জোড়িঅ, ণিঅ, ণিঅড়, জিহুঅন, জোড়িঅ, টলিঅ, তআগলি (তেয়াগলি)' ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'হাটুআ, হঅ, শেঅ, সেআলী, স্থঅরিআঁ (স্মরণ করিয়া), সোঁঅরি, সিআন, সিঅর, লোটাআঁ, লঅ, মরুআ, বাড়িআল, বহাঅ, বাঅ, পতিআশ, নেআঅ, নেআলী, নাঅ, নঅ (নব), ধাআঁ, দুঅজ, দুআর, দিআর, জিআঅ, জিঅতেঁ, চিআইল, চাহিআঁ, গোআল, গোআলী, ঘড়িআল, গোআরী, গুআ, থঅ, কোঁঅল, কিলাআঁ (কিলায়িআঁ), কণআ, উঠিআঁ, উপাঅ, উথাআঁ, পাথাআঁ, আঅর' ইত্যাদি।

চর্যায় য়-এর ব্যবহার অত্যন্ত বিরল। 'কায়, কায়া, জায়া' এই তিনটি তৎসম শব্দে য় আছে। 'কায় কায়া'র বিকল্প 'কাঅ কাআ' রূপও অবশ্য আছে।

তদ্ভব শব্দে য়-এর ব্যবহার।—'আবয়ি' (<আয়াতি)। 'আবই' রূপও পাওয়া যায়। 'জায়' (<যায়তে), বিকল্প 'জাঅ'। 'নিয়ড্ডী' (<নিকট)। এই শব্দের বিকল্প রূপ নাই বটে, তবে চর্যায় নিকট অর্থে 'নিঅহি' শব্দ পাওয়া যায়। 'কীয়' (<ক্রিয়তে); বিকল্প 'কিঅই' আছে।

চর্যাপদে তখনও প্রাকৃত অপভ্রংশের ধ্বনিসংস্কার প্রায় পুরাপুরি বর্তমান ছিল। দুইটি স্বরধ্বনির মধ্যে শ্রুতিধ্বনির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। যেখানে শ্রুতিধ্বনির প্রয়োগ হইয়াছে সেখানেও পুরাতন বিকল্প বানান সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আসিয়া দেখি শ্রুতিধ্বনির ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। চর্যায় অ+অ (অদঅ সঅল গঅণ), আ+আ (মাআ, কাআ, উথাআঁ পাথাআঁ), আ+অ (জাঅ, রাঅ, মাঅ, ভাঅ, নাঅর, কাঅর), অ+আ (কণআ, বলআ) সবর্ণদ্বয় শ্রুতিধ্বনির মধ্যস্থতা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'মাঅ, রাঅ, বাঅ, বাআঁ (বাজাইয়া), পাঅ,' যেমন পাই; তেমনই 'মায়া, আয়ব, গায় (গাত্র), জায়, নয় (নব) বহায় (বহন করাও), বলয়া, ভায়, লয় (লহ), শয়ানে, সয়ান, হয় (হও)' রূপও মিলে। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই শ্রুতিধ্বনির ব্যবহার বাড়িতে লাগিল।

অ-আ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদ্যস্বর অনেক স্থলে আ হইয়া গিয়াছে। শব্দের আদিতে স্বরাঘাত হওয়ায় অ-এর পরিবর্তে আ-এর প্রয়োগ হইয়া থাকিবে। যেমন, 'আঙ্গ, আপরাধ, আতি, আগরু, আঙ্গার, আঘোর, আঞ্চল, আধিকার, আতোষ, আধর, আন্ধকার, আনুখর, আনুপাম, আনুবন্ধ, আনুগতি, আনুমতি, আনাথী, আবথা, আপমান, আপযশ, আভিরোষ, আভাগিনী, আর্জ্জুন, আশমান (অসম্মান), আষ্টম, আসুর, আহুল্যা, আন্ত (অন্ত), কাঙ্কন, কাঞ্চুলী, কান্ধ, চান্দ, চাণ্ডাল, ছান্দ, পাঞ্চ, পাঞ্জর, পান্তী (পঙ্‌ক্তি), মাহাদানী, রান্ধন, লাম্ফ, বারিষা'। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরাতন রূপও বিদ্যমান। যেমন, 'অই, অঘোর, অতি; অন্তর, অনুমতী, অনাথী, অবস্থা, অপমান, পঞ্চ, চন্দ্র, ছন্দ, মহা' এই বিকল্প রূপগুলিও পাওয়া যায়।

চর্যাপদেও শব্দের আদিতে অ কোথাও কোথাও আ হইয়াছে। কোথাও কোথাও মূল অ-ই বর্তমান। যেমন, 'আঙ্গল, কাঙ্কণ, চান্দ'। কিন্তু 'আচার অচার, কান্ধ কন্ধারা, ছান্দ ছন্দা, তান্তি তন্তে, পাঞ্চ পঞ্চ, ভান্তি ভন্তি, কাপালি কপালী, আচ্ছ অচ্ছ অচ্ছিলে। অচ্ছিলেসি'।

ই-ঈ। আদিতে ই বা ঈ আছে এমন শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অধিক নাই। ই-আদি শব্দ এই কয়টি আছে। 'ই, ইঙ্গিতকারে, ইছসি, ইছাএ, ইচ্ছসি, ইঞ্চলা, ইথে, ইরে, ইশর (ঈশ্বর), ইহ, ইহার'।

ঈ-আদি শব্দ এই কয়টি।—'ঈঙ্গিতেঁহে, ঈশর (ঈশ্বর), ঈষত'।

এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে দেখা যাইতেছে, হ্রস্ব ই-এর ব্যবহারে কোনো অনিয়ম নাই। কেবল 'ইশর' শব্দের হ্রস্ব-ই সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। কিন্তু 'ইশর' তো তৎসম শব্দ নয় সুতরাং আপত্তিটা অকাট্য নয়। অবশ্য বিকল্প 'ঈশর' বানানও আছে। ঈ-আদি শব্দগুলির মধ্যে লেখক অথবা লিপিকরের সাবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক 'ঈঙ্গিত' ছাড়া বাকী সব কয়টি শব্দেই তিনি মূল সংস্কৃত শব্দের বানান অনুসরণ করিয়াছেন, যেমনটি আমরা একালে করিয়া থাকি।

ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত আদ্য ঈ-কার ই-কারের দৃষ্টান্তগুলি এবার দেখা যাক। 'কি, কিঙ্কিনী, কিছু, কিনিতেঁ, কিবা, কিমনে, কিল, কিরীত (কীর্তি), কিশলয়, কিসক, খিধা (ক্ষুধা), খিণী (ক্ষীণ), গিআ, গিএ (গ্রীবায়), গিধিনী (গৃধিনী), গিরিবর, গিরী, গিরীশ (গ্রীষ্ম), চিআইআঁ, চিআয়িলী, চিকুর, চিত, চিএ, চিনহ, চিনিআঁ, চিহ্ন, ছিণ্ডসি, ছিতে, ছিনারী, ছিলা, জিঅ, জিঅতেঁ, জিআ, জিআল, জিঠী (জ্যেষ্ঠী), জিয়ন্তে, জিলা, ঝি, ঝিআরী, ঝিউ, নিরাকারণে (নিষ্কর্ষণে), তিঅজ, তিথ, তিয়জ, তিরি, তিরীশূলে (ত্রিশূলে), থিতি, থির, দিআর, দিএ, দিশ ধিক, ধির, নিআঁ, নিন্দ, নিতেঁ, নিধুবন, নিবাল, নিবড়ে, নিয়ড়, পিআ, পিআস, পিরিতী, পিসী, পিন্ধে' ইত্যাদি।

বি-উপসর্গযুক্ত সকল পদই বি দিয়া বানান করা হইয়াছে। বি-আদি সংস্কৃত শব্দের তৎসম বা অর্ধতৎসম রূপেও আদিতে বি। যেমন,—'বিকণসি, বিকণিতেঁ, বিচ (বি+√ ক্রী), বিণি, বিহনে, বিহানে, ভিখ, ভিখারী, ভিত, ভিন, মিছ, মিঠ, মিনতী, মিন, রিত', লিখন, লিখিত, লিহে, শিঅরে, শিয়রে, শিআম, শির, শিরিকল, শিরিষ, শিরীষ, সি, সিসরে, সিআণী, সিনান, সিয়রে সিশের, সিসত, হিঅ, হিআ, হিঙ্কী, হিরা, হিত' ইত্যাদি।

শব্দের আদিতে ই-যুক্ত ব্যঞ্জনের অনুপাতে ঈ-যুক্ত ব্যঞ্জনের সংখ্যা অনেক কম। 'কী' দিয়া দুইটি মাত্র শব্দ পাইতেছি ; 'কী', 'কীষে'। 'খী' দিয়াও একটি শব্দ, 'খিনী'র বিকল্প 'খীন'। 'গীএ' (<গ্রীবা)। 'ঘী'। 'চীত, চীর'। 'জীআ জীএ', জীতেঁ, জীবন, জীবার' ইত্যাদি। 'ঝী'। 'নীসারে'। 'তীর্থ তীন'। 'থীর'। 'দীঘল, দীঠি, দীন, দীর্ঘ'। 'নীএ, নীতেঁ, নীব, নীর, নীল'। 'পীএ পীওঁ' ইত্যাদি। 'পীঠ, পীঠি, পীত, পীতরে (পিতৃগণ), পীড়এ'। 'বীর বীষ'। 'ভীতে (দিকে), ভীতর, ভীণে"। 'মীন'। 'লীলা'। 'শীতল, শীতার (সীতার), শীরে (শিরে)'। 'সীকা'। 'হীত'।

উল্লিখিত শব্দগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় তৎসম শব্দে আদ্যস্বর ই প্রায় সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকে। তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দেও ই-স্বরের স্বরূপে থাকারই প্রবণতা দেখা যায়। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে ই স্থলে ঈ এবং ঈ স্থলে ই-এর ব্যবহার ঘটিয়াছে অথবা উভয় ই-কারই নির্বিচারে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,

'পীতরে (<পিতরঃ), নীসারে (নিঃসর), বিচনী (<বীজনী বা ব্যজনী)'। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে হ্রস্ব দীর্ঘ দুই ই-কারেরই ব্যবহার হইয়াছে। যেমন,— 'বিষ বীষ, থিণী থীন, চিত চীত, গিএ গীএ, থির থীর, নিঅা নীএ, শিরে শীরে, হিত হীত. দিঠী দীঠি'।

চর্যায় ঈ-আদি শব্দ আদৌ নাই। ই-আদি শব্দ এই কয়টি পাওয়া যায়। —'ইন্দি, ইন্দিঅ, ইন্দিআল, ইন্দীজানী, ইংদিবিসআ'। এই সবকয়টি শব্দের মূলে আছে—ইন্দ্রিয়। ইহা ছাড়া আর একটি শব্দ আছে 'ইষ্টামালা'।

ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত ই-কার ঈ-কার। ব্যঞ্জনের সহিত আন্ত্যস্বররূপে যুক্ত ই-কার এবং ঈ-কারের মধ্যে ই-কারেরই ব্যবহার বেশী স্তুতরাং সে তালিকা উল্লেখ না করিয়া ঈ-কারযুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত কয়টি তুলিয়া দিলেই কাজ হইবে। এরূপ শব্দের সংখ্যা কুড়ির বেশী হইবে না। তাহার মধ্যেও অন্ততঃ চারিটি তৎসম।

ইহাদের মধ্যে কয়েকটির ই-কারযুক্ত বিকল্প রূপও আছে।—'গীত, চীঅ (বিকল্প চিঅ), চীঅণ, চীএ, চীরা, জীবমি, দীসঅ (বিকল্প দিশঅ), দীসই (বিকল্প দিসই), পীচ্ছ, কীটউ, ফীটা (বিকল্প ফিটঅ, ফিটিল), বীরা, লীলেঁ, লীলে, সীস, সীসা (শিষ)'।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ চর্যাপদেও দেখা যাইতেছে আন্ত্যস্বর হিসাবে ঈ এর ব্যবহার কম।

যে সকল সংস্কৃত শব্দের আন্ত্যস্বর হ্রস্ব-ই সেগুলি তৎসম রূপেই আসুক বা তদ্ভব অর্ধতৎসম রূপেই আসুক তাহাদের আন্ত্যস্বর অপরিবর্তিত থাকে।

হ্রস্ব-ই দুই একটি স্থলে দীর্ঘ-ঈ হইয়াছে। যেমন 'চীঅ (<চিত্ত), চীঅণ (<চিক্কণ), সীস (<শিষ্য)'।

দীর্ঘ-ঈ হইতে হ্রস্ব-ই তে পরিবর্তনও কদাচিৎ দেখা যায়। 'পিটা পিঠ'। শব্দটি দুইবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এখানেও একটা সংশয়ের কারণ থাকিয়া যায়। 'পিটা'র অর্থ পাত্র।

"দুলি দুহি পিটা ধরন ন জাই" পদসংখ্যা ২ এবং "পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে" পদসংখ্যা ৩৩। টীকায় 'পিটা'-র সংস্কৃত প্রতিশব্দ পীঠক থাকায়, পীঠক হইতে 'পিটা'র উৎপত্তি ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। পীঠক বা পীঠ শব্দের পাত্র অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহার দেখা যায় না। আধার পাত্র প্রভৃতি অর্থে বরং পিট ও পিটক শব্দের ব্যবহার আছে। স্তুতরাং 'পিটা'র হ্রস্ব-ই যে দীর্ঘ ঈ হইতে আগত এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। 'পিঠ' ("পিঠত কাচ্ছী বান্ধী" পদসংখ্যা ১৪) শব্দের উৎপত্তিও পৃষ্ঠ হইতে হওয়া সম্ভব। স্তুতরাং এক্ষেত্রেও হ্রস্ব ই-কার দীর্ঘ ঈ হইতে আসিয়াছে একথা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় না।

ঋ-কার হইতে উৎপন্ন দীর্ঘ ঈ-এর দৃষ্টান্ত পাই 'দীসঅ' (<দৃশ্যতে)। আর একটি 'পীচ্ছ' (<পৃচ্ছ)। তবে 'পীচ্ছ'-এর বিকল্প 'পুচ্ছ' আছে। এবং 'পুচ্ছ'-এর সংখ্যাই বেশী।

এবার শব্দ মধ্যবর্তী 'ই ঈ' এর অবস্থা কিরূপ দেখা যাক। তিন বা তদধিক অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের আদ্য এবং অন্ত্যস্বরের মধ্যবর্তী স্বর কতগুলি ই-কার এবং কতগুলি ঈ-কার? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শব্দতালিকা লক্ষ্য করিলে দেখিব মধ্যবর্তী ঈ-কার বিরল। পদমধ্যস্থ ঈ-কার এই কয়টি ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, অন্য সর্বত্র ই। 'আলপমতীএঁ, আনুচীত, উপজীব, কড়ীর, কালীয়, কালীদহ, গহীন, গিরীশ (<গ্রীষ্ম), চুম্বীল, চৌহালীনী, জাণীআঁ, জাম্বীর, তেজীবারে, দেখীলো, বত্তীশ, বিপরীত, ভাঙ্গীল, সচকীত, চরীত, নারীকল'।

'বিপরীত' শব্দটি তৎসম। এখানে ঈ-কার শুদ্ধ। কিন্তু ই-কার যুক্ত 'বিপরিত' শব্দও বিকল্পে আছে। 'আনুচীত'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'উচিত', 'উপজীব'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'উপজিল', 'তেজীবারে'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'তেজিলোঁ' প্রভৃতি পাইতেছি। অনুরূপভাবে, 'দেখীলো দেখিলোঁ, ভাঙ্গীল ভাঙ্গিল, জানীআঁ জানিলোঁ, চৌহালীনী চৌহালিনী' প্রভৃতি শব্দে ঈ-কারের বিকল্প ব্যবহার বর্তমান। 'গিরীশ' গ্রীষ্ম শব্দ-জাত। ইহার বিকল্প নাই। -ইল বিভক্ত্যন্ত একটিমাত্র ক্রিয়াপদ দেখিতেছি যেখানে অবিকল্পে ঈ-র ব্যবহার হইয়াছে, 'চুম্বীল'। 'করিল করিলোঁ কাড়িলান্ত চলিলা চিরিল জানিলোঁ ঢাকিলোঁ তপিল দেখিব ধরিবেহেঁ ধুয়িআঁ নিমিষেক নির্মিল' প্রভৃতি যত পদ আছে সর্বত্রই ই-কারের ব্যবহার। নির্বিকল্প ঈ-কার নাই বলিলেই চলে, এমন কি বিকল্পে ঈ-এর ব্যবহারও উল্লিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোথাও দেখিতেছি না। কেবল 'বত্তীশ' এবং 'জাম্বীর' এই দুইটি শব্দে অবিকল্প ঈ-কারের ব্যবহার দেখিতেছি।

'আলপমতীএঁ,' 'কালীদহ' এবং 'কড়ীএ' শব্দে দীর্ঘ-ঈ আছে বটে কিন্তু এগুলি দৃশ্যতঃ পদমধ্যবর্তী হইলেও কার্যতঃ পদান্তে স্থিত।

চর্যায় 'কুম্ভীর' এবং 'অতীত' (বাক্‌পথাতীত) এই দুইটি তৎসম শব্দের মধ্যে ঈ অক্ষুণ্ণ আছে। 'ভাভরী' (ভাভরীআলী) এবং 'ডোম্বীএর' এই দুই শব্দের ঈ কার্যতঃ পদান্তের ঈ। অতৎসম একটি শব্দে মধ্যবর্তী ঈ-কার পাই 'ইন্দীজানী'। ইন্দীজানী<ইন্দ্রিয়াণি। এটিকে ব্যতিক্রম বলিব কেননা ইন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত আর যতগুলি শব্দ পাইতেছি সর্বত্রই হ্রস্ব-ই, কোথাও ঈ নাই। যেমন, 'ইন্দি, ইন্দিঅ, ইংদিআল, ইংদিবিসআ'।

পদান্তস্থিত ই ঈ। আদ্যস্বর হিসাবে ঈ-এর ব্যবহার পুরাতন বাংলায় অল্প মধ্যস্বর হিসাবে অল্পতর।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঈ এর ব্যবহার পদান্তেই অধিক। ই-কারান্ত অপেক্ষা ঈ-কারান্ত শব্দের সংখ্যা চার-পাঁচ গুণ বেশী। কয়েকটি ঈ-কারান্ত শব্দের বিকল্প ই-কারান্ত রূপও আছে। কিন্তু তাহার সংখ্যা অল্পই।

বিচার করিয়া দেখিলে ঈ-অন্ত শব্দগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১. ঈ-কারান্ত তৎসম শব্দ। ঈ-কারান্ত সকল স্ত্রীলিঙ্গ তৎসম শব্দের অন্ত্য-ঈ বর্তমান থাকে। যেমন, 'কেতকী, কিঙ্কিনী, কদলী, কলসী, সখী, যূথী, দৈবকী, বাণী, দাসী, দশমী, নদী, মালতী, মাধবী, গোপী, যুবতী, লক্ষ্মী, চন্দ্রাবতী, বদরী' ইত্যাদি।

২. ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ তৎসম শব্দ ঈষৎ রূপান্তরিত হইলেও শেষের স্বর অপরিবর্তিত থাকে। যেমন, 'মেদনী (<মেদিনী), আষ্টমী (<অষ্টমী), দুচারিণী (<দ্বিচারিণী), পুনমতী (<পুণ্যবতী), জিঠী (<জ্যেষ্ঠী), সরোঁঅরময়ী (<সরোবরময়ী), পাজী (<পঞ্জী), দুখমতী (<দুঃখবতী), বিচনী (<ব্যজনী, বীজনী), কালিনী (<কালিন্দী), গিধিনী (<গৃধিনী)'।

৩. কয়েকটি আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ তৎসম শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আকার স্থানে ঈ-কার লইয়াছে। যেমন 'বিবসনী, অনাথী'।

৪. স্ত্রীলিঙ্গবাচক সকল অতৎসম শব্দ অন্তে ঈ গ্রহণ করে। যেমন, 'আগলী, আছিদরী, আবুধী, উদগমতী, একসরী, কোঁঅরী, গোআলী, কোঁঅলী, পাতলী, বুঢ়ী, বেআকুলী, বিতপনী, মামী, বাসলী, মাউলানী, রূপসী, সহী, পুরুষবধী, বহুআড়ী, সিআনী, চুরিণী, ছিনারী, চউহালিনী, দুলালী, আভাগী, পিসী, দোহনী' ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দে যেখানে অন্তে আ ছিল তদ্ভব বা অর্ধতৎসমরূপে সেই আ-এর স্থান অধিকার করিয়াছে ঈ। যেমন, 'কোঁঅলী (<কোমলা), বেআকুলী (<ব্যাকুলা), বুঢ়ী (<বৃদ্ধা), পুনমী (<পূর্ণিমা)'। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ই-কারের ব্যবহারও কদাচিৎ হইয়া থাকে। যেমন, 'গোআলিনি, গুয়ালি'।

৫. ইন্-ভাগান্ত সংস্কৃত শব্দ অথবা তদনুরূপ তদ্ভব অর্ধতৎসম শব্দ অন্তে দীর্ঘ-ঈ গ্রহণ করে। বৃত্তিবাচক শব্দেও অন্তে ঈ হয়। যেমন, 'দানী, পহরী, তেলী, মজুরী, ভারী, পহুরী, গারুড়ী, বনমালী, গিহ্রী (<গৃহী), সামী (<স্বামী), সাখী (<সাক্ষী), বাটোয়াড়ী'।

৬. অসমাপিকা ক্রিয়ায় প্রায়ই দীর্ঘ ঈ-যুক্ত হয়। বিকল্পে কোথাও কোথাও হ্রস্ব ই হয়। যেমন, 'মেলী (মিলিত হইয়া, বিকল্পে মেলি), ভাঙ্গী (ভগ্ন করিয়া, বিকল্প ভাঙ্গি), ভরী (পূর্ণ করিয়া, বিকল্প ভরি), বুলী (বলিয়া, বিকল্প বুলি), বুঝী (বুঝিয়া, বিকল্প বুঝি), গোচরী, চুম্বী, খণ্ডী, স্থনী, শুনী, চাহী (চাহি), গুণী (গুণি)' ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় কেবল হ্রস্ব ই হয় এমন দৃষ্টান্তও আছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অল্প। যেমন, 'ছিণ্ডি, ছিঁড়ি, জাই, চিন্তি, এড়ি, হই, লই' ইত্যাদি।

দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত শব্দের সংখ্যাই বেশী। হ্রস্ব ই-কারান্ত যতগুলি শব্দ দেখি তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলির বিকল্প দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ বর্তমান। 'অনুমতি অতি আগুনি (অগ্নি) আজি আতি (অতি) আবসি

(অবশ্য) আরতি (<আর্তি) নিশি কাঢ়ি গালি গিরি পারি পুণি (পুনঃ) পোড়নি বিনি হরি বুধি (<বুদ্ধি) গড়ি জাতি তথি আহ্মি তুহ্মি দধি দহি দুই পাঁতি সংগতি পতি'—এই শব্দগুলির দীর্ঘ ঈ-কারান্ত বিকল্প রূপও আছে।

কেবলমাত্র হ্রস্ব ই-কারান্ত রূপই আছে বিকল্প নাই এমন শব্দ কিছু আছে। যেমন, 'আড়য়ি (বৃক্ষ বিশেষ) আছি আপণেই আপণেয়ি আপণেহি আম্বই (বৃক্ষবিশেষ) ইছসি উয়ি উলটি ঋষি একোহি এথোহি এড়ি এহি কড়ই (বৃক্ষ বিশেষ) করন্তি করিহলি কাহ্নাই কাহ্নায়িঁ কেশি থোজসি গজগড়ি গড়াহলি গেলান্তি ঘটি (মুহূর্ত) ঘসি চোরায়িলি ছুটি (বেগে বাহির হইয়া) জাই জায়ি জুতি (>দ্যুতি) ঠায় ঠায়ি ঠেঠালি তথনেই তবেঁসি তহি তুহ্মি গেলসি তোহ্মেঁসি তোহ্মেঞিঁ তোহ্মারি রুচি দিশি দোষসি দৌজি ধেআই নই (নদী) নহসি নারিবি নিন্দসি নিতেই (নিত্যই) পাই পাওসি পালি (প্রাপ্ত হইলে) পালি (পালি গান) ফুটি বড়াই বড়ায়ি বাছি বিচারি বোলাবুলি ভাণ্টি (ঘেঁটু গাছ) ভাই ভায়ি ভ্রূহি মাঞিঁ মারিলি লাজাই মিছাঞিঁ মৈলিসি যাই রমন্তি লয়ি শিখি সরূপেঁসি সহ্মাতেয়ি সহ্মেই সহ্মেঞিঁ সি সেসি সেহি (একটি সেহী) সোই হওসি হেনসি যেই তহি হলদি হই' ইত্যাদি।

ই-কারান্ত শব্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই তথ্যটি পাওয়া যায় যে, ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত না হইলে ই হ্রস্ব থাকে। শব্দের শেষে অব্যঞ্জনাশ্রিত ঈ অতিশয় বিরল। অসমাপিকা ক্রিয়ায় ব্যঞ্জনাশ্রিত 'ই' বিকল্পে 'ঈ' হয়; যেমন 'করি করী, কাঢ়ি কাঢ়ী, গুণি গুণী, চাহি চাহী, ছাড়ি ছাড়ী, জুড়ি জুড়ী, পরিভাবি পরিভাবী, লাগি লাগী, মিলি মিলী, মানি মানী, ভরি ভরী, বসি বসী, বুলি বুলী' ইত্যাদি। কিন্তু 'আপণেই আম্বই, কড়ই, জাই, গাই, নই, কাহ্নাই, বড়াই, ভাই, মিছাই, যাই, ধেয়াই, লাজাই, সোই, যেই, হই' প্রভৃতি শব্দের ঈ-অন্ত রূপ হয় না।

নিশ্চয়াত্মক অব্যয় 'সি' এবং 'হি'-এর ই-কার-এর অপরিবর্তিত থাকিবার দিকেই প্রবণতা; যেমন 'আপণেহি একোহি এথোহি এহি যেহি সেসি এবেঁসি এসি' ইত্যাদি।

'ঞ'-ব্যঞ্জনের সহিত সাধারণত ই-কার যুক্ত হয়। গোসাঞিঁ আপণেঞিঁ আছে, গোসাঞীঁ আপণেঞীঁ নাই। কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞি অনেকবার পাই, কিন্তু দীর্ঘ ঈ-কার দিয়া বানান পাওয়া যায় সর্বসুদ্ধ দুইবার।

'য়'-এর ক্ষেত্রেও হ্রস্ব ই-কারের ব্যবহার হয়, দীর্ঘ ঈ-কার বিরল; যেমন, বড়ায়ি। স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও হ্রস্ব ই-কার। ওইরূপ 'কাহ্নায়ি আপণেয়ি সহ্মাতেয়ি আড়য়ি হারায়ি এড়ায়ি' ইত্যাদি। য়ী-অন্ত 'আয়ী' শব্দ একবারমাত্র পাইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'কি' এবং 'কী' দুই বানানই পাওয়া যায়।

চর্যায় ই ঈ। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যেমন, 'অবধূতী, শবরী, শুণ্ডিনী, দেবী ঘরিণী, গোহালী, মেহেলী, জোইনী, কামচণ্ডালী' ইত্যাদি। তদ্ভব 'অবধূই' শব্দের অন্ত্যস্বর 'ঈ' নয়, হ্রস্ব 'ই'। চর্যায় ব্যঞ্জন-নিরপেক্ষ ঈ পদান্তে বসে না।

ইক, ইক+আ, ইন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত সংস্কৃত শব্দের তদ্ভব রূপগুলিতে অন্ত্য ই-স্বর দীর্ঘ হয়। জাতিবাচক, বৃত্তিবাচক, ক্ষুদ্রার্থক, তুচ্ছার্থক বিশেষণ বাচক শব্দে প্রবণতা ঈ কারের দিকে। যেমন, 'আবেশী, কপালী, শশী, গাতী (গর্ত+ইকা), দাণ্ডী, নৌবাহী, পোথী, পিঁড়ী, ব্রজধারী, নিবুধী, সাধী বোড়ী, ষবরালী, ভাভরীআলী, বঙ্গালী'।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় ঈ-কারান্ত এবং ই-কারান্ত উভয় প্রকার রূপই পাওয়া যায়। যেমন, 'অহারী উপাড়ী ঘিণি চ্ছাড়ী ছাড়ি মারী পুচ্ছি' ইত্যাদি।

উ ঊ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উ-আদি শব্দ অনেক আছে। ঊ-আদি শব্দও বিরল নহে। তবে উ-আদি শব্দ অপেক্ষা ঊ-আদি শব্দ স্বল্পতর।

'উত্তর উদ্দেশ উপকার উদ্ধার উন্নত উপভোগ উপর উল্লসিত উচিত উজল উঠান উঠ উতপতী উতপল উনমত উপজএ উপেখ' প্রভৃতি শব্দে মূল সংস্কৃতের আদ্যক্ষর হ্রস্ব-উ বর্তমান।

শব্দের আদিতে ঊ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লিপিকারের কিছু শৈথিল্য দেখা যায়। হ্রস্ব-উ-আদি সংস্কৃত শব্দের 'উ'-স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘ 'ঊ' দিয়া বানান করা হইয়াছে। যেমন, 'ঊচিত, ঊত্তর, ঊদ্দেশ, ঊপহাসে, ঊপায়'।

অতৎসম দীর্ঘ ঊ-আদি শব্দের দৃষ্টান্ত—'ঊইল ঊচ ঊজল ঊঠ ঊড়িআঁ ঊপজীব ঊপেখহ ঊপায় ঊয়ে' ইত্যাদি।

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে শব্দের আদিতে হ্রস্ব উ-এর বিকল্পে দীর্ঘ ঊ-এর ব্যবহার যত্র তত্র ঘটিয়াছে।

মূল সংস্কৃত শব্দের আদ্যস্থ দীর্ঘ ঊ একটিমাত্র ক্ষেত্রে হ্রস্ব উ হইয়াছে,—'ঊরু' স্থলে 'উরু'। শব্দটি অনেকবার ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু একবারও দীর্ঘ ঊ দেওয়া হয় নাই।

দীর্ঘ ঊ যাহার আদিতে আছে এমন তৎসম শব্দ বা তাহা হইতে আগত তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাত্র দুইটি পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে 'ঊরু'র কথা বলিয়াছি। দ্বিতীয় শব্দটি হইল 'ঊনঞ্চাস' (<ঊনপঞ্চাশ)। এই 'ঊনঞ্চাস' শব্দে 'ঊ'র দীর্ঘত্ব অক্ষুণ্ণ আছে।

দীর্ঘ ঊ-আদি শব্দের বিরলতা বশতঃ ঊ-এর পক্ষে হ্রস্ব-উ হইবার প্রবণতা কতটা ছিল তাহা বলা কঠিন, কিন্তু হ্রস্ব উ যে অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঊ হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। ইহা কি আদ্যক্ষরে স্বরাঘাতের নিদর্শন? 'অন্য অন্তর অন্ধকার অনুমতি' যে কারণে 'আন আন্তর আন্ধকার আনুমতি' হয় সেই কারণে?

চর্যায় আদ্য দীর্ঘ ঊ দিয়া একটি মাত্র শব্দ পাইতেছি 'ঊইআ'। 'ঊইআ'র অর্থ—উদয় হয়।

ব্যঞ্জনাশ্রিত আদ্যস্বর হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হ্রস্ব উ-এর ব্যবহারই বেশী, দীর্ঘ ঊ-এর ব্যবহার অল্প। অধিকাংশ স্থলেই ঊ-এর বিকল্পে উ-এর প্রয়োগ আছে। ব্যঞ্জনাশ্রিত আদ্যস্বর-রূপে প্রযুক্ত দীর্ঘ ঊ-কারের দৃষ্টান্ত এই কয়টি দেখিতেছি—'কূজন কূল চূর (চূর্ণ), তূঞ্জিঁ, তূল (তুল্য), তূলে (উঠায়), দূতা, দূতী, দূর, নূপুর, পূন্ন, পূত, পূরে (পূর্ণ হয়). ভূষণ, ভ্রূ, মূঢ় (মূঢ়), মূল (মূল্য), মূল (root), রূপ, রূপা, শূণ (শূন্য), সূদ্র, সূর (শূর), হূরিআঁ (আলোড়িত করিয়া)'।

চর্যায় ব্যঞ্জনাশ্রিত আদ্য ঊ-কারের এই কয়টি দৃষ্টান্ত মিলে।—'দূর, ভূঅ (ভূত), মূঢ়, মূল, বূঝই, রূপ, রূব, শূণ (শূন্য), সূজ্জ (সূর্য), সূধ, হূঁ (বাক্যালংকার)'।

তৎসম শব্দে সংস্কৃতের অনুসরণে দীর্ঘ ঊ-কার রাখিবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। 'কূল কূজন দূত মূঢ় ভূষণ সূদ্র (শূদ্র) রূপ' ইত্যাদির আদ্যক্ষর তাহার প্রমাণ। যেগুলি খাঁটি তৎসম নয় সে সকল শব্দেও মূল দীর্ঘ-উকারের প্রভাব ক্রিয়া করিয়াছে। 'চূর, পূন্ন, পূর, শূণ, রূঅ, রূব, সূজ' প্রভৃতি শব্দের দীর্ঘ ঊ-কারে তাহার পরিচয়। দুই-চারিটি শব্দে ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম ক্রিয়া করিয়াছে। যেমন, 'সূধ (<শুদ্ধ), পূত (<পুত্র), তূল (<তুল্য)'। এই সকল শব্দের আদ্যস্বর ছিল হ্রস্ব উ-কার। পরবর্তী যুক্তাক্ষর সরল হইবার ফলে পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হওয়া স্বাভাবিক।

শব্দান্তে ও শব্দমধ্যে উ ঊ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে হ্রস্ব উ-অন্ত ও হ্রস্ব উ-কারান্ত শব্দের সংখ্যা অল্প। দীর্ঘ ঊ-অন্ত ও দীর্ঘ ঊ-কারান্ত শব্দের সংখ্যা অল্পতর। ইহাদের মধ্যেও অধিকাংশের হ্রস্ব উ-অন্ত এবং হ্রস্ব উ-কারান্ত বিকল্প রূপও আছে।

'জাইঊ, জীউ জীঊ, পালাউ পালাঊ, আলাপাউ আঊ, খাউ খাঊ, রাখঊ, লাঊ, ঢেঊ, খণ্ডঊ, সিঞ্চঊ, লড়িঊ' ইত্যাদি। 'গরু গরূ, বড়ু বড়ূ, এড়ু, করু, কাকু, চাহু, ছাড়ু, পুছিউ, লাগু' ইত্যাদি।

শব্দমধ্যে দীর্ঘ ঊ বা দীর্ঘ ঊ-কার অল্পই দেখা যায়। এই শব্দগুলি পাই।—'হঊক, দেঊক, জীআঊক, পালাঊক, মাঊলানী, বঊল, সিন্দূর, সংপূর্ণ, সরূপেঁ, আণূকূল, আদভূত'। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই বিকল্প রূপ আছে। যেমন, 'বউল, হউক, সিন্দুর, সংপুন্ন, সরুপেঁ, আদভুত'।

চর্যায় শব্দমধ্যে বা শব্দান্তে দীর্ঘ ঊ এবং ঊ-কারের ব্যবহার এই কয়টি ক্ষেত্রে পাই। 'হাঊ, উজূ, অদভূআ, অবধূতী. অবধূই'। ইহাদের মধ্যেও প্রথম তিনটির বিকল্প রূপ আছে।—'হাঁউ, উজু, অদঅভুঅ'।

চলিত বাংলা ও তাহার বানান

সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা বরাবরই প্রাকৃতের উপমা দেন গ্রাম্য বালিকার সঙ্গে। নগরের সাজ-সজ্জা প্রসাধন অলংকরণ তাহার অজ্ঞাত—হয়তো বা অবজ্ঞাতও বটে। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত সে, বন্ধন-শাসন মানিতে চাহে না। তাহার প্রসাধন ভিন্ন ধরনের, বেশবাস ইচ্ছাধীন; তাহার আচার বাঁধারীতির বশ নহে। আর সংস্কৃত ভাষা জনপদ-পালিতা নাগরী; আভিজাত্যের চিহ্ন তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া আছে। তাহাকে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। অনিয়মের উদ্দামতা তাহার মধ্যে নাই, আছে সুনিয়ত পরিমাণ-বোধ। প্রাকৃত ভাষা লঘুগতি মুক্তবেণী, বন্য হরিণীর মত স্বাধীন তাহার সঞ্চরণ।

এখন এই উক্তির মধ্যে সত্যাসত্য কতটুকু আছে দেখা যাউক। প্রাকৃতের কোনো নিয়ম নাই ইহাই যদি এই উপমার অর্থ হয়, তাহা হইলে তাহা আদৌ নির্ভুল হইবে না। চলিত ভাষা একাধিক এবং প্রত্যেকেরই ব্যবহারে ভিন্নতা আছে। প্রতি চলিত ভাষারই একটা পৃথক্ নিয়ম আছে। অবশ্য সে নিয়মে শৈথিল্য থাকা অসম্ভব নহে। প্রাকৃত-মাত্রেরই ওইরূপ একটা স্বাধীনতা আছে সেটা তাহার স্বাচ্ছন্দ্যে। স্বেচ্ছাচারের সহিত স্বাধীনতার যোগ নাই। অরাজের অর্থ স্বরাজ নহে।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এখন অরাজকতা উপস্থিত। রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে দেশ যেমন খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, অথচ কোনো রাজ্যেই প্রকৃত রাজা থাকে না, আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে আজ তেমনি দুর্যোগের আবির্ভাব। লেখকদের মধ্যে যাঁহাদের কিছু কিছু শক্তি আছে তাঁহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনে লিখিতেছেন, অল্পবল বা হীনবল লেখকেরা উঁহাদেরই মধ্যে এক-একজনকে আদর্শ ধরিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা বাদুড়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসিতেছেন। ভিন্ন ধরন বলিতে আমি ভঙ্গী ধরিতেছি না। ভঙ্গী লেখকমাত্রের ভিন্ন হইবেই। আমি বলিতেছি বাক্য ও শব্দ গঠনের প্রাথমিক নিয়মগুলির কথা। এ প্রবন্ধে কেবল শব্দগঠন অর্থাৎ শব্দের বানানের কথাই আলোচনা করিব।

বাংলা শব্দ এখন বহুরূপী। একই শব্দের বানান নানা রকমের। চলিত ভাষায় এই অত্যাচারটা সর্বাপেক্ষা অধিক। এক বাংলা শব্দেরই চার রূপ;—বাঙ্‌লা, বাঙ্‌লা, বাঙ্গালা ও বাংলা। ঙ এবং ঙ্গ-এ হসন্ত না দিলে রূপ আরও বাড়ে। একমাত্র '-ছি' প্রত্যয় যোগে কর্ ধাতু যে কত রূপ ধারণ করে তাহা বাঙালী পাঠকমাত্রেই জানেন। -ছি যুক্ত হইলে কর্ ধাতু কত রকম রূপ পাইতে পারে পর পৃষ্ঠায় তাহার একটা তালিকা দিলাম।

১. করছি	২. কোরছি	৩. ক'রছি
৪. কর্‌ছি	৫. কোর্‌ছি	৬. ক'র্‌ছি
৭. কচ্ছি	৮. কোচ্ছি	৯. ক'চ্ছি
১০. কর্চ্ছি	১১. কোর্চ্ছি	১২. ক'র্চ্ছি

এইতো গেল বারটি। আবার 'ছ'এর স্থলে 'চ' লিখিলে আরও বারটি। তাহা হইলে 'কর্‌' ও '-ছি'র যোগে সর্বসুদ্ধ চব্বিশটি শব্দের সৃষ্টি হইতে পারে। বস্তুতঃ চব্বিশটি না হউক, প্রদর্শিত শব্দগুলির অন্ততঃ পনের ষোলটি ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাইবেন। অথচ ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে এ চব্বিশটি শব্দের মধ্যে ২৩টি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। এই তেইশটি শব্দ যে কত দিক্ দিয়া কত অসুবিধা সৃষ্টি করে, ভুক্তভোগী-মাত্রেই তাহা জানেন। লেখকের অসুবিধা, প্রতিলিপিকারের অসুবিধা, কম্পোজিটরের অসুবিধা, অসুবিধা সকলেরই। প্রথম ভাষাশিক্ষার্থীর প্রতি যে অকারণ অত্যাচার করা হয় তাহার কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

'doing' কথাটা লিখিতে হইলে কাহাকেও ভাবিতে হয় না—'i' লিখিব কি 'e' লিখিব। 'i'-এর উপর বিন্দুটা দিতে ভুলিয়া গেলেও বুঝিবার পক্ষে কোনো অসুবিধা হয় না। ইংরাজী যিনি কিছুমাত্র জানেন তিনিও ইহা বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু 'করছি'র চতুর্বিংশতি রূপের কোন্‌টি লিখিব ইহা ভাবিতে কিছু সময় দিতেই হয়। অথচ ভাবনার সমাধান হইয়া উঠে না। কলমের আগায় যাহা আসে তাহাই বসাইয়া দেওয়া হয়। 'doing' কথাটা যতই অস্পষ্ট রকমে লিখিত হউক না কেন, কথাটা কি একবার অনুমান করিয়া লইতে পারিলে, কি প্রতিলিপিকার, কি কম্পোজিটর, বানানের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না। তাহার কারণ 'doing' এর বানান দুই রকম হইবার উপায় নাই। কিন্তু 'করছি'র বেলায় প্রত্যেকটি অক্ষর পড়িতে পারা চাই, তাহা না পারিলেই বিপদের সম্ভাবনা। লেখক কোন্ বানান চান তাহা কম্পোজিটরের অনুমান করিবার কোনো উপায় নাই।

পৃথিবীর মধ্যে প্রধান ভাষা যতগুলি তাহাদের সব কয়টিরই বানান নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সময় হয় নাই বলিয়া আমরা আর কতদিন বসিয়া থাকিব? যতই বিলম্ব হইবে ততই জটিলতা বাড়িবে। সুতরাং অগৌণে বানান নির্ধারণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে কালভেদে এবং বিভিন্ন কৃৎপ্রত্যয় যোগে একটা ধাতুই প্রায় হাজার রূপ গ্রহণ করে।

আমরা দেখিলাম একমাত্র উত্তম পুরুষের বর্তমান ঘটমান কালে কর্ ধাতুর রূপ হয় চব্বিশটি। সকল কালে সকল পুরুষে এই কর্ ধাতুর রূপসংখ্যা কত হইতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য একটি রূপলতিকা দেওয়া হইল।

কর্ ধাতুর রূপ

	প্রথম—সামান্য	প্রথম ও মধ্যম—গুরু
বর্তমান	১. নিত্য করে মোট ১	করেন মোট ১
	২. ঘটমান করছে ক'রছে করছে কোরছে ক'র্ছে কর্ছে কোর্ছে ক'চ্ছে´ কচ্ছে´ কোচ্ছে´ ক'চ্ছে কচ্ছে কোচ্ছে [ছ স্থলে চ লিখিলে আরও ১২টি রূপ হয়।] মোট ২৪	করছেন ক'রছেন করছেন কোরছেন [প্রথম সামান্যের মতই।] মোট ২৪
	৩. অনুজ্ঞা করুক ক'রুক করুক কোরুক [হসন্ত যোগে আরও ৩।] মোট ৬	করুন ক'রুন করুন কোরুন [হসন্ত যোগে আরও ৩।] মোট ৬
অতীত	৪. অচির করল (ক) ওকার ও ইলেকযোগে ৩ (খ) র-য় হসন্ত দিলে ৩ (গ) র-স্থানে রেফ্ দিলে ৩ (ঘ) র বা রেফ্ স্থানে ল-এর দ্বিত্ব করিলে ৩ (ঙ) ল-য় ওকার দিলে ১২ করলে উপরের মত ২৪ মোট ৪৮	করলেন [৪। (ক) (খ) (গ) (ঘ) অনুসারে ১২, ন-য় হসন্ত দিলে আরও ১২।] মোট ২৪
	৫. সংঘটিত করেছে (ক) ইলেক এবং ও যোগে ৩ (খ) ছ স্থলে চ দিলে ৩ মোট ৬	করেছেন (ক) (খ) অনুসারে মোট ৬

কর্ ধাতুর রূপ

মধ্যম—সামান্য	মধ্যম—তুচ্ছ	উত্তম		
কর কর করো মোট ২	**করিস** করিস করিস্ কোরিস কোরিস্ মোট ৪	**করি** করি কোরি মোট ২	৫ এর স্থলে	১০
করছ [প্রথম সামান্যের মত ২৪টি রূপ, কিন্তু শেষ অক্ষরে ও-উচ্চারণ থাকায় ও যোগ হইতে পারে ; তাহা হইলে আরও ২৪টি রূপ।] মোট ৪৮	**করছিস** [প্রথম সামান্যের মত ২৪টি রূপ। হসন্তযোগে আরও ২৪টি।] মোট ৪৮	**করছি** [প্রথম সামান্যের মত।] মোট ২৪	৫ এর স্থলে	১৬৮
কর কর করো মোট ২	**কর্** [বিনা হসন্তে আর ১।] মোট ২	×	৪ এর স্থলে	১৬
করলে মোট ১২	**করলি** মোট ১২	**করলাম** করলাম ১২ করলেম ১২ করলুম ১২ ৩৬ [র-য় হসন্ত দিলে আরও ৩৬।] মোট ৭২	৫ এর স্থলে	১৬৮
করেছ (ক) (খ) অনুসারে ৬ ছ-য় ওকার দিলে ৬ মোট ১২	**করেছিস** (ক) (খ) অনুসারে ৬ স-য় হসন্ত যোগে ৬ মোট ১২	**করেছি** (ক) (খ) অনুসারে ৬	৫ এর স্থলে	৪২

কর্ ধাতুর রূপ

	প্রথম—সামান্য	প্রথম ও মধ্যম—গুরু
অতীত	৬. নিত্য করত (ক) ইলেক এবং ও যোগে ৩ (খ) র-য় হসন্ত দিলে ৩ (গ) র স্থানে রেফ দিলে ৩ (ঘ) র স্থানে ত দিলে ৩ (ঙ) ত-য় ওকার দিলে ১২ মোট ২৪	করতেন (ক) (খ) (গ) (ঘ) অনুসারে মোট ১২
	৭. ঘটমান করছিল পূর্বোক্ত নিয়ম সকল অনুসারে মোট ৪৮	করছিলেন মোট ২৪
	৮. পুরাঘটিত করেছিলে মোট ১২	করেছিলেন মোট ৬
ভবিষ্যৎ	৯. নিত্য করবে মোট ৬	করবেন মোট ৬
	১০. অনুজ্ঞা করবে মোট ৬	করবেন মোট ৬

কৃৎপ্রত্যয় যোগে কর্ ধাতু

(১) -তে যোগে	(২) -এ যোগে
করতে	করে
মোট ১২	মোট ৬

কর্ ধাতুর রূপ

মধ্যম—সামান্য	মধ্যম—তুচ্ছ	উত্তম	
করতে (ক) (খ) (গ) (ঘ) অনুসারে মোট ১২	করতিস (ক) (খ) (গ) (ঘ) অনুসারে ১২ স-য় হসন্ত দিলে ১২ মোট ২৪	করতাম (ক) (খ) (গ) (ঘ) অনুসারে ১২ করতেম ১২ করতুম ১২ মোট ৩৬	৫ এর স্থলে ১০৮
করছিলে মোট ২৪	করছিলি মোট ২৪	করছিলাম করছিলাম ২৪ করছিলেম ২৪ করছিলুম ২৪ মোট ৭২	৫ এর স্থলে ১৯২
করেছিলে মোট ৬	করেছিলি মোট ৬	করেছিলাম করেছিলাম ৬ করেছিলেম ৬ করেছিলুম ৬ মোট ১৮	৫ এর স্থলে ৪৮
করবে মোট ৬ করো মোট ৩	করবি মোট ৬ করিস মোট ৬	করব মোট ১২ ×	৫ এর স্থলে ৩৬ ৪ এর স্থলে ২১
			মোট ৪৮ এর স্থলে ৮২৯

কৃৎপ্রত্যয় যোগে কর্ ধাতু

(৩) -লে যোগে	(৪) -বার যোগে	(৫) -আ যোগে	
করলে মোট ১২	করবার মোট ২	করা মোট ১	৫ এর স্থলে ৩৩

সর্বসাকল্যে

৫৩ স্থলে ৮৬২

বাংলা বানান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে আলোচনা একেবারেই হয় নাই এমন নহে। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার ফল তেমন কিছু ফলে নাই। একবার স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতের উদ্‌যোগে একটি খসড়া বানানপদ্ধতি প্রস্তুত করা হইয়াছিল।[১] রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে ওই পদ্ধতিটি অনুমোদন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বইগুলিতে ওই বানান পদ্ধতিই অবলম্বন করা হইয়াছিল। পরে অবশ্য আবার কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে।

ওই পদ্ধতিটির সম্বন্ধে প্রশান্তবাবু বলিয়াছেন, "কাজ চালানো যায় এমন একটা পদ্ধতি খাড়া করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই নিয়ম ও সংগতির দিক থেকে একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত একটি পদ্ধতি তৈরী করবার চেষ্টা আমরা করিনি। অভ্যস্ত সংস্কারে যাতে বেশী আঘাত না লাগে সে দিকে দৃষ্টি রেখে জায়গায় জায়গায় অনেক অস্থবিধা সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রচলিত বানান গ্রহণ করতে হয়েছে।" অভ্যস্ত সংস্কারকে যতদূর সম্ভব অনাহত রাখিয়াও এই যে বানানপদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল ইহাতে এমন কিছু ছিল না যাহা লেখকসম্প্রদায়ের ভীতি উদ্রেক করিতে পারে। নূতন অপরিচিত এবং অনভ্যস্ত বিষয়ে হাত দিতে হইলেই লোকে প্রথমতঃ ভয় পাইবে ইহা স্বাভাবিক এবং ওরূপ বিষয় গ্রহণ বা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সে রকম কিছু ছিল না। ইচ্ছা করিলে সকলেই সেটা গ্রহণ করিতে পারিতেন। আর অনিচ্ছার কারণ থাকিলে তাহা আলোচিত হইতে পারিত। কিন্তু এই পদ্ধতি স্বীকৃতও হয় নাই, ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনাও উঠে নাই। হয়তো বা বাঙালী জাতির প্রকৃতিগত শিথিলতাই এইরূপ নিস্তব্ধতা এবং নিশ্চেষ্টতার কারণ।

আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার লেখকগণ একই শব্দের বানান লেখেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এমন কি একই লেখকের হাতে একই শব্দের একাধিক বানানও দেখা যায়। আধুনিক বাংলা-লেখকগণের পুস্তকাদিতে সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। আমরা কিছুকাল ধরিয়া এইরূপ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতেছি। এ পর্যন্ত যত শব্দ সংগ্রহ করা হইয়াছে সে গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বানান সম্বন্ধে কোন্ কোন্ স্থানে পার্থক্য ঘটে তাহা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে সেই বিবরণটুকুই লিপিবদ্ধ করিলাম। এই সমস্যাটি বঙ্গভাষার কর্ণধারগণের নিকট উপস্থিত করিতে চাই।[২] যে ভাবেই হউক একটা নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নের সময় আসে নাই বলিয়া যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া

১. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিত 'চলতি ভাষার বানান', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩২।

২. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইবার পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল।

আর চলে না। এইবার ভাষার গতিপথ নির্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন না ঠিক হয় 'করছি'র চতুর্বিংশতি রূপের মধ্যে একটিমাত্র রক্ষণীয়, অপরগুলি বর্জনীয়, ততদিন প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রধান।

কথা উঠিবে চতুর্বিংশতি রূপের মধ্যে শুদ্ধ কোন্‌টি? তাহার উত্তরে বলিব, শুদ্ধি অশুদ্ধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিবার সময় এ নয়। হয়তো সব কয়টিই শুদ্ধ হইতে পারে। আমরা বলি পণ্ডিতগণ এই চব্বিশটি শব্দের মধ্যে ভাষায় গৃহীত হইবার পক্ষে যেটির সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা আছে তাহাকেই গ্রহণ করিবেন। বিচারকালে লিখন-সৌকর্য, ব্যাকরণশুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত গুণগুলিই আলোচনার মধ্যে আসিবে। বিশেষজ্ঞদের হাতে সে ভার অর্পণ করিতে হইবে। এইভাবে যখন নিয়মের দ্বারা তেইশটি অনাবশ্যক শব্দকে নির্বাসন দেওয়া হইবে, তখন ভাষালক্ষ্মীও অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিবেন।

প্রশ্ন উঠিবে নিয়ম করিবে কে এবং এবং একজন তাহা করিলে সকলে স্বীকার করিবেন কেন?

সাহিত্যের সব শাখায় সকলের সমান অধিকার নাই, থাকা স্বাভাবিকও নয়। এক বিষয়ে সকলেই বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বাংলা ভাষার ভূত ভবিষ্যৎ বিচার করিতে পারিবেন, তাহার হিতাহিতের ভার লইতে পারিবেন, এ আশা আমরা প্রত্যেক বাংলা লেখকের কাছে করিতে পারি না। আর লেখক বা সাহিত্যিকমাত্রই যে এ দাবি করিবেন ইহাও মনে করি না। আচ্ছা মনে করা যাউক, রবীন্দ্রনাথকে পুরোবর্তী করিয়া শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণ একটি সভায় মিলিত হইয়া সকলের বা অধিকাংশের সম্মতি লইয়া একটি ব্যাকরণের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে যে নিয়ম প্রণয়ন করা হইল তাহা সাহিত্যিকবর্গ বা লেখকসমাজ মানিতে অসম্মত হইবেন এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনো সংগত কারণ আছে কি? অবশ্য ইহাও দেখিতে হইবে যে লেখকদিগকে যেন উপেক্ষা করা না হয়। ভাষার নিয়ম গঠন সম্পর্কে তাঁহাদের মতামতও আহ্বান করিতে হইবে এবং বিচারকালে তাঁহাদের মতামতের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ যদি এই কাজে অগ্রণী হন তাহা হইলে বাংলা ভাষার একটা মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাংলার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। বিধান রচিত হইলেই হয় না, তাহার প্রয়োগ শক্তিসাপেক্ষ। এ গুরু দায়িত্ব তাঁহারাই গ্রহণ করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সেই শক্তি আছে।

বাংলার বানানপদ্ধতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ ইতিপূর্বে যে সকল তর্কবিতর্ক করিয়াছেন দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি সেদিকে গুরুতররূপে আকৃষ্ট হয় নাই।

বানান সম্বন্ধে কথা উঠিলেই ভাষার কথা উঠে এবং বানানসমস্যার গুরুত্ব ভাষা-সমস্যার নীচে চাপা পড়িয়া যায়। কথা উঠিয়াছে, বাংলায় সাধু এবং চলিত নামে যে দুইটি লেখ্য ভাষা প্রচলিত আছে, এ দুইটিরই থাকার কোনো আবশ্যকতা আছে কি না ?

'চলন্তিকা'-কার রাজশেখর বসু বলেন, একটির দ্বারাই যদি কার্যসিদ্ধি হয় তবে আর একটি শিখিবার জন্য যে শ্রম করা হইবে তাহা তো হইবে পণ্ডশ্রম। তাঁহার মতে লেখ্য ভাষা একটাই থাকা উচিত সে সাধুই হউক—আর চলিতই হউক। পরে কয়েকটি যুক্তি অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন "লেখ্য চলিত ভাষাই একমাত্র লৈখিক হবার যোগ্য, যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধু ভাষার সঙ্গে রফা করা হয়"।

চলিত ভাষার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য—সে সজীব প্রাণের মূল্য, তার মর্মগত তত্ত্বগুলি বাঁধা নিয়ম আকারে ভালো করে আজও ধরা দেয় নি বলেই তাকে দুয়োরানীর মতো প্রাসাদ ছেড়ে গোয়াল ঘরে পাঠাতে হবে, আর তার ছেলেগুলোকে পুঁতে ফেলতে হবে মাটির তলায়, এমন দণ্ড প্রবর্তন করার শক্তি কারও নেই। অবশ্য যথেচ্ছাচার না ঘটে, সেটা চিন্তা করবার সময় এসেছে স্বীকার করি।" চলিত ভাষার প্রতিই কবির আন্তরিক টান, তাহা শুধু এই উক্তি হইতেই বুঝা যায় এমন নহে, তাহার অন্যান্য নিদর্শনও আছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি সাধুভাষা একরূপ লিখেন নাই।

ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' শীর্ষক পুস্তিকায় সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে মীমাংসা করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত 'আধা ডিগ্রী এবং আধা ডিসমিস্' দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকেই আদর্শ ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষা এবং চলিত ভাষার সংমিশ্রণে যে অপূর্ব রচনারীতি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী"। কিন্তু বঙ্কিমের ভাষাকে আমরা সাধুভাষার পর্যায়েই ফেলিয়া থাকি। সে যাহাই হউক এ প্রসঙ্গ এখানে বন্ধ করা ভাল। কারণ এইরূপ বাদানুবাদের মধ্যে বানান-সমস্যা ভাষাসমস্যার অন্তরালে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এখন কিন্তু আর আমাদের কালক্ষেপ করিবার অবসর নাই। যে সমস্যাই হাতে আসে অবিলম্বে তাহারই মীমাংসা করিয়া ফেলা প্রয়োজন। চলিত বাংলার বানান সম্বন্ধে যখন বিচার করিতে বসিব তখন অন্য কোনো দিকে মন দিবার আবশ্যকতা নাই। চলিত ভাষাই একমাত্র লেখ্য ভাষা হউক বা না হউক, তাহার বানান নির্ধারণ করিবার প্রয়োজনের হ্রাস হয় না।

১. অ—ও

(ক) বাংলা শব্দের শেষ অক্ষরে যদি অ স্বর থাকে এবং সেই অ যদি গ্রস্ত না হয়, তাহার উচ্চারণ হয় কতকটা 'ও'-এর মত। যেমন, মত—মতো, গত—গতো, ভাল—ভালো, গেল—গেলো ইত্যাদি। এ নিয়মের বিপর্যয় কখনো ঘটে না। সুতরাং এরূপ স্থলে ও-কার যোগ করিবার প্রয়োজন কি? যদি উচ্চারণের অনুরূপ বানান করিতে হয় তাহা হইলে তো 'বন' (অরণ্যার্থক) 'বোন' লিখিতে হয়, কিন্তু তাহা কি সংগত হইবে? 'গোলক' এবং 'গো-লোক' এই দুই শব্দের উচ্চারণ প্রায় সমান, কিন্তু তাই বলিয়া গোলক শব্দের 'ল'য়ে ও-কার দেওয়া কেহ সমর্থন করিবেন কি? অবশ্য অনেকে বলিতে পারেন, তৎসম শব্দের বানান পরিবর্তন অনাবশ্যক। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোকের লেখায় তৎসম শব্দের সংখ্যা কি কম? তাহার উচ্চারণে যদি অসুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে 'ভাল' 'মত' প্রভৃতির স্কন্ধে অকারণ বোঝা চাপানো কেন?

'এমনতর' এবং 'অধিকতর' উভয় শব্দেরই 'র' এর উচ্চারণ হয় 'রো'-এর মত। ইহাদের কোনোটির শেষে ও দেওয়া বিধেয় কি না? সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দ অবিকৃত থাকিবে এইরূপ নিয়মই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে 'অধিকতর'তে 'ও' যোগ করা চলে না। কিন্তু 'এমনতর'কে 'এমনতরো' লিখিলে বোধ হয় ক্ষতি হয় না। ইহাতে কোন্‌টি ফারসী 'তরহ্' আর কোন্‌টি সংস্কৃত 'তর' তাহা সহজেই চেনা যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'এমনতরো' বানান সর্বদাই দেখা যায়।

প্রেরণার্থক ধাতুর সামান্যরূপে (infinitive) বাংলায় 'ন' লাগানো হইয়া থাকে। যথা, 'খাওয়ান' 'বসান' 'শোওয়ান' ইত্যাদি। অনেকেই এই 'ন'কে 'নো' করেন। ক্রিয়াপদের অতীতকালের রূপেও এই সমস্যা। গেল, না—গেলো? গিয়েছিল, না—গিয়েছিলো? যেত, না—যেতো? অনুজ্ঞাতেও তাই। কর, না—করো? ক'র, না—ক'রো (করিও)? এস, না—এসো? বল, না—বলো?

(খ) পরে ই বা ঈ স্বর থাকিলে পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ হয় ওকারের মত। তথাপি কেহ কেহ লেখেন 'রোইল'। ই স্বর লোপ পাইলেও পূর্ববতী 'অ' 'ও' হয়। যেমন, কেমন 'করে' এলে? কিন্তু—সে এখন কি 'করে'? নামের গুণে 'তরে' গেল। কিন্তু কার 'তরে' তুই কাঁদিস্? এই সকল শব্দ লিখিতে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ইলেক্ বা ও-কারের সাহায্য গ্রহণ করেন না। সত্যই ওইসব শব্দে ওকারের চিহ্ন কিছু না থাকিলেও ওকারের অস্তিত্ব বুঝিবার পক্ষে কোনো অসুবিধা হয় না। বাক্যের অন্বয় দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে শব্দটি 'করে' (করিয়া) না 'করে' (করিয়া থাকে), 'মরে' (মরিয়া) না 'মরে' (প্রাণত্যাগ

করে)। অনুজ্ঞাতে একটু অসুবিধা হইতে পারে। 'কর' (এখনই কর) এবং 'কর' (করিও) এই দুই রকম রূপের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা সহসা ধরা না পড়িতে পারে। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা এ সকলও সহিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। ইংরাজীর একই বানানের শব্দে স্থল বিশেষে বিভিন্ন উচ্চারণের অভাব নাই, অথচ আমরাই মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলি। 'read' 'wind' প্রভৃতি শব্দ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

একটা কথা এখানেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, উচ্চারণ অনুসারে বানান-পদ্ধতি স্থির করিতে গেলে তাহা বাংলা ভাষায় একটা প্রলয় আনয়ন করিবে। ধরা গেল এক স্থানের ভাষাকেই আদর্শ ধরিলাম—যদিও তাহাতেও অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে—কিন্তু এক প্রদেশেই কোনো 'অ' 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয়, আবার কোনো 'অ' অবিকৃত থাকে। পণ, রণ, ক্ষণ ; কিন্তু মন, বন, ধন। অথচ ইহাদের প্রায় সবগুলিই সংস্কৃত শব্দ।

শুধু তাহাই নহে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যুৎপন্ন এবং বানানেও ভেদ আছে এমন অনেক শব্দ একই রূপে উচ্চারিত হয়। বানানে ভেদ থাকিলেও উচ্চারণে কোনো অসুবিধা হয় না। এখানে বানান এক করিয়া ফেলিলে অর্থগ্রহের পক্ষেই অসুবিধা জন্মিবে। উদাহরণ স্বরূপ 'লক্ষ' 'লক্ষ্য', 'কটী' 'কোটী' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যায়।

(গ) পরে উ স্বর থাকিলেও পূর্ববৎ 'অ' 'ও' হয়। যথা, 'পড়ুয়া' 'পোড়ুয়া' (পোড়ো, পড়ো, প'ড়ো) ; প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখায় 'প'ড়ো' বানান দেখিয়াছি। ওইরূপ মরুক, ম'রুক, মোরুক ; মহুয়া, মোহুয়া ইত্যাদি। উ-কার পরে আছে বলিয়া অনেকে 'গোরু'কে 'গরু' লেখেন। সুনীতি বাবু 'গোরু' লিখিবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন মূল শব্দে ও বা উ থাকিলে অপভ্রষ্ট শব্দে তাহার চিহ্নস্বরূপ ওকার রাখা উচিত। এই কারণে তিনি 'মতি' না লিখিয়া 'মোতি' লেখেন, কারণ 'গোরু' যেমন 'গোরূপ' হইতে আগত 'মোতি' তেমনি 'মৌক্তিক' হইতে আগত।

(ঘ) পূর্বে ই বা উ স্বর থাকিলে পরবর্তী আকারাদির প্রভাবে তাহা যথাক্রমে একার বা ওকার হইতে চায়। যেমন 'ভিতর' 'ভেতর', 'উপর' 'ওপর', 'পিছন' 'পেছন', 'উঠে' 'ওঠে' ইত্যাদি। 'বাংলার বানান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে রবীন্দ্রনাথের মতটি এই প্রসঙ্গে তুলিয়া দিতেছি। "আজকাল অনেকেই লেখেন—'ভেতর' 'ওপর' আমি লিখি নে। কিন্তু কার বিধান মতে চলতে হবে ?"

(ঙ) ঘুমান, চিবান, এগান, বিলান প্রভৃতি ণিজন্ত ধাতুর দ্বিতীয় অক্ষরের 'আ'র উচ্চারণে 'ও' হয়। ফলে বানান হয় 'ঘুমোন' 'চিবোন' ইত্যাদি। অনেক সময় ওকার বা আ-কার কিছুই দেওয়া হয় না, শুধু অ-যুক্ত ব্যঞ্জনটি

রাখিয়া দেওয়া হয়। যেমন, 'চিবতে' 'ঘুমতে' ইত্যাদি। "গাড়ী ঢিকতে ঢিকতে' ছদিনের দিন পৌছল।"—নীললোহিত, প্রমথ চৌধুরী।

অকার বা ওকারের স্থানে উ-কারের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন, 'ঘুমুতে' 'চিবুতে' ইত্যাদি। তিন রকমের ব্যবহারই প্রচলিত। কি রাখিতে হইবে? আর কি ত্যাগ করিতে হইবে?

জোর দেওয়ার জন্য অনেক শব্দে একটা 'ও' যুক্ত করা হয়। যেমন, 'কখনও' 'তখনও' ইত্যাদি। কিন্তু অনেক সময় এই শব্দগুলির 'কখনো' 'তখনো' এই রকম বানান করা হইয়া থাকে। বিরুদ্ধবাদীর দল বলেন, 'কখনো' 'তখনো' 'কোনো' রাখিতে হইলে সামঞ্জস্যের অনুরোধে 'একজনো' (একজনও-এর পরিবর্তে) রামো (রামও-এর পরিবর্তে) এইরূপ বানান সমর্থন করিতে হইবে। ততটা কি সম্ভব?

২. ই—ঈ

(ক) বাংলায় 'ই' ও 'ঈ'র উচ্চারণে কোনো ভেদ নাই বলিলে অনেকে মনে করেন উভয় ই স্বরের[১] উচ্চারণ একই রকম। বস্তুতঃ তাহা নহে। 'তিন', 'রীত', 'হিম' প্রভৃতি শব্দের ই-স্বর এবং 'তিলেক', 'রিপু', 'ভীষণ' প্রভৃতি শব্দের ই-স্বর একরূপ নহে। প্রথমোক্ত উদাহরণের ই-স্বর গুরু এবং শেষোক্ত দৃষ্টান্তের ই-স্বর লঘু[২]। কিন্তু উচ্চারণ গুরু হইলে স্বর দীর্ঘ বা উচ্চারণ লঘু হইলে স্বর হ্রস্ব হইবে এমন কোনো মানে নাই। আমরা সাধারণতঃ বানান অনুসারে উচ্চারণ বা উচ্চারণ অনুসারে বানান করি না। 'শিব' শব্দের 'ই'কে দীর্ঘ করি, 'মলিন' শব্দের 'ই'কেও দীর্ঘ করি। অথচ 'অধীরতা'য় 'পীতাম্বর'-এ 'ঈ'র হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাংলার ই-স্বরের (এবং অন্য স্বরেরও) উচ্চারণ ও বানান কেহ কাহারও অধীন নহে।

কেহ কেহ সমোচ্চারিত দুই শব্দের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ঈ ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথ অব্যয় বুঝাইতে 'কি' এবং সর্বনাম বিশেষণ বুঝাইতে 'কী' লেখেন। 'ছায়া সীতা' নামক একখানি উপন্যাসে 'হুকখীত' বানাও দেখিতে হইয়াছে। এস্থলে অবশ্য কোনো কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

(খ) মামী, মাসী, পিসী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে 'ই' এবং 'ঈ' এই উভয় স্বরের ব্যবহার লক্ষিত হয়। কিন্তু 'ঈ'-এর ব্যবহার বেশী। 'ঈ' যদি সর্বজনগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে 'দিদি'র কি বানান হইবে? বিবিকে কেহ কি 'বিবী' লিখিবেন?

১. ই-স্বর বলিলে সাধারণতঃ ই এবং ঈ এই উভয় স্বরকে ধরিতে হইবে।

২. স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত "যক্ষের নিবেদন" শীর্ষক মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত কবিতায় হ্রস্ব স্বরে গুরু উচ্চারণের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

(গ) 'পাখী পাখি' দুই বানানই দেখা যায়। দীর্ঘ ঈ বোধ হয় পক্ষীর নজিরে। 'বেশী বেশি', 'দেরী দেরি', 'খুশী খুশি', 'তৈরী তৈরি' প্রভৃতিতেও দুই 'ই'। '-টি' প্রত্যয়েও দুই ইকারের ব্যবহার। যেমন 'একটি একটী'। কোন্-টি থাকিবে ?

(ঘ) ইন্-ভাগান্ত সংস্কৃত শব্দ বাংলায় দীর্ঘ-ঈকারান্ত হয়। যেমন, 'পক্ষী, অধিকারী, দুঃখী, সুখী' ইত্যাদি। অন্য শব্দের সঙ্গে যখন এই সকল শব্দের সমাস হয় তখন দীর্ঘ ঈ কোথাও কোথাও অপরিবর্তিত থাকে। যাঁহারা হ্রস্ব করেন তাঁহারা সংস্কৃতের নিয়ম মানিয়া চলেন। আর যাঁহারা 'যাত্রীদল' লিখিতে চান, তাঁহারা 'যাত্রী'কে বাংলা শব্দ ধরিয়া বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে কাজ করেন। উভয়ের পক্ষেই যুক্তি আছে। এখন কর্তব্য কি ?

(ঙ) বিদেশী শব্দে ই ধ্বনি থাকিলে বাংলায় তাহা উচ্চারণ নির্বিশেষে কখনো 'ই' কখনো 'ঈ' আবার কখনো বা উভয় স্বরের দ্বারাই বানান করা হইয়া থাকে। যথা, 'গরিব গরীব', 'খ্রিষ্ট খ্রীষ্ট', 'ষ্টিমার ষ্টীমার', 'ষ্টিল ষ্টীল'[১]। বিদেশী শব্দের বেলায় একটি মাত্র ই রাখাই সংগত নয় কি ?

(চ) পক্ষী, দুঃখী প্রভৃতির দেখাদেখি 'দরদী, মরমী' প্রভৃতি শব্দেও 'ঈ'র ব্যবহার লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু হ্রস্ব-ইও মধ্যে মধ্যে দেখা যায় না এমন নহে। জাতীয় বা দেশীয় বুঝাইতেও উভয় স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। যথা, হিন্দুস্থানী —নি, ইংরাজী —জি, ফারসী —সি, বাঙালী —লি ইত্যাদি।

৩. উ—ঊ

উকারের গোলমাল তত বেশী নয়। 'দুক্‌খীতভাবে' লেখেন যে গ্রন্থকার তাঁহার বইখানি ঘাঁটিয়াও কেবল তৎসম শব্দ ব্যতীত অন্যত্র দীর্ঘ 'ঊ' চোখে পড়িল না। পক্ষীর নজিরে যাঁহারা 'পাখী' লেখেন তাঁহারাও সূত্রের নজিরে কদাচিৎ 'সূতা' লেখেন। আর 'মুহূর্ত' 'কৌতুক' 'কৌতূহল' 'শ্মশ্রূ' প্রভৃতি শব্দে হ্রস্ব 'উ' দীর্ঘ 'ঊ'র যে সকল পরিবর্তন ঘটে সেগুলি কেহ স্বেচ্ছায় করেন না বলিয়াই মনে হয় ; অর্থাৎ সেগুলি সাধারণ প্রমাদের পর্যায়ে পড়ে।

৪. ঋ—ঌ

(ক) ঋ তৎসম শব্দে আছে থাকুক, তদ্ভব শব্দে যদি থাকা সম্ভব হয় তাহাতেও আপত্তি নাই। সম্ভব হয় এজন্য বলিলাম যে সংস্কৃতের 'ঋ' তদ্ভব শব্দে প্রায় অন্য স্বর হইয়া যায়। যেমন, কৃষ্ণ—কান, ঘৃত—ঘি, অমৃত—

১. এই প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে st বুঝাইবার জন্য নূতন একটি টাইপ [স্ট] তয়ারী হইয়াছে। বাংলা লাইনোর উদ্ভাবনও হইয়াছে অনেক পরে।

অমিয়। কিন্তু যে শব্দ দেশজ বা বিদেশী সে সকল শব্দে 'ঋ' রাখার প্রয়োজন কি? 'খৃষ্ট' 'খ্রিষ্ট' ও 'খ্রীষ্ট' একই শব্দের যখন এই রকম তিনটি বানান, তখন 'ঋ'র ব্যবহার বাদ দিলে অন্ততঃ একটি তো কমে। এই প্রসঙ্গে 'বৃষ্টল' 'ক্রৃষ্ট্যাল' প্রভৃতি শব্দও তুলনীয়।

(খ) ৯ বর্ণমালায় আছে মাত্র কিন্তু ভাষায় ইহার ব্যবহার নাই। সুতরাং ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৫. এ

(ক) 'এ'র উচ্চারণ দ্বিবিধ। সাধারণ উচ্চারণ ইংরাজী bed শব্দের এ ধ্বনির অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত ইহার একটি বক্র উচ্চারণও আছে। যেমন, 'বেচা' 'চেলা' 'হেলা' 'কেমন' ইত্যাদি। সাধারণ উচ্চারণ যথা 'রেল' 'তেল' 'মেশা' 'কেনা' ইত্যাদি। সাধারণ উচ্চারণে কোনো গোল নাই। হাঙ্গামা ওই বাঁকা উচ্চারণ লইয়া।

কোনো কোনো লেখক 'এ্যা' বা 'য়্যা' লেখেন। আবার কেহ কেহ বক্র 'এ' বুঝাইবার জন্য 'অ্যা' ব্যবহার প্রস্তাব করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনস্থ বক্র ' ' বুঝাইতে [ে] এইরূপ মাত্রাযুক্ত এ চিহ্ন ব্যবহার করেন। যথা 'কেনা' কিন্তু 'বেচা', 'খেলি' কিন্তু 'খেলা'। শুধু 'এ'র বেলায় উচ্চারণের বিভিন্নতা বুঝাইবার কোনো উপায় তাঁহার কোনো পুস্তকে দেখা যায় না। 'এমন' এবং 'এমনি' এক এ দিয়াই বানান করা হয়। শব্দ মধ্যবর্তী [ে] একারের বেলাও সমস্যা থাকিয়া যায়। 'গোবেচারা'র 'বে'-র একার বক্র না সরল কি-ভাবে বোঝা যাইবে?

কয়েকটি আধুনিক উপন্যাস ও গল্পের বই ঘাঁটিয়া 'এ্যাক' 'এ্যাত' 'এ্যাকলা' 'ক্যামোন' প্রভৃতি বানান পাইয়াছি। 'এ'র বাঁকা উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য পৃথক্ কোনো বানানের প্রয়োজন আছে কি না? যদি থাকে কোন্ বানান গ্রহণীয়?

(খ) কলিকাতার অশিক্ষিত সম্প্রদায় এবং স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কোথাও কোথাও 'আ' 'অ্যা'—রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, 'কাঁথা' 'ক্যাঁথা', 'বাঁকা' 'ব্যাঁকা'। এইরূপ আকারের অ্যা-উচ্চারণ শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মুখেও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। তাহারই ফলে সাহিত্যেও ইহা কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে।

এই 'অ্যা' আবার 'ই' স্বরের পূর্বে বসিয়া 'এ' হইয়া যায়। যেমন, 'বাঁকা ব্যাঁকা বেঁকিয়ে, ঝাঁটা ঝ্যাঁটা ঝেঁটিয়ে'। 'আ'-র 'অ্যা' বা 'এ' রূপ ভাষায় স্থান পাইবে কি?

৬. ঐ—ওই—অই

'ঐ' ধ্বনির বানান নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেহ লেখেন 'ঐ', কেহ লেখেন 'ওই', আবার কেহ বা লেখেন 'অই'। তিন বানানই থাকিবে কি? কৈ—কই, বৈ—বই (ব্যতীত, দৈ—দই প্রভৃতি শব্দের কোন্ বানান চলিবে?

৭ ঔ—ওউ—অউ

'ঔ' সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। 'ঔ' 'ওউ' 'অউ' এ তিনের উচ্চারণ এক। যথা, বৌ বোউ বউ, মৌ মোউ মউ ইত্যাদি।

৮. মহাপ্রাণ বর্ণ

মহাপ্রাণ বর্ণগুলির সম্বন্ধেও একটা নিয়ম করা আশু প্রয়োজন। বাংলায় মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা শব্দের আদি ব্যতীত অন্যত্র প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে না। সেইজন্য 'করেছে' হয় 'করেচে', 'অর্ধেক' হয় 'আদ্দেক', 'বাচ্ছা' হয় 'বাচ্চা', 'শাঁখ', হয় 'শাঁক', 'পৌছেছি' হয় 'পৌচেচি' ইত্যাদি।

ওইরূপ 'বাঁঝা বাঁজা', 'সাঁঝ সাঁজ', 'মাঝা মাজা', 'দেখ্ দিখিনি' 'দেক্ দিকিনি', 'সিন্ধুক সিন্দুক' ইত্যাদি।

৯. জ—য

কোথায় 'জ' এবং কোথায় 'য' হইবে ইহা একটি সমস্যার বিষয়। কেহ কেহ সংস্কৃত বানানের অনুসরণ করিয়া 'কায' লেখেন। আবার কেহ কেহ ভাষার গতি অনুসরণ করিয়া প্রাকৃত 'কজ্জ'র নজিরে 'কাজ' লেখেন।

ওইরূপ 'যাঁতি', 'যাঁতা', 'যোড়া' প্রভৃতি শব্দ দুই 'জ'য়ের দ্বারাই বানান করা হয়। 'জায়গা' এবং 'যায়গা' দুইটি বানানই প্রচলিত। দেশজ বা বিদেশী শব্দে একটি মাত্র 'জ' রাখাই বিধেয় নয় কি ?

১০. র—ড়

পূর্ববঙ্গীয় লেখকদের হাতে পড়িয়া 'ড়' যেখানে সেখানে 'র' হইয়া যাইতেছে। সুতরাং 'র'এর স্থানেও মধ্যে মধ্যে 'ড়' আসিয়া বসিতেছে। কিন্তু এগুলিকে সম্ভবতঃ ভুলের গণ্ডীতে ফেলা যায়। সাহিত্যে তাহা কোনো দিন স্বীকৃত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করি না।

১১. ন—ণ

'ন' ও 'ণ'-এর সমস্যাও বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। 'বানান' শব্দটিরই একাধিক বানান আছে। কেহ লেখেন 'বানান', কেহ লেখেন 'বাণান'।

এইরূপ 'আগুন আগুণ', 'সোনা সোণা', 'কান কাণ', 'চুন চুণ', 'নরুন নরুণ'। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি।

"পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালাই করলেন—সেটা হলো

অত্যন্ত আড়ষ্ট। বিশুদ্ধভাবে সমস্ত তার বাঁধাবাঁধি—সেই বাঁধন তার নিজের নিয়ম-সংগত নয়—তার ষত্ব ণত্ব সমস্তই সংস্কৃত ভাষার করমাসে। সে হঠাৎ বাবুর মত প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেকে বনেদী বংশের বলে প্রমাণ করতে চায়। যারা ওই কাজ করে তারা অনেক সময়েই প্রহসন অভিনয় করতে বাধ্য হয়। কর্ণেলে গবর্ণরে পণ্ডিতি করে মূর্ধন্য ণ লাগায়, সোনা পান চুনে তো কথাই নেই।"

এখন পণ্ডিতেরা বিচার করুন—কোথায় মূর্ধন্য ণ এবং কোথায় দন্ত্য ন লাগানো আবশ্যক।

১২. রেফ [´]

সংস্কৃতে দেখি রেফযুক্ত বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। 'সর্ব্ব সর্ব, মর্ম্ম মর্ম, কার্য্য কার্য' ইত্যাদি। দ্বিত্ব না করিয়া লেখার দিকেই বরং ঝোঁকটা বেশী। বাংলায় কিন্তু রেফযুক্ত বর্ণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিত্ব করা হয়। ইদানীং কেহ কেহ 'বর্ধন, মর্ম, পূর্ব' এইরূপ লিখিতেছেন।

দ্বিত্ব না করিলে যখন সংস্কৃতে অশুদ্ধ হয় না তখন বাংলায় তৎসম শব্দ বানান করিতে বৃথা দ্বিত্ব করার আবশ্যক কি? তৎসম দূরের কথা, আমরা 'কর্ল্ুম' 'চর্ব্বি' 'কার্ব্বন' পর্দ্দা' প্রভৃতিতেও দ্বিত্ব করিয়া থাকি।

১৩. বিসর্গ [ঃ]

'ক্রমশঃ অন্ততঃ বস্তুতঃ' প্রভৃতি শব্দে বিসর্গকে অনেক লেখকই বিসর্জন করিতেছেন। আবার রক্ষাও করিতেছেন অনেকে। কি করা কর্তব্য?

'মনস্ শিরস্' প্রভৃতির স্ লোপ ঘটায় 'মন শির' প্রভৃতি শব্দকে খাঁটি বাংলা বলি। তথাপি সমাসের সময় পূর্বতন সংস্কৃতরূপের শরণাপন্ন হইয়া 'শিরোমণি' লিখিতে হয়।

কেহ কেহ 'মনযোগ' 'শিরমণি' লিখিতেছেন। এইরূপ প্রয়োগকে বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে শুদ্ধ বলিয়া ধরিব কি না?

১৪. ম–ব

'ম' চলিত বাংলায় কোনো কোনো লেখকের হাতে স্থান বিশেষে 'ব' হইয়া যায়। শুদ্ধি অশুদ্ধির কথা বলিতেছি না। আম্রের পক্ষে 'আঁব' অথবা তাম্রের পক্ষে 'তাঁবা' হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে 'আম' ও 'আঁব', 'তামা' ও 'তাঁবা' এই দুই রকম শব্দই কি চলিবে? না, একটি রাখিয়া অন্যটি ত্যাগ করিতে হইবে?

এইরূপ 'নামা'-র রূপান্তর 'নাবা'-র প্রচলন আছে। দুইটিই কি রক্ষণীয়?

১৫. উর্ধ্বকমা বা ইলেক [']

সংস্কৃতে দেখি সন্ধির সূত্রে দুই শব্দের যোগ হইয়া কোনো 'অ' যদি লুপ্ত হয় তাহা হইলে লুপ্ত অকার [ঽ] দ্বারা তাহার সন্ধিপূর্ব অস্তিত্ব দেখান হয়। বাংলার ইলেক অনেকটা এই ধরনের চিহ্ন। কোনো বর্ণের লোপ হইলেই ইহা সাধারণতঃ বসিয়া থাকে।

(ক) করে' ক'রে, ধরে' ধ'রে, পড়ে' প'ড়ে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়ায় ইলেকের ব্যবহার দুই স্থানে দেখা যায়। ইলেকের ব্যবহার আদৌ থাকিবে কি না তাহা অবশ্য পূর্বেই স্থির করিয়া ফেলা প্রয়োজন। যদি ইলেকের ব্যবহার চলে তাহা হইলে কোন্ কোন্ স্থলে তাহা করা প্রয়োজন তাহাই এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। অসমাপিকা ক্রিয়ায় ইলেকের ব্যবহার যদি রাখা হয় তাহা হইলে অন্ত্য অক্ষরে দেওয়া উচিত, অথবা আদ্যক্ষরে ?

(খ) দেখান, শোনান, দাঁড়ান, করান, পালান, ভাঁড়ান প্রভৃতি ধাতুর সামান্যরূপে (infinitive) ন-এর তিনরূপ দেখা যায়। কখনো ন শুধুই থাকে, কখনো 'ও' যোগ করা হয়, আবার কখনো বা ইলেক দেওয়া হয়। এস্থলে ইলেক থাকা বাঞ্ছনীয় কি না ?

(গ) অনুজ্ঞায় ইলেকের ব্যবহার হইয়া থাকে। বল' (বলহ) ব'লো (বলিও), কর' ক'রো—এ সকল স্থলে ইলেক দিতে হইলে কোন্‌খানে দেওয়া উচিত ?

(ঘ) আপাততঃ, অন্ততঃ, প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ লোপ হওয়ায় কেহ কেহ ইলেক দিয়া উহাদের স্বরান্ত বুঝাইবার চেষ্টা করেন। আদৌ তাহার প্রয়োজন আছে কি ? ত অব্যয়ে ইলেক দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি ? ত অব্যয়ে ইলেক দিয়া অনেকে উহাদের স্বরান্ত-ভাব বুঝাইবার চেষ্টা করেন। আদৌ তাহার প্রয়োজন আছে কি ? ত তো (১ সংখ্যক জিজ্ঞাসাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য) এবং ত' এই তিন রূপই দেখিতে পাই।

(ঙ) তা'র (তাহার) যা'র (যাহার) কা'র (কাহার) প্রভৃতি শব্দে লুপ্ত 'হা'র স্থানে কেহ কেহ ইলেক ব্যবহার করেন। ইহা কি আবশ্যক ?

(চ) 'উপর' শব্দের 'উ' উহ্য রাখিয়া উহার স্থলে ইলেক দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় উপরে-র স্থলে 'পরে লেখেন।

১৬. হাইফেন [-] ও ফাঁক

(ক) সমাস হইলে দুইটি শব্দের মধ্যে হাইফেন কখনো বসে, কখনো বসে না। যথা, হাজার-বার-শ, হাত-পা, কূল-কিনারা ইত্যাদি। ঠিক এই ধরনের শব্দই আবার বিনা হাইফেনেও লিখিত হয়। একই প্রবন্ধের মধ্যে কখনো বা সেবা-প্রতিষ্ঠান আবার কখনো বা সেবাপ্রতিষ্ঠান দেখা যায়।

(খ) সমাসবদ্ধ পদদ্বয়ের মধ্যে বিকল্পে ফাঁকও দৃষ্টিগোচর হয়। 'ইহা দ্বারা' 'জাহাজ কোম্পানি' 'এই জন্য' 'তা ছাড়া' 'ফল দ্বারা' 'সেবা প্রতিষ্ঠান' ইত্যাদি।

(গ) 'এ' 'যে' প্রভৃতি সর্বনামের পরবর্তী শব্দ হাইফেন দ্বারা যুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা, এ-কথা, যে-লোক, সে-দিন, ইত্যাদি।

১৭. ং, ঙ্, ঙ্গ্। ঙ, ঙ্গ

(ক) অনুস্বর, ঙ্, এবং ঙ্গ্ নির্বিচারে একই স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বাংলা বাঙ্লা বাঙ্গালা বাঙলা বাঙ্গলা, রং রঙ্ রঙ্গ্, ঢং ঢঙ্ ঢঙ্গ্, আংটি আঙ্টি আঙ্গ্টি ইত্যাদি। তবে হসন্ত উচ্চারণে ঙ্গ-এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প।

(খ) স্বরান্ত উচ্চারণে অনুস্বরের ব্যবহার হয় না, কাজেই 'ঙ' এবং 'ঙ্গ' ব্যবহৃত হয়। যথা, বাঙালী বাঙ্গালী, ব্যাঙাচি ব্যাঙ্গাচি, ভাঙানি ভাঙ্গানি, আঙুল আঙ্গুল ইত্যাদি।

আমরা প্রধানত অ-তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কেই এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। কিন্তু তৎসম শব্দের ব্যবহারেও মধ্যে মধ্যে বিপত্তির উদ্ভব হয়। একালে অনেকে গংগা, অংগ, বংগ, বংকিম, শংকিত, অংক, রংগ, সংগে লিখিতেছেন। ঙ্ এবং ং-এর উচ্চারণ একরূপ হওয়ায় এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। সংস্কৃতে অহংকার অহঙ্কার, অলংকার অলঙ্কার, সংগীত সঙ্গীত প্রভৃতি শব্দে ং এবং ঙ্ দুইয়েরই ব্যবহার আছে। অহম্ অলম্ প্রভৃতি শব্দের ম্ পদান্তস্থিত বলিয়াই তাহার স্থানে বিকল্পে অনুস্বর এবং ঙ্ দুইই হয়। কিন্তু অংগ বংগ বংকিমে সে নিয়ম খাটে না, এ সকল স্থলে ং-এর প্রয়োগ ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ। বিকল্প বর্জন করিয়া সর্বত্র পঞ্চম বর্ণ ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি?

হসন্তের ব্যবহারে অনিয়মবশতঃ আর একরকমের গণ্ডগোল দেখা যায়। পৃথক্, দিক্, সংসদ্ প্রভৃতি শব্দে কেহ কেহ হসন্ত দিতেছেন না। উপনিষদ-এ যদি হসন্ত না দিই তবে কি তাহা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে? 'উচিত' এবং 'জগৎ'-এ পার্থক্য থাকিবে না? 'শ্রীমান্' এবং 'বর্ধমান'—এই দুই শব্দেরই শেষাক্ষর একাকার করিব? তাহা হইলে 'বিদ্যুৎ' না লিখিয়া 'বিদ্যুত' লিখিতে হয়. 'যাবৎ তাবৎ উপনিষৎ পূর্ববৎ' শব্দের ৎ গুলি ত হইয়া যায়। এতটা কি সহ্য হইবে? সত্তা-র জায়গায় সততা তো চলিতেছে। তাই বলিয়া সৎ-এর স্থানে কি সত চলিবে?

বাংলার বর্ণ ও ধ্বনি

এগারটি স্বর ও ছত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ লইয়া বাংলা বর্ণমালা গঠিত। স্বর এগারটি হইতেছে।—

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

স্বরবর্ণের দলে ৠ এবং ঌ-কে স্থান দিলে স্বরের সংখ্যা আবার একাদশের স্থানে ত্রয়োদশ হইয়া যায়। বর্ণমালায় ৠ এবং ঌ থাকিবে কি না এ প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে।

বাংলা ভাষায় ঌ-র ব্যবহার একেবারেই নাই, দীর্ঘ ৠ-র প্রয়োগও নাই বলিলেই চলে। বাংলা তো দূরের কথা সংস্কৃতেই বা ঌ ও দীর্ঘ ৠকার যুক্ত শব্দ কয়টি আছে?

স্মার্তগণ ত্রিবিধ ঋণের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈয়াকরণগণ সব ঋণ শোধ করিয়াছেন, কিন্তু 'পিতৄণ' হইতে আজিও মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। 'পিতৄণ' গেলে সহর্ণের্ঘঃ সূত্রের উদাহরণ কম পড়িয়া যায়। পাণিনি হইতে লোহারাম পর্যন্ত সকলকেই ওই উদাহরণটির উপর ভর করিতে হইয়াছে। সুনীতিবাবুর মত ভাষাতাত্ত্বিকও উপায়ান্তর পান নাই। চলন্তিকাকার রাজশেখরবাবুও চলন্তিকার পরিশিষ্ট অংশে সন্ধি পরিচ্ছেদে ওই উদাহরণটি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুই-একজন সাহসিক বৈয়াকরণ 'ভ্রাতৄদ্ধি' পর্যন্ত গিয়াছেন। তবে অধিকাংশ বাংলা ব্যাকরণ-প্রণেতা অতটা ভরসা করিতে পারেন নাই।

পাণিনি, বোপদেব প্রভৃতির কথা থাক, কিন্তু লোহারাম, নকুলেশ্বর প্রমুখ বাংলা ভাষার বৈয়াকরণগণ যখন 'পিতৄণ' অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তখন বাংলায় যে দীর্ঘ ৠ আছে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। বস্তুতঃ তাহা আমরা মানিয়া লইয়াছিও। এবং মানিয়াছি বলিয়াই ছাপাখানার দুইটি অকেজো টাইপ অনর্থক রাখিয়াছি। দুইটি বলিতেছি এইজন্য যে, ৠ স্বীকার করিলে [ৄ]-কে অস্বীকার করিবার জো থাকে না। কথাটা বোধহয় ঠিক হইল না। বরং বলা উচিত [ৄ]-কে মানিয়াছি বলিয়াই ৠকে মান্য করিতে হইতেছে।

দীর্ঘ ৠ মানি আর যাহাই করি, ইহা যে স্বরসন্ধির একটি বিশেষ সূত্র মুখস্থ করিবার সময় ভিন্ন আর কোনো কাজে আসে না এ-বিষয়ে সকলেই একমত। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কয়টা দীর্ঘ ৠ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? যদি না-ই পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাংলা ভাষার বর্ণমালায় উহা রাখিবার প্রয়োজন কি?

ঌকার সহজে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না বলিয়া বর্ণবোধক পুস্তকে তাঁহাকে ডিগবাজি খাওয়ানো হইয়াছে। বস্তুতঃ ঌ-কে বাংলা বর্ণমালায় স্থান দিবার কোনো হেতু দেখি না। দীর্ঘ ৠর পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিটি দেখানো যাইতে পারে।—

পিতৄণ শব্দ সংস্কৃত বটে তবু উহা যদি বাংলায় ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহাকে বাংলা শব্দাবলীর মধ্যে স্থান দিতে হইবে। আর বাংলা শব্দের বানানের জন্য যে বর্ণের প্রয়োজন আছে তাহাকে বর্ণমালা হইতে বিতাড়িত করা সংগত নয়।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে এই উত্তর দেওয়া যায়।—

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। বাংলা সাধু ভাষায় এইরূপ তৎসম শব্দের প্রয়োগ প্রচুর। কিন্তু যে-কোনো সংস্কৃত শব্দকে যে-সে যখন-তখন বাংলা ভাষায় প্রয়োগ করিতে পারে না। শক্তিশালী লেখকগণ অবশ্য মধ্যে মধ্যে নূতন কথা অন্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া অথবা নিজেরা গঠন করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। সংবাদপত্র প্রভৃতির দ্বারাও সময়ে সময়ে নূতন কথা ভাষায় প্রবেশ করে। অবস্থা অনুকূল হইলে সেরূপ শব্দ ভাষায় প্রচলিত হইয়া যায়। যে শব্দ একবার চলিয়া যায় তাহাকে ভাষার অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না। পিতৄণ যদি বাংলায় চলিয়া যাইত, তাহা হইলে উহাকে বাংলায় ব্যবহৃত বহু তৎসম শব্দের অন্যতম বলিয়া ধরিয়া লইতাম। কিন্তু পিতৄণ সে-ভাবে চলে নাই।

যে শব্দ বাংলায় ব্যবহার করা হয় না তাহাকে বাংলা শব্দ বলিয়া ধরিয়া লইব কেন? বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-রচয়িতারাই বা সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রকে বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগ করিবেন কেন? তৎসম শব্দের প্রসঙ্গে সংস্কৃত নিয়ম প্রযোজ্য তাহা মানি। কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতের প্রত্যেকটি নিয়মই বাংলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। সংস্কৃতে লুপ্ত অকার [ঽ] আছে কিন্তু বাংলায় 'ততোধিক' লিখিলে কেহ দোষ দেয় কি?

বস্তুতঃ দীর্ঘ ৠ-যুক্ত কোনো পদ ব্যাকরণ ভিন্ন অন্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না। কোনো বাঙালী লেখক পিতৄণ লিখিতে রাজী হইবেন না। লিখিতে হইলে দীর্ঘ ৠকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পিতৃ-ঋণ বা পিতৃঋণ লিখিবেন। আর কথ্য ভাষায় কেহ পিতৄণ শব্দ উচ্চারণ করিলে স্বয়ং তারাশংকর তর্করত্নের পক্ষেও হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইত।

আর যদি তর্কের খাতিরে বাংলায় ওই শব্দের অস্তিত্ব স্বীকারই করি, তাহা হইলেও ওই একটি শব্দের জন্য একটি [ৄ] এবং একটি ৠ টাইপ রাখার প্রয়োজন নাই। দুইটি ঋ যদি পাশাপাশি থাকে এবং উহাদের মধ্যে যদি ফাঁক না থাকে তাহা হইলে দীর্ঘ ৠ-র চিহ্ন ব্যতীতও ওই দুইটিকে মিলিত ভাবে একটি দীর্ঘ-ৠ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কার্যতঃ এরূপ ধরিবার কোনো কারণ নাই। পিতৃঋণ-এ সন্ধি হয় নাই। এবং সন্ধি না হইলেও সমাসের দ্বারা উহাদের যোগ হইয়াছে। আর সমাসের যোগ যে সন্ধি অপেক্ষা নিবিড়তর সে সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত থাকিতে

পারে না। এ অবস্থায় বাংলা বর্ণমালা হইতে ঋ বর্ণকে বাদ দিলে ক্ষতি কি? যদি বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে স্বরের সংখ্যা এগারটিই দাঁড়ায়।

এই এগারটি স্বরের মধ্যে প্রথমে অ আ দিয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

বাংলার বর্ণমালা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে উহার একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি পড়ে। বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি বর্ণের নামেই আমরা এক একটি বিশেষণ যোগ করিয়া থাকি। সংস্কৃত বর্ণমালা-ব্যবহারকারী জাতিসমূহের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বাঙালীই বর্ণপরিচয়ের জন্য শুদ্ধমাত্র বর্ণের নামের উপর নির্ভর না করিয়া এক এক একটি বিশেষণের আশ্রয় লয়।

বাঙালী শিশু পাঠশালায় যখন পড়া আরম্ভ করে, তখন শুধু অ আ বলে না; বলে স্বরে-অ, স্বরে-আ। শুধু ই ঈ বলে না; বলে হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ। ওইরূপ উ ঊ না বলিয়া বলে হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, বাংলার বর্ণমালায় যে বর্ণগুলি আছে তাহাদের প্রত্যেকটিকে বুঝাইবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি নাই। তাই কয়েক স্থলে একই ধ্বনি দ্বারা একাধিক বর্ণ সূচিত হয়। কাজেই এক-একটি বিশেষণ যোগ করিয়া বর্ণসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইঁদুর এবং ঈশ এই দুই শব্দের আদ্য স্বর এক নয় কিন্তু উহাদের উচ্চারণ দ্বারা এখানে বর্ণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অতএব এস্থলে যদি বলিয়া দেওয়া না হয় যে ইঁদুর 'ই' হ্রস্ব এবং ঈশের 'ঈ' দীর্ঘ, তাহা হইলে বানানে ভুল হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ বর্ণের মূল ধ্বনির সহিত বঙ্গীয় ধ্বনির অনেক দিক্ দিয়াই পার্থক্য ঘটিয়াছে। সেই কারণেই বাঙালীর বানানে এত অশুদ্ধি দেখা যায়। বাঙালী সংস্কৃতের ধ্বনি বজায় রাখিতে পারে নাই, কিন্তু সংস্কৃতের বর্ণগুলিকে যত্নসহকারে রক্ষা করিয়াছে। আমাদের কাছে দীনেশ ও দিনেশ উভয়ে সমান। গিরীশ এবং গিরিশ—ইহাদের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা আমাদের চোখেই ধরা পড়ে, কিন্তু কান এড়াইয়া যায়। একই কারণে আমরা 'সূ'তপুত্র কর্ণ লিখিয়া বসি, সূরে (সূর্য) এবং সুরে (দেবতা) গণ্ডগোল করি, মুহূর্ত লিখিতে মূহুর্ত লিখি, কৌতূহলে হ্রস্ব-ই এবং কৌতুকে দীর্ঘ-ঊ দিয়া কৌতুকের সৃষ্টি করি।

বাংলার বর্ণমালায় এগারটি স্বরবর্ণের ছয়টি বিশেষণ-যুক্ত তাহা পূর্বে দেখানো হইয়াছে। বর্ণমালার প্রথম স্বরটি হইতেই আরম্ভ করা যাক।

পল্লীর পাঠশালার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন অ এই স্বরটিকে স্বরে-অ নামে অভিহিত করা হয়। ইহার এইরূপ নামকরণ হইল কেন? তাহার কারণ এই যে বাংলায় অ এবং য় (য়্+অ) ইহাদের উচ্চারণ প্রায় সমান। পুরাতন বাংলা পুঁথিতে 'অ' বা 'য়', 'আ' বা 'য়া' একই শব্দে নির্বিচারে ব্যবহৃত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে উদ্ধৃত করা হইল :

জাঅ (যাও অর্থে)। মাঅ, মায় (মাতা অর্থে)। হঅ, হয় (হও অর্থে)। আর, য়ার। আন, য়ানাহী (অন্যে)।

চর্যাপদ হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

জাঅ, জায় (যায় অর্থে)। নিঅহি, নিয়ড্ডী (নিকটে)। রঅণ, রয়ণ (রত্ন)। বিঅপ্প, বিয়প্প (বিকল্প)। বিষয়, বিষঅ। হিঅ (হৃদয়) ; হিঅহি, হিয়এ (হৃদয়ে)।

পূর্বে বলিয়াছি, অ এবং য় এই দুই বর্ণের উচ্চারণ প্রায় সমান। লেখার সময় অ এবং য়-এর ব্যবহারে তেমন কোনো নিয়মশৃঙ্খলা ছিল না। 'আর' বলিবার সময় লোকে নিশ্চয় yara উচ্চারণ করিত না, তবু 'য়ার' বানান বিরল নহে। বানান সম্বন্ধে পুরাতন বাংলায় যথেষ্ট শিথিলতা ছিল, আধুনিক বাংলাতেও যে তাহা বিশেষ কমিয়াছে তাহা মনে হয় না। পুরাতন ভাষামাত্রেই বানানে অল্প-বিস্তর যথেচ্ছাচার দেখা যায়। ইহার খুব সংগত কারণও আছে। মানুষের মুখের ধ্বনির যত দ্রুত পরিবর্তন হয়, হাতের কাজ তত দ্রুত বদলাইতে চায় না। বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি ধ্বনির চিহ্ন মাত্র। এই সমস্ত ধ্বনির অনেক-গুলি বদলাইয়া যায় বা লোপ পাইয়া থাকে কিন্তু তবু তাহাদের চিহ্নগুলি যায় না। আবার যে সকল নূতন ধ্বনির উদ্ভব হয় তাহাদের পরিচয়যোগ্য চিহ্নও তৈয়ার হয় না। বানানের শিথিলতার ইহাই সর্বপ্রধান কারণ।

এই কারণে পুরাতন ভাষার বানানের উপর নির্ভর করিয়া ধ্বনিতত্ত্ব নিরূপণ করা দুরূহ। পুরাতন বাংলায় যেমন আর স্থানে য়ার পাওয়া যায় তেমনই অক্ষ স্থানে য়ক্ষ, উত্তম স্থানে য়ুত্তম, এবার স্থানে য়েবার প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়।

আসল কথাটা এই যে, য় বর্ণটিকে অনেক সময় স্বরবর্ণের বাহনরূপে ধরা হইত। নাগরীতে অ স্বয়ং একটি স্বরবর্ণ হইয়াও ও এবং ঔ স্বরের বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়। আজকাল অনেকে নাগরী 'ও' 'ঔ'-এর জন্য স্বতন্ত্র বর্ণ ব্যবহার না করিয়া অ-য়ে ওকার ओ এবং অ-য়ে ঔকার औ দিয়া কাজ চালান। বাংলায় এইরূপ একটি স্বরবর্ণকে অন্য স্বরের বাহন করা হয় নাই বটে, কিন্তু য় এই ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বারা বাহকতার কাজ করাইয়া লওয়া হইয়াছে।

শুধু আ-কার, ই-কার, ঈ-কার ইত্যাদি যোগ করিলে ততটা গোলযোগ হইবার কথা ছিল না। কিন্তু অ-কার যুক্ত হওয়ার জন্যই সমস্যাটা জটিল হইয়াছে।

অ ব্যতীত অন্যান্য সকল স্বরেরই ব্যঞ্জনাশ্রয়ী একটা চিহ্ন আছে ; নাই কেবল অ-এর। য়ামি, য়ুত্তম, য়েবার শব্দে [া] আকার, [ু] উকার, [ে] একার থাকাতে য়-এর অস্তিত্ব একরকম উপেক্ষা করাই হইয়াছে। ওই সকল স্থলে য়-এর কোনো কাজই নাই, উহা কেবল [া], [ু] এবং [ে] এই স্বরচিহ্নগুলিকে বহন করিতেছে মাত্র।

কিন্তু য়ক্ষ (অক্ষ), য়খণ্ড (অখণ্ড) প্রভৃতি শব্দে য় বর্ণটাই চোখে পড়ে। বস্তুতঃ য়-এর অন্তর্গত অ বর্ণটারই যে ওখানে প্রাধান্য, এবং অ-কার ব্যতীত য়্-এর যে ওখানে কিছুমাত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহা আর তলাইয়া দেখা হয় না। 'য়' কে যে 'অ'-এর পরিবর্তরূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।

শিথিলতার মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। লেখকেরা একই শব্দে 'য়' এবং 'অ' যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ একই ধ্বনির জন্য দুইটি পৃথক্ বর্ণ বিনা বিতর্কে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

ইহা হইতে একটা জিনিস স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ওই সময়ে—অর্থাৎ যে সময়ে য় এবং অ নির্বিচারে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সময়ে—য় এবং অ এক অ নামেই পরিচিত হইতেছিল। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসারে এককালে ইঅ বলিতেন বটে, কিন্তু অপভ্রংশ অবস্থার পূর্ব হইতেই য-কে বর্গীয় জ-এর ন্যায় উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে-কথা পরে বলা হইবে। অপভ্রংশ অবস্থায়—যখন য য-শ্রুতিরূপে ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিল তখন—য-কে একটি স্বতন্ত্রবর্ণ রূপে ভাষায় স্থান দেওয়া হইল। পূর্বে য (উচ্চারণ জ) তো ছিলই, কিন্তু ওই অবস্থায় একই য প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ (ইঅ) লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল। কার্যতঃ উহারা পৃথক্ বর্ণ (কারণ উহাদের ধ্বনি সম্পূর্ণ পৃথক্) হইলেও আকৃতিতে কোনো প্রকার পার্থক্য ছিল না। এমন কি পুরাতন বাংলাতেও [.] নিম্নবিন্দুযুক্ত 'য়' দেখা যায় না। বিন্দুর বয়স খুব বেশী নয়।

যাহাই হউক, ওই য-শ্রুতির য এবং পূর্ববর্তী য (যাহার উচ্চারণ জ) একই সময়ে ভাষায় ব্যবহৃত হইতে থাকিল। তখন y ধ্বনিসূচক য-কে ইঅ নামে অভিহিত করা হইতে লাগিল। কিন্তু এই 'ইঅ' ধ্বনি খুব সুস্পষ্ট ছিল না। এই ইঅ-র 'ই' অংশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে শুধু অ ধ্বনিটাই রহিয়া গেল। তখন বর্ণমালা পড়িতে গিয়া দুইটা অ কানে বাজিতে লাগিল। প্রথম,—স্বরমালার অ। দ্বিতীয়,—ব্যঞ্জনমালার য়। নাম তো একই ছিল, তাহার আর পরিবর্তন করা হইল না। শুধু বিশেষণ যোগ করিয়া উহাদের পার্থক্য বুঝানো হইল।

ব্যঞ্জনের য় (যাহা অ নামেই অভিহিত হইতেছিল)-এর নাম হইল অন্তঃস্থ-অ। এবং স্বরান্তর্বর্তী অ-এর নাম হইল স্বরীয় অ বা স্বরে-অ।

এখন য়-এর নাম অন্তঃস্থ-অ না হইয়া স্বরে-অ-র অনুরূপ ব্যঞ্জনের অ বা ব্যঞ্জনে অ হওয়াই তো উচিত ছিল। এ-কথা মানিতেই হইবে যে, স্বরমালার একটি বিশেষ বর্ণের ধ্বনির সহিত সাম্য থাকিবার ফলেই য়-এর নামের পার্শ্বে একটি বিশেষণ বসিয়াছে। তাহা যদি হয় তবে স্বরের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনই তো ওই বিশেষণ প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে ব্যঞ্জনের অ না বলিয়া অন্তঃস্থ-অ বলা হইল কেন?

ইহার উত্তরে প্রথমেই একটি কথা বলা আবশ্যক। স্বরে-অ নামটা প্রথমে দেওয়া হয় নাই। অন্তঃস্থ-অ এই নামটিই আগে দেওয়া হইয়াছে। স্বরে-অ নাম তাহার পরে দেওয়া। কাজেই স্বরে-অ-র অনুরূপ ব্যঞ্জনের অ হওয়া উচিত ছিল একথা বলা চলে না।

এই মন্তব্য যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে আর একটি কথাও মানিতে হয়। স্বরমালার একটি বিশেষ বর্ণের ধ্বনির সহিত সাম্য থাকিবার ফলেই য়-এর নামের পার্শ্বে অন্তঃস্থ এই বিশেষণ বসিয়াছে এবং উহার নামকরণ হইয়াছে অন্তঃস্থ-অ—মতটি সত্য নয়। এখন সেই আলোচনা করা যাক।

সংস্কৃতের য প্রাকৃতে জ-ধ্বনি গ্রহণ করিল। অধিকাংশ প্রাকৃতে য-এর বদলে জ-এর ব্যবহার হইতে লাগিল। কিন্তু মাগধী প্রাকৃতে য ব্যবহৃত হইতে থাকিল। এমন কি জ-এর স্থানেও স্থলবিশেষে য বসিতে লাগিল। মাগধী-প্রাকৃতের য-এর ইঅ বা অ উচ্চারণ ছিল না তাহার প্রমাণ আছে। এই ধ্বনি ছিল কতকটা শ্বাসাশ্রয়ী—অনেকটা ইংরাজী z-এর মত। সুতরাং ধ্বনি যেমনই হউক না কেন, বর্ণমালায় বরাবরই ছিল দেখা যাইতেছে। এবং এই শ্বাসাশ্রয়ী ধ্বনি যে পরে খাঁটি জ ধ্বনি পাইয়াছে, এখনকার উচ্চারণ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

এদিকে শব্দান্তর্গত জ-এর ব্যবহারও লোপ পাইল না। অর্থাৎ মাগধীতে য এবং জ দুই বর্ণ ই প্রায় একরূপ ধ্বনি লইয়া ব্যবহৃত হইতে থাকিল। প্রাচীন বাংলায় মাগধীর এই বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। চর্যাপদে অনেক জ আছে আবার (জ উচ্চারিত) য-ও কয়েকটি আছে। যেমন:

যাই—সংস্কৃত যাতি হইতে। অর্থ যায়।

যাবহু—যাবৎ।

যোজই—যোগান দেয়।

যোইআ—যোগী।

যোগী—যোগী।

চর্যাপদে মাত্র এই কয়টি শব্দ য-আদি। ইহার মধ্যে আবার যোগী শব্দটি তৎসম। তাহা হইলে য-আদি শব্দের সংখ্যা মোটে চারটি দাঁড়ায়। অথচ এই চারটির মধ্যে আবার যাই শব্দের জাই রূপ আছে। তৎসম শব্দটিরও জ-কারাদি রূপান্তর আছে। চর্যাপদে জ-আদি শব্দের সংখ্যা এক শত চৌত্রিশ। ইহার মধ্যে আবার প্রায় পঁয়ষট্টি শব্দের জ য হইতে আসিয়াছে। যেমন—জুবই (যুবতী), জে (যৎ), জোইনি (যোগিনী), জোবন (যৌবন), জাহ (যাও, সংস্কৃত—√যা হইতে), জউনা (যমুনা) ইত্যাদি।

চর্যাপদে দেখিতেছি জ-রূপে উচ্চারিত য-এর ব্যবহার খুব কম। য-এর স্থান অধিকার করিয়াছে জ। কিন্তু জ-এর স্থানে কোথাও য বসিতেছে না।

মাগধীতে য-এর প্রতিপত্তি থাকিলেও চর্যাপদে তাহা কমিল কেন তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

মাগধীতে আদ্য জ স্থানে য বসিত, একথা বররুচি বলিয়াছেন। হেমচন্দ্রও ওই ধরনের মত প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় ওই মত সমর্থন করিয়াছেন।[১]

এতৎ সত্ত্বেও বাংলা ভাষার—মাগধীর সহিত যাহার মাতাপুত্রী সম্বন্ধ নির্দেশ করা চলে, সেই বাংলা ভাষার—আদিতম নিদর্শনে আদ্য য-এর এত দৈন্য কেন?

আসল কথা মাগধীতে যে য-এর ব্যবহার ছিল তাহার উচ্চারণে প্রাচীন সংস্কৃত ইঅ ধ্বনি ছিল না, বরং কতকটা জ-র কাছাকাছি ধ্বনিই ছিল। এমন কি প্রাকৃতের সময়ে সংস্কৃত পাঠকালেও য উত্তর ভারতে জ রূপে উচ্চারিত হইতেছিল। সুনীতিবাবু 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' হইতে তাহার একটি প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পাদাদৌচ পদাদৌচ সংযোগাবগ্রহেষু চ।[২]

আবার বররুচিই মাগধী সম্পর্কে বলিয়াছেন,—'চ বর্গস্য স্পষ্টতা তথোচ্চারণঃ।' এই সকল প্রমাণ হইতেই প্রাচীন বাংলায় আদ্য য-এর দৈন্যের কারণ নির্ণয় করা সহজ হইবে।

মাগধীতে আদ্য জ-এর উচ্চারণে যে বিশিষ্টতা ছিল তাহাকেই স্বতন্ত্রভাবে দেখাইবার জন্য বৈয়াকরণগণ 'য' বর্ণ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। য-বর্ণ যে সেই বিশিষ্ট ধ্বনির উপযুক্ত পরিচায়ক তাহা বলা যায় না। আসলে ওই 'য'টা তখন প্রাকৃত ভাষার বর্ণমালায় অকেজো হইয়া বসিয়াছিল, তাই উহার ঘাড়ে ওই ধ্বনির ভারটা চাপাইয়া দেওয়া হইল মাত্র। কিন্তু আদ্য জ-এর (যাহার স্থানে বসান হইল) ধ্বনির সহিত স্বরান্তর্বর্তী জ-এর ধ্বনির যে পার্থক্য ছিল সে পার্থক্য ধীরে ধীরে লোপ পাইল। উচ্চারণ যতই সমান হইতে লাগিল ততই আদ্য য-এর স্থানে আবার জ বসিতে লাগিল। য-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইল না।

এদিকে তৎসম শব্দে য-এর ব্যবহার তো ছিলই। সংস্কৃতের য-যুক্ত শব্দ প্রাকৃতে প্রবেশকালে য লইয়াই প্রবেশ করিত। পরে সহজ ভাবেই একদিন তাহা জ-এ পরিণত হইয়া যাইত।

মোট কথা এই যে, প্রাকৃতে এক জ ধ্বনি বুঝাইতে জ এবং য এই দুইটি বর্ণই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই কথা মাগধী প্রাকৃত সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া খাটে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, জ ধ্বনি বুঝাইতে য এর ব্যবহার অপভ্রংশের দিকে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনে জ-উচ্চারিত য-বর্ণের প্রয়োগের অল্পতা ওই অবস্থারই পরিণতি সূচনা করে।

১. S. K. Chatterji, Origin and Development of the Bengali Language, pp. 244-248

২. S. K. Chatterji, Origin and Development of the Bengali Language, p. 477.

যখন উচ্চারণে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও দুইটি বর্ণের ব্যবহার প্রচলিত হইল তখন দুইটি বর্ণের দুইটি নাম দেওয়া আবশ্যক হইল।

বর্গান্তর্গত বলিয়া জ এর নাম হইল বর্গীয় জ। সংস্কৃতে য-এর স্থান স্পর্শ ও উষ্ম বর্ণের অঃন্তস্থ বলিয়া উহার অন্তঃস্থ য নাম দেওয়া হইল, অবশ্য মুখে বলিবার সময় উচ্চারণ করা হইল অন্তঃস্থ জ। বস্তুতঃ য-কে অন্তঃস্থ-য বলা হইলেও উচ্চারণে অন্তঃস্থতার কোনো চিহ্নই বিদ্যমান রহিল না।

একই উচ্চারণ লইয়া দুইটি বর্ণের ব্যবহার চলে প্রাকৃত যুগ হইতে। কিন্তু ইহাদের গায়ে বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ এই বিশেষণদ্বয়ের যোগ ঠিক কবে হইতে আরম্ভ হইল তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

এদিকে আর এক বিপদ হইল। প্রাকৃতে স্পর্শবর্ণের লোপাধিক্যের ফলে অনেক স্বরবর্ণ পাশাপাশি বসিয়া উচ্চারণে অসুবিধা ঘটাইতে লাগিল। এই অসুবিধা যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল তখন য-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি রূপে য ও ব (অন্তঃস্থ) ভাষায় পুনঃপ্রবিষ্ট হইল। অন্তঃস্থ ব-এর কথা পরে বলা যাইবে। এখন অন্তঃস্থ য-ই আমাদের আলোচনার বিষয়।

অন্তঃস্থ য্ যখন উচ্চারণে y রূপে শ্রুত হইতে আরম্ভ হয় ওই উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য লিখিত হয় তাহার অনেক পরে। কথার ভাষায় নূতন ধ্বনি যত সহজে প্রবেশ করে লেখার ভাষায় তাহার চিহ্ন তত সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলায় স্টেশন, স্টীমার প্রভৃতি শব্দের বয়স অন্ততঃ এক শতাব্দী হইবে। কিন্তু উহাদের আসল ধ্বনি প্রকাশ করিবার জন্য নূতন চিহ্নের ব্যবহার সবে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাও এখনও সকলে গ্রহণ করেন নাই। আমরা এতদিন ষ্টিমার লিখিয়াও দিব্য স্টীমার উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছি।

আধুনিক আর্য ভাষাসমূহ স্বতন্ত্র ভাষারূপে যখন দেখা দেয় তখন য-শ্রুতির ব্যবহারও শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতে সাধারণতঃ য-শ্রুতি দেখা যায় না। প্রাকৃতের পর এবং আধুনিক ভাষাসমূহের জন্মলাভের পূর্বে কোনো সময় লেখায় য-শ্রুতির ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ওদিকে য ধ্বনি লইয়া এক অন্তঃস্থ য তো পূর্ব হইতেই বর্ণমালায় ছিল। এখন য-শ্রুতির য (যাহার উচ্চারণ y এর অনুরূপ) আসায় একই বর্ণের দুই উচ্চারণ দাঁড়াইল। অর্থাৎ একই য-এর ধ্বনি হইল (১) j এবং (২) y। বর্গীয় জ-এর সহিত বিভেদ বুঝাইবার জন্য য-এর এক নাম তো ছিল অন্তঃস্থ য। আবার অন্তঃস্থ য়-র সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্য উহার আর এক নাম হইল অন্তঃস্থ অ (ইঅ)। অন্তঃস্থ অ (য়) এবং অন্তঃস্থ য—বর্ণমালায় ইহারা অভিন্ন। তাই উহাদের নাম বিশেষণেও অভিন্নতা রাখা হইয়াছে। ওই অন্তঃস্থ বিশেষণ-যুক্ত জ এবং অ অধুনা-প্রচলিত দুইটি ধ্বনির পরিচয় দিতেছে।

এই কারণেই স্বরমালার প্রথম বর্ণের নাম স্বরে-অ হইলেও ব্যঞ্জনমালার এই বর্ণটির নাম ব্যঞ্জনের অ না হইয়া অন্তঃস্থ অ হইয়াছে।

মোট কথা তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে। মাগধী প্রাকৃতে য এবং জ এই দুইটি বর্ণেরই প্রচলন ছিল। কিন্তু রূপের পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের ধ্বনিগত সাম্য ছিল। মাগধীর এই বৈশিষ্ট্য বাংলাতেও বর্তাইয়াছে। প্রাকৃত অবস্থা হইতে খাঁটি বাংলায় আসিতে আসিতে এই দুই বর্ণের ধ্বনিতে আর কিছুমাত্র পার্থক্য রহিল না। যখন উচ্চারণে পার্থক্য রহিল না তখন উভয়ের নামে বিশেষণ যোগ করিয়া উহাদের চিহ্নিত করা আবশ্যক হইল। অপভ্রংশের শেষ অবস্থা হইতে বাংলার সূচনাকালের মধ্যে কোনো এক সময় এই দুই বর্ণ এইভাবে বিশেষিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

জ যখন বর্গীয় জ এবং য যখন অন্তঃস্থ-য নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে তখন য-শ্রুতির য লেখার মধ্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। য-শ্রুতির য (যাহার উচ্চারণ y) এবং পূর্ববর্তী য (যাহার উচ্চারণ j) দুইয়েরই আকৃতি একরূপ। বস্তুতঃ উহারা একই বর্ণ, কিন্তু ধ্বনি ভিন্ন। তাই নামের অনেকখানি অর্থাৎ অন্তঃস্থ এই বিশেষণ অংশ রাখিয়া কেবল ধ্বনি পরিচায়ক অংশটুকু বদলাইয়া দেওয়া হইল। একটি য-এর নাম ছিল অন্তঃস্থ-য অন্য য-এর নাম হইল অন্তঃস্থ ইঅ তাহা হইতে অন্তঃস্থ অ।

এদিকে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ হঠাৎ অন্তঃস্থ-অ নাম লওয়ায় স্বরের অ বর্ণকে স্বরে-অ নামে চিহ্নিত করিয়া ব্যঞ্জনের অ-র সহিত তাহার পার্থক্য নির্দেশ করা হইল।

আ-র নূতন নামকরণ হইল স্বরে-আ। স্বরে-অ-র সাদৃশ্যে স্বরে আ হওয়াই সম্ভব। পরে হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ, হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ এবং পূর্বে স্বরে-অ আছে। এ অবস্থায় আ নিঃসঙ্গ থাকিলে বর্ণমালা পাঠকালে ছন্দ বজায় থাকে না। সেটাও স্বরে-আ নামকরণের কারণ হইতে পারে।

বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ

তৎসম শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। তৎসম শব্দের মানে কি জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে বলিবেন, 'তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃত, 'সম' অর্থাৎ সমান। যাহা সংস্কৃতের সমান তাহাই তৎসম। ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয়, ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয় তাহাই তৎসম শব্দ। তখনই প্রশ্ন জাগে 'অবিকৃত' এই কথার অর্থ কি? উত্তর পাই—কেন? যে সকল শব্দের রূপ অব্যাহত থাকে তাহাদেরই অবিকৃত বলিব। যেমন—সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, ঊর্ধ্ব, তৃণ, পুষ্প ইত্যাদি।

তৎসম কথাটির যে ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হইল তাহা বাংলা ভাষার বৈয়াকরণদের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়। প্রাকৃত বৈয়াকরণগণই তৎসম শব্দকে উল্লিখিত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতরূপে ব্যবহার করা হইত, তাঁহারা সেই সকল শব্দকে তৎসম আখ্যা দিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকারদের অনুসরণ করিয়া বাংলা ভাষার বৈয়াকরণগণ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত-আকৃতিবিশিষ্ট শব্দকে তৎসম নামে অভিহিত করিতেছেন।

প্রাকৃতের সাদৃশ্যে এই নামকরণ সংগত হইয়াছে কিনা তাহা আলোচনার বিষয়। বাহ্যতঃ এই নামকরণের সংগতি আছে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্মতর বিচারে সন্দেহ জাগে। প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ 'সম' বলিয়াছেন কোন্ অর্থে? রূপের দিক দিয়া সমান? না, ধ্বনির দিক দিয়া সমান? বাংলায় সংস্কৃতের রূপটাকেই গণনা করা হয়। প্রাকৃতে কি হইত? শুধু রূপ, অথবা শুধু ধ্বনি অথবা রূপ এবং ধ্বনি উভয়েরই সমতা বিচার করা হইত? আমাদের মনে হয় কেবল ধ্বনিটাকে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। রূপ তাঁহাদের গণনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমাদের ধারণা সত্য প্রমাণিত হইলে বলিতে হইবে বাংলা ভাষায় যে শব্দগুলির তৎসম নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহারা আর যাহাই হউক তৎসম নয়।

প্রাকৃত ভাষায় তৎসম শব্দে যে ধ্বনিসাম্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এই উক্তির বিচার করা যাক।

প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণের মত এই যে প্রকৃতি শব্দ হইতে প্রাকৃত শব্দ উৎপন্ন। যাহা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত তাহাই প্রাকৃত। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি সংস্কৃত, অতএব সংস্কৃত হইতে যাহা উৎপন্ন তাহাই প্রাকৃত।[১]

প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ যাহাই বলুন ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতগণ বলিতেছেন বৈদিক সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি। বৈদিক সংস্কৃত বলিতে প্রাচীন ইন্দো-আর্য যুগের সমস্ত ভাষা এবং উপভাষা বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের মতে লৌকিক সংস্কৃত ঠিক কথার ভাষা ছিল না। বৈদিক ভাষা যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম

১. প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্, তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্।—হেমচন্দ্র।

প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র আর্যাবর্তে ছড়াইয়া পড়িল তখন স্বভাবতই বিভিন্ন প্রদেশে তাহার বিভিন্ন রূপ দেখা দিল। বিভিন্ন প্রাকৃতের সূচনা হয় এইভাবে। বৈদিক ভাষার এই সকল রূপকে সংস্কৃত করিয়া বৈদিক সাহিত্যের ভাষার আধারের উপর লৌকিক সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইল। অতএব দেখা যাইতেছে বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃত পরস্পর পৃথক্ হইলেও উভয়ের মধ্যে মিল অনেক। সেই কারণেই সংস্কৃত শব্দটা ব্যাপক অর্থে বৈদিক এবং লৌকিক দুই ভাষার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতেছে।

এখন পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। সংস্কৃত যে ভাষার প্রকৃতি সে ভাষার ধ্বনির সহিত সংস্কৃত ধ্বনিসমূহের মিল থাকা স্বাভাবিক। বস্তুতঃ তাহা ছিলও। প্রাকৃত ব্যাকরণ নামে যে সকল প্রাচীন ব্যাকরণ আছে, অর্থাৎ সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যে সকল প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাহার কোনোটিই মৌলিক ব্যাকরণ নয়। প্রাকৃত ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া ধরিয়া তাহার ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, ধাতু, বাক্য, রীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এ সব ব্যাকরণে আলোচনা করা হয় নাই। পক্ষান্তরে কেবল সংস্কৃত ভাষার সহিত বিভিন্ন প্রাকৃতের তুলনা করা হইয়াছে। তুলনাও খুব বিস্তারিত নয়। সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতের যে যে স্থলে পার্থক্য কেবল সেই সেই স্থানগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাকি সব সংস্কৃতের মত বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহা হইতে অনুমান করা অসংগত হইবে না যে, প্রাকৃত ভাষায় যে সকল তৎসম শব্দের ব্যবহার হইত তাহারা ধ্বনি ও রূপের দিক দিয়া সংস্কৃতের সমান ছিল। কোথাও কিছু ব্যতিক্রম থাকিলে তাহার কথা কোনো-না-কোনো স্থানে বলা হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার মধ্যেও উচ্চারণে মোটামুটি মিল ছিল। অমিলও ছিল। প্রাকৃত ব্যাকরণে সেই অমিলগুলির উল্লেখ আছে। এই অমিলগুলি প্রাকৃত ভাষাসমূহের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাকৃত ভাষায় একটিমাত্র অঘোষ উষ্ম বর্ণ আছে।[২] তাহা দন্ত্য স। কিন্তু একমাত্র মাগধী প্রাকৃতে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাগধীতে দন্ত্য স ও মূর্ধন্য ষ নাই, আছে শুধু তালব্য শ।[৩] এরূপ অবস্থায় একই শব্দকে কোনো প্রাকৃতে তৎসম এবং কোথাও বা খাঁটি প্রাকৃত (তদ্ভব) বলা যাইতে পারে। 'কুসুম' শব্দ সংস্কৃত। প্রাকৃত ভাষার (মাগধী ব্যতীত) ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে কুসুম শব্দের উচ্চারণ করা কোনো দিক দিয়া কঠিন ছিল না। সুতরাং প্রাকৃত ভাষায় কুসুম শব্দে সংস্কৃত বানানই রক্ষিত আছে। উহার বানান

২. বাংলা বর্ণমালায় চারিটি উষ্ম বর্ণ—শ, ষ, স, হ। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি অঘোষ, চতুর্থটি ঘোষবৎ।

৩. ষসোঃ শঃ ॥—বররুচি, প্রাকৃতপ্রকাশ ১১।৩।

পরিবর্তন করিবার কোনো প্রয়োজনই অনুভূত হয় নাই। সে হিসাবে কুসুম শব্দ (মাগধী ব্যতীত) সকল প্রাকৃতেই তৎসম শব্দরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

মাগধী প্রাকৃতে দন্ত্য স বা মূর্ধন্য ষ নাই। কাজেই ওই প্রাকৃতে কুসুম থাকিতে পারে না। সেখানে ইহার বানান হইবে কুশুম। অন্যান্য প্রাকৃতে যাহা তৎসম নামে অভিহিত তাহাই মাগধীর বেলা খাঁটি প্রাকৃতের পর্যায়ে নামিয়া আসিল। আবার মাগধীতে 'শিলা' শব্দ তৎসম হইলেও অন্যান্য প্রাকৃতে 'সিলা' হইয়া যাইবে। তখন উহা আর তৎসম থাকিবে না।

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ, বিশেষতঃ শব্দের বানান, যে ধ্বনির উপরেই প্রতিষ্ঠিত তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। খাঁটি সংস্কৃত শব্দের প্রতিও কিছুমাত্র করুণা দেখানো হয় নাই, যেখানেই ধ্বনিতে পরিবর্তন আসিয়াছে সেখানেই বানান বদলাইয়াছে।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, জীবন্ত ভাষার ধ্বনি যত শীঘ্র বদলায় বানান তত সত্বর পরিবর্তিত হয় না। প্রাকৃত গ্রন্থে—কি·সাহিত্যে, কি ব্যাকরণে—যে বানান দেখি তাহাও নিশ্চয় লিখিত হইবার বহু পূর্বেই উচ্চারণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। হয়তো মাগধী যখন 'কুশুম' বলিতে আরম্ভ করে তাহার পরও দুই তিন শতাব্দী পর্যন্ত 'কুসুম'ই লিখিয়া আসিতেছিল। মহারাষ্ট্রী 'সিলা' উচ্চারণ করিয়াও হয়তো বহুদিন ধরিয়া 'শিলা'ই লিখিয়াছে।

তাহা ছাড়াও আর একটা কথা এই যে, সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ যখন সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিলেন, তখন তাঁহাদের হাতের কাছে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ত ছিল না। ভাষার ব্যাকরণ নির্মাণের জন্য লিখিত উপকরণ প্রচুর ছিল বলিয়া তাঁহারা কর্ণ অপেক্ষা চক্ষুর সাহায্যই বেশী লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ (ইহাদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃতের ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন এবং সকলেই সংস্কৃত ভাষাতে পণ্ডিত ছিলেন) প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে গিয়া ধ্বনির উপরেই জোর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষার যে খ্যাতি প্রাকৃতের সে খ্যাতি থাকার কথা নয়। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। কাজেই প্রাকৃত ভাষায় প্রচুর সাহিত্য রচিত হইতে পারে নাই। হইলেও গ্রাম্য সমাজে যে সাহিত্য চলিত পণ্ডিত সমাজে তাহার স্থান ছিল না। এই সকল কারণে বৈয়াকরণ-গণকে মৌখিক ভাষার উপরেই বেশীর ভাগ নির্ভর করিতে হইয়াছে।

উদাহরণ দ্বারা বক্তব্যটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি।

প্রাকৃত ভাষায় যে সকল বাক্যে ক্রিয়াপদের বাড়াবাড়ি নাই সেই সমস্ত বাক্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখিতে পাইব যে,সংস্কৃতের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রধানতঃ ধ্বনিগত। ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মটি জানা থাকিলে প্রাকৃত বাক্যকে সংস্কৃতে পরিবর্তিত করা মোটেই দুরূহ নয়।

অহিণব-মহু-লোলুবো তুমং তহ
পরিচুম্বিঅ চূঅ-মঞ্জরিং।
কমলবসঈমেত্ত নিব্বু ও মহুঅর
বিস্থমরিদোসি ণং কহং॥

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত এই শ্লোকের সংস্কৃত রূপান্তর এইরূপ :

অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং তথা
পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকর
বিস্মৃতোঽসি এনাং কথম্॥

প্রাকৃত ব্যাকরণের ধাতুরূপ শব্দরূপ কৃৎতদ্ধিত কিছু না জানিয়াও শুধু ধ্বনিতত্ত্বের মূল নিয়মগুলি জানিলেই এই সংস্কৃত ভাষান্তর করা সম্ভব। বস্তুতঃ উল্লিখিত প্রাকৃত কবিতার শব্দগুলিকে শুধু ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে বদলাইয়া দেওয়াতেই উহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ওই কবিতাটি বাংলায় রূপান্তরিত করিতে গেলে কেমন হইবে তাহা দেখা যাক।

"অভিনব-মধু-লোলুপ মধুকর, তুমি চূতমঞ্জরীকে ওইভাবে চুম্বন করিয়া কমল-বসতিমাত্র-নির্বৃত হইয়া ইহাকে কিরূপে বিস্মৃত হইলে ?"

বাংলা হিসাবে ইহা অশুদ্ধ নয়। অর্থও বিকৃত হয় নাই। কেবল একটি শব্দ একটু কঠিন হইয়াছে। নির্বৃত শব্দটি 'সুখী' অর্থে বাংলায় সচরাচর চলে না। সংস্কৃত 'অসি', 'এনাম্', এবং 'কথম্' এই তিনটি শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দের পরিবর্তন হয় নাই।

এই বাংলা অনুবাদটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটি জিনিস সর্বাগ্রে মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। ইহার সহিত প্রাকৃতের মিল যতখানি সংস্কৃতের মিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। অবশ্য বাংলাদেশের উচ্চারণ অনুসারে এই অংশটি পাঠ করিয়া গেলে অ-বাঙালীর কানে ইহার সহিত সংস্কৃতের মিল ততটা ধরা পড়িবে না। কারণ ধ্বনির দিক দিয়া বাংলার সহিত সংস্কৃতের মিল অধিক নয়। কিন্তু বানানের দিক দিয়া এই মিল বড় বেশী। এই অংশটিতে সবসুদ্ধ ২১টি শব্দ আছে। ইহাদের মধ্যে ১৫টির রূপ সংস্কৃত। কিন্তু ধ্বনি হিসাবে বিচার করিলে একটিমাত্র সংস্কৃত পাই। তাহাও সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। সেটি হইতেছে কমল। অথচ গাণিতিক হিসাব দেখাইয়া পণ্ডিতেরা বাংলা সাধুভাষায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন শতকরা ৪৪টা।[৪]

বাংলা ভাষায় বহু খ্যাতনামা লেখকের লেখায় তথাকথিত বিশুদ্ধ শব্দের

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

সংখ্যা শতকরা ৪৪ অপেক্ষাও অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্যতঃ কয়টি খাঁটি তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের রচিত কয়েকটি পদ। এগুলি প্রায় হাজার বছরের পুরাতন। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে একখানি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেন, সেই পুঁথিতেই এই পদগুলি ছিল। পদগুলির সংখ্যা ৪৭। পুঁথিখানি ১৩২৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই চর্যাপদগুলিই বর্তমানে বাংলা ভাষার ইতিহাস নির্মাণে প্রধান ভিত্তিস্তম্ভের কাজ করিতেছে। তাহার পরই আসিয়া পড়িতে হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক গ্রন্থ এই সময়কার লেখা। পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এই গ্রন্থখানির আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক। বাংলা ভাষার ইতিহাসে প্রাচীন এবং আধুনিক কালের মধ্যে এই গ্রন্থটিই একমাত্র যোগসূত্র।

চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় শব্দের বানানে অসংগতি আছে। একই শব্দের একাধিক বানান অনেক স্থলে দৃষ্টিগোচর হয়। বাংলা সাহিত্যে এই বানানবিভ্রাট তৎপরবর্তী যুগেও কম ছিল না। চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় তথাকথিত তৎসম শব্দ খুবই অল্প। সংস্কৃত শব্দের প্রতি বঙ্গভাষার লেখকেরা তখনও আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। সংস্কৃত শব্দই যদি লিখিতে হয়, তাহার জন্য দেশভাষার আশ্রয় লইতে হইবে কেন? সেজন্য তো দেবভাষাই আছেন।

প্রথম যুগে যাঁহারা দেশভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত। সংস্কৃত ছাড়িয়া যখন দেশভাষা ধরেন তখন দেশের জনসাধারণের প্রতি ছিল তাঁহাদের দৃষ্টি, পণ্ডিত সমাজের প্রতি নহে। যে ভাষাটা সত্য সত্যই তাহাদের সেই ভাষাতেই তাঁহারা লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই লিখিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস যে সংস্কৃত জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রত্যেক খণ্ডের প্রথমে এবং বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যেও কোনো কোনো পদের গোড়ায় একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহার বাংলা পদে বানানে যথেষ্ট গোলমাল থাকিলেও এই সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে কদাচিৎ অসংগতি দেখা যায়।

বিদ্যাপতির নামও এই সম্পর্কে স্মরণ করা যায়। সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাপতির বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁহার গ্রন্থও অনেক আছে। তবু দেশভাষা মৈথিলীতে তিনি যে পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি সংস্কৃতের প্রতি কিছুমাত্র আনুগত্য দেখান নাই।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' আর একটি দৃষ্টান্ত। কবি যে সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন তাহা তাঁহার রচনার বহুস্থল হইতে প্রমাণিত হয়, তবু তাঁহার বাংলা বানানে অধিকাংশ সংস্কৃত শব্দ বিশুদ্ধ থাকিতে পারে নাই।

বস্তুতঃ বাংলা ভাষার প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, যেমন রচনাপদ্ধতিতে তেমনি বানান-পদ্ধতিতেও সংস্কৃতের প্রভাব অল্প ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই এই প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

ইহার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা বানানে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব ছিল একথা সত্য, কিন্তু বানানকে যে উচ্চারণের অনুগত করিবার চেষ্টা ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল[৫] হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাই।—

চণ্ডীমঙ্গলের বানান	আধুনিক বানান	পৃষ্ঠা
হ্রিদয়ে	হৃদয়ে	১৮১
আমিস্ত	আমিষ	”
বেওস্যা	বেশ্যা	২৭৪
কাজ্যের	কার্য্যের	২৯০
শ্রিতি	স্মৃতি	২৯১
ব্রথা	বৃথা	৩০৭
জর্ম	জন্ম	”
ক্রিপামই	কৃপাময়ী	”
জতন	যতন	৩০৯
অন্যাসন	অন্বেষণ	৩৩২
জোজন	যোজন	”
রিসি	ঋষি	৩৯৪
সুজ্য	সূর্য্য	”
ঝড়বিষ্টী	ঝড়বৃষ্টি	৩৮২

ধ্বনিগত বানান অনেক স্থলে ছিল সত্য কিন্তু সর্বত্র ছিল না। বহু সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত রূপই রক্ষিত হইয়াছিল, ধ্বনি অনুসারে বানান বদলানো হয় নাই।

প্রথম যুগে বানানবিভ্রাটের এই যে সূত্রপাত হইল, ভাষার ক্ষেত্রে ইহাই ছিল স্বাভাবিক। দেশভাষার বানানের অদ্বৈতবাদ লইয়া তখন কোনো ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সংস্কৃতে যদি কেহ মাস লিখিতে গিয়া মাশ লিখিয়া ফেলে, তাহা হইলে বৈয়াকরণগণের ভর্ৎসনা শানিত তরবারির মত চতুর্দিক হইতে অপরাধীর শির লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইয়া উঠে। দেবভাষা দেবীর মতই সতর্কভাবে পূজা পাইবার যোগ্য। তাঁহার পূজার অঙ্গহানি হইলেই প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা। তাঁহাকে স্পর্শ করিবার অধিকার পাইবার পূর্বে স্নান করিয়া শুচিতা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু মানুষী মায়ের কাছে সন্তানের

৫. চণ্ডীমঙ্গল, ধনপতি উপাখ্যান, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬।

অবাধ অধিকার। সে ধুলা কাদা গায়ে মাখিয়া যদি মায়ের কোলে চড়িয়া বসে তবু কেহ হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে না।

কিন্তু পাণ্ডিত্য যত বাড়িয়া চলিল, বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে ভাষার দিকে যতই দৃষ্টিপাত করা যাইতে লাগিল, ততই সংস্কৃত শব্দের রূপ নির্দিষ্ট হইতে থাকিল। উচ্চারণে যাহা উচ্ছুগ্‌গি ছিল বানানে তাহাও উৎসর্গ হইতে আরম্ভ করিল, খেনেকে-এর স্থানে ক্ষণেকে লিখিয়া অশুদ্ধি-সংশোধন চলিতে থাকিল।

এইরূপ সংস্কৃতনিষ্ঠার আতিশয্য আরম্ভ হইল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যভাষার চর্চা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করিয়াই ফেলিলেন।—

"বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাশুর ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই।...তাঁরা সংস্কৃত-ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটি পদার্থ খাড়া করিলেন যাহাতে কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।[৬]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যেমন ভাষার সম্বন্ধে তেমনি শব্দের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অন্যত্র এই প্রসঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন।—

"যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজন মতো সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।"[৭]

একদিন বঙ্কিমচন্দ্রও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন।—

"..তখন পুস্তক প্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে বাংলা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই। সে বাংলা লিখিতেই পারে না। সুতরাং ..বাংলায় রচনা ফোঁটাকাটা অনুস্বারবাদী-দিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাংলা ভাষার গৌরব। যেমন গ্রাম্য স্ত্রীলোক মনে করে যে শোভা বাড়ুক না-বাড়ুক ওজনে ভারী সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল ; এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না-হউক. দুর্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল!"[৮]

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শব্দতত্ত্ব।

৭. " "

৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষা, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫।

বঙ্কিমের সময় হইতেই এই ভাবের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার সময়েই সমালোচকদের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছিল দেখিতে পাই। এই দুই দলের মধ্যে প্রাচীনপন্থী যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা কিরূপ মত পোষণ করিতেন বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।—

"এক্ষণে বাংলা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী। যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য।"[৯]

এইভাবে বাংলা ভাষার দরবারে একটা প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হইল। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকগণ এই বিতর্কের অগ্রণী ছিলেন।

বিতর্কের একটি প্রধান বিষয় ছিল বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, খাঁটি বাংলা তেল শব্দটি যখন সুপ্রচলিত ও সুপরিচিত তখন তৈল শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক। ইহা হইল চরমপন্থীর কথা।

প্রাচীনপন্থী যাঁহারা তাঁহারা তো বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন আর কোনো শব্দকেই সাহিত্যে স্থান দিতে নারাজ।

কিন্তু মধ্যপন্থীর দল মধ্যপন্থার আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা বলিলেন,— "তেল শব্দ অশ্লীলও নহে অশ্রাব্যও নহে; ভদ্র-সমাজে উহার ব্যবহারে কেহ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না, সুতরাং আমরা সাহিত্যের ভাষাতে তেলই ব্যবহার করিব। তবে যদি কেহ স্থলবিশেষে লালিত্যের বা সৌষ্ঠবের অনুরোধে 'তৈল' শব্দেরই ব্যবহার করিয়া ফেলেন তাহাতেও তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইব না।"[১০]

ত্রিবেদী মহাশয়ের এই মত যে সর্বাধিক সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই খানেই একটি প্রশ্ন জাগে। সে প্রশ্ন ইতিপূর্বে উত্থাপিত হইয়াছে কি না জানি না।

'তেল' শব্দটি হইল তদ্ভব। ইহার প্রাকৃত রূপ 'তেল্ল'। তৈল হইতে তেল শব্দের যে উদ্ভব হইল তাহার পশ্চাতে ক্রমপরিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস আছে। সে হিসাবে তেল এবং তৈল এই দুইটি পৃথক্ শব্দ বলিয়া বিবেচিত হয়, একই শব্দের দুইটি রূপান্তর বলিয়া মনে করা হয় না। ইহা যুক্তিসংগত কথা।

কিন্তু যে সকল নিত্যব্যবহৃত শব্দ সংস্কৃত শব্দের মৌখিক রূপান্তরমাত্র, তাহাদের কি অবস্থা?

৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষা, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫।

১০. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শব্দকথা।

শ্রী ছিরি, বিশ্রী বিচ্ছিরি, প্রসাদ পেসাদ, বিড়াল বেড়াল, স্ফূর্তি ফূর্তি, ইন্দ্র ইন্দির প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় উদাহরণগুলির কি গতি হইবে? এমন অসংখ্য শব্দের উল্লেখ করা যায় যেগুলি কার্যতঃ অর্ধতৎসম কিন্তু বানানে তৎসম। নক্ষত্র নোক্‌খোত্র, ক্ষমা খমা, আত্মা আঁত্তা, আত্মীয় আঁত্তিয়ো, ব্রাহ্মণ ব্রাম্‌হন, আহ্নিক আন্‌হিক্‌, মধ্যাহ্ন মোদ্ধান্‌নো, জ্ঞান গ্যাঁন, বিজ্ঞ বিগ্‌গোঁ, প্রতিজ্ঞা প্রোতিগ্‌গাঁ, শ্রবণ স্রোবন ইত্যাদি।

প্রাকৃত ভাষার আদর্শ অনুসরণ করিলে নোক্‌খোত্রো, খমা, আঁত্তা, ব্রাম্‌হোন, আন্‌হিক্‌, প্রভৃতি ধ্বনিগত বানান ভাষায় গৃহীত হইত এবং এগুলি স্বতন্ত্র শব্দরূপে পরিগণিত হইয়া যাইত। যেমন একই সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইতেছে তেমনি, উচ্চারণ অনুসরণ করিলে, একই সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিত।

ইহাতে ভাল হইত কি মন্দ হইত তাহা বিচার করিবার জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা নয়। সমস্যাটার উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার ভাষায় খুব বেশী দেখা যায় না। তাহার মূল কারণ এই যে, সংস্কৃত সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারটা বড় প্রবল। সংস্কৃতের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বর্তমানে আমরা যতই চাঞ্চল্য প্রদর্শন করি না কেন, আমাদের অন্তরের মধ্যে সংস্কৃতানুগত্য বদ্ধমূল রহিয়াছে। চলিত ভাষাতেও আমরা অর্ধতৎসম শব্দ প্রয়োগ করিতে অত্যন্ত ভয় পাই। আমরা মুখে বিচ্ছিরি বলি, কিন্তু কলমে বিশ্রী না লিখিয়া পারি না। মুখে পিদিম বলিলেও প্রদীপ লিখিয়া মুখ রক্ষা করি। মুখে যতই বলি না কেন, কাগজে কলমে ক্ষতি ভিন্ন খেতি বা খোতি লিখিতে পারি না। অতি চলিত ভাষাতেও শিগগির লিখিবার সাহস হয় না, যথারীতি শীঘ্র লিখি। ইহাতে লাভটা কি হইতেছে?

লাভ কিছু আছে কি না তাহা বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু ক্ষতি যে বহুল তাহা প্রত্যক্ষগোচর।

অর্ধতৎসম শব্দও শব্দভাণ্ডারের একটা অঙ্গ তো। ধ্বন্যাত্মক বানানের চলন না হয় না হউক, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যে সকল শব্দের জন্ম হইয়াছে, ধ্বন্যাত্মক বানানের নাম করিয়া সেগুলিকে ভাষার শব্দাবলী হইতে বাদ দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? তৃষ্ণার মূল্য আছে 'তেষ্টা'র মূল্য নাই? ক্ষুধাকে রক্ষা করিব, 'খিদে'কে অগ্রাহ্য করিব? মহার্ঘ থাকিবে 'মাগ্‌গি' থাকিবে না? শ্যামলার রূপান্তর বলিয়া 'শামলা'কে ত্যাগ করিতে হইবে?'

সংস্কৃতের প্রতি অত্যাসক্তির ফলে শুধু যে একশ্রেণীর শব্দকে লিখিত ভাষায় স্থান দিতেছি না, তাহা নয়; ইহার ফলে আমরা অনেক খাঁটি বাংলা, এমন কি বিদেশী, শব্দেরও আকৃতির পরিবর্তন করিয়া সংস্কৃতকল্প করিতেছি। উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি পরিষ্কার হইবে।

পূজারী, পূজারিণী, পূরবী, পেজী, পুরণো, চূণ, রাণী, দখিণা (দক্ষিণ দিক্ হইতে আগত) সোণা, কর্ণেল, গবর্ণমেণ্ট, তক্তাপোষ, যূঁই, কূয়া, সূতা. তূলি।

একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে যে সকল দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ ঊ এবং মূর্ধন্য ণ আছে সেগুলির কোনো সার্থকতা নাই।

পূজা সংস্কৃত শব্দ, কিন্তু 'পূজারী' বাংলা। তবে প-এ ঊ এবং র-এ ঈ দিব কেন? ইহা সংস্কৃত ইন্‌ভাগান্ত শব্দ নয়। বাংলায় -নী প্রত্যয় দিয়া অনেক সময় স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। -নি বলাই উচিত, তবে স্ত্রী-প্রত্যয় বলিয়া সুবিধার জন্য -নীই ধরা গেল। অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ-ঈ-র ব্যবহার যখন করিতেছি, তখনও সংস্কৃতের অনুসরণেই করিতেছি—একথা মনে রাখা উচিত।

যাহাই হউক, তেলিনী মালিনীর মত পূজারির স্ত্রীলিঙ্গে পূজারিনী করিলাম। কিন্তু পূজারিণী কেন করিব? এখানে মূর্ধন্য ণ দিতে যাইব কেন? সংস্কৃতের ষত্ববিধান ণত্ববিধান মতে বাংলা ভাষা তো চলে না।

তক্তাপোষে আপোষে মূর্ধন্য ষ দিই কেন? পুষ্ ধাতুটা মনের উপর চাপিয়া আছে বলিয়া। অথচ ফারসী ভাষার অনুসারে প্রথমটার বানান পোশ এবং দ্বিতীয়টার বানান পস। সংস্কৃতের এমনি প্রভাব যে সে আপসকে আপোষ করিয়া ছাড়িয়াছে।

চূর্ণতে দীর্ঘ ঊ ও মূর্ধন্য ণ আছে। তাই বলিয়া 'চুন'কে 'চূণ' বানান করিব কেন? কূপ-এ সূত্র-এ দীর্ঘ ঊ আছে, তাই বলিয়া কুয়া বা সুতায় দীর্ঘ ঊ দিব কি জন্য?

অধিক কি, আমরা এমন সমস্ত বাংলা শব্দ তৈয়ার করিয়াছি, যাহা দেখিলে অসংস্কৃত বলিয়া মনেই হইবে না। যেমন নির্ভুল অকাট্য। আমরা রহস্য করিয়া পাঁটাকে পণ্টক বলি। পেটের অসুখ হইলে বলি পৈটিক অবস্থা খারাপ। ব্যাকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকুক, কিন্তু সংস্কৃতের মত দেখাইবার জন্য আমরা রবির বিশেষণে রৈবিক পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি। আসল কথা সংস্কৃত রূপটাকে আমরা প্রাণ ধরিয়া ছাড়িতে পারি না। মুখে যাহা বলি এবং কানে যাহা শুনি লিখিবার বেলায় যথাসাধ্য সেটা প.রহার করার চেষ্টা করি।

গদ্য ভাষার জন্মকালে যে সংস্কৃত প্রভাব ছিল ভাষার ক্ষেত্রে যদিও তাহা আজ অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে, শব্দাবলীর দিক্ দিয়া সে প্রভাব কিছুমাত্র কমে নাই। বরং সেদিক্ দিয়া আমাদের পণ্ডিতী মনোবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে তৎসম শব্দের যে পরিমাণ ব্যবহার হইতেছে, খাঁটি বাংলার (অর্ধতৎসমও যাহার অন্তর্ভুক্ত) সে পরিমাণ ব্যবহার হইতেছে না। বস্তুতঃ আমরা যে সমস্ত তৎসম শব্দের ব্যবহার করি তাহার অধিকাংশই তৎসম নয়। আমরা জোর করিয়া তাহাদের তৎসম বলি এবং জোর করিয়া তাহাদের সংস্কৃত বানান দিই।

বাংলা কারক-বিভক্তি

"বাংলা ব্যাকরণের কোনো কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই-একটা বিষয়ে বোঝাপড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলা ভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনো মতেই ত্যাগ করা চলে না, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মানুষকে তাহার বেশভূষা বাদ দিয়া আমরা ভদ্রসমাজে দেখিতে ইচ্ছা করি না। বেশভূষা না হইলে তাহার কাজই চলে না, সে নিষ্ফল হয়। সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহার আবরণ, তাহার লজ্জারক্ষা, তাহার দৈন্যগোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের বাহ্য উপায়।...মানুষের বস্ত্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান যেমন এক নহে বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে। বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদ ঘোরী বাবর হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে; তেমনি আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধমাত্র থাকে। এরূপ বেনামিতে বিদ্যালাভ ভাল কি মন্দ তাহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলিতে সাহস করি না, কিন্তু ইহা যে বেনামি তাহাতে সন্দেহ নাই।" বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গে বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন আজও তাহার পুনরাবৃত্তির যৌক্তিকতা কমে নাই। খাঁটি বাংলা ভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকার প্রকার আছে। আমাদের তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলার আকৃতি প্রকৃতির সেই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় ভাল করিয়া পাই না। সেই পুরাতন ব্যাকরণেরই দুই চারিটি ছত্র এদিক ওদিক করিয়া মলাটে আধুনিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বলিয়া ছাপাইয়া দিতেছি। তাহাই পড়িতেছি তাহাই পড়াইতেছি এবং বাংলার ব্যাকরণ লিখিত হইল না বলিয়া পুরুষানুক্রমে আক্ষেপ করিয়া যাইতেছি।

কারক-বিভক্তির সমস্যাটা বাংলা ব্যাকরণের একটি প্রধান সমস্যা। সমস্যাটা কোথায় তাহা পরিস্ফুট করিবার জন্য কারকবিভক্তি বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন উদ্ধৃত করিব। প্রশ্নগুলি বাজার-প্রচলিত প্রবেশিকা-পাঠ্য ব্যাকরণের অনুশীলনী-র আদর্শ প্রশ্নপত্রসমূহ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

(ক) কর্মকারকে কখন সপ্তমী এবং অধিকরণ কারকে কখন পঞ্চমী বিভক্তি হয়, তাহা দৃষ্টান্ত সহ উল্লেখ কর।

(খ) কর্তৃকারকে কোন্ কোন্ স্থলে ষষ্ঠী এবং কোন্ কোন্ স্থলে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় ?

(গ) প্রথমা বিভক্তি কোন্ কোন্ কারকে হইতে পারে ? কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া এবং করণকারকে প্রথমা হইতে পারে কি না ?

(ঘ) করণ কারকে সপ্তমী ও পঞ্চমীর প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর।

কারক বিভক্তি সম্পর্কে দুই-একটি ছাড়া প্রায় সকল ব্যাকরণের বক্তব্য এক। তাহা এই।—

কারক সংস্কৃতবৎ কর্তৃ হইতে অধিকরণ পর্যন্ত সাতটি। সম্বন্ধ ক্রিয়ার সহিত অন্বিত নয় বলিয়া উহার নাম পদ, কারক নয়। এক একটি কারকে এক একটি বিভক্তি হয়। যেমন, কর্তৃকারকে প্রথমা, কর্মকারকে দ্বিতীয়া, করণকারকে তৃতীয়া, এইরূপ।

দেখা যাইতেছে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুসারে বাংলার বিভক্তিগুলিকে প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্যন্ত সাতটি সংখ্যাচিহ্নিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এ বিভাগ কোনো বাংলা ব্যাকরণের নূতন উদ্ভাবন নহে, সংস্কৃতের অনুসরণে এই শ্রেণীবিভাগ বঙ্গীয় ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারা শতাব্দীকাল যাবৎ করিয়া আসিতেছেন। আজও করিয়া চলিয়াছেন। তবে সমস্যাটা কোথায় ?

সেটা এই। ছয়টা কারক অনেকে মানেন। রামমোহন ছয়টা কারক মানেন নাই। পণ্ডিতবর্গের মধ্যে রামমোহনের মতানুবর্তী অনেকে আছেন। কিন্তু যে সকল বৈয়াকরণের বই বিদ্যালয়ের জন্য রচিত হয় সেগুলি গতানুগতিক নিয়মের নেমীরেখা অতিক্রম করে না। সকলেই কর্তৃ কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান সম্বন্ধ (পদ) ও অধিকরণের সঙ্গে যথাক্রমে প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী—এই বিভক্তিগুলি জুড়িয়া দিয়াছেন। এই বিভক্তিগুলির স্থিতাবস্থা রক্ষণেই বিপত্তির উদ্ভব।

যদি বলি অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি হয়, এবং 'এ' হইল সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন, তাহা হইলে ততটা গোলমাল হইবার কথা নয়। কিন্তু সূত্রটাকে আর একটু টানিয়া লইয়া যদি এমন কথা বলি যে, 'হাতে মাথা কাটি' এই বাক্যে 'হাতে' শব্দের কারক হইল করণ এবং বিভক্তি হইল সপ্তমী, তাহা হইলে সেই টানটা সহিবে কি ? সহা উচিত কি ?

> কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী **তরুবরে** ?
> জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**।
> মনের অগম্য সেই **মহাদেবে** হেরি।
> মস্তক করিয়া ভেদ উঠিয়াছে জ্যোতি
> কপালের **শশধরে** করিয়া মলিন।

গতানুগতিকতার পন্থী ব্যাকরণকারগণ বলিবেন 'তরুবরে, জনে জনে, মহাদেবে, শশধরে' পদগুলির কারক কর্ম, বিভক্তি সপ্তমী।

বর্তমান প্রবন্ধের সূচনাতে যে প্রশ্নগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বাংলা ব্যাকরণ-লেখকদের কারক-বিভক্তি সম্পৃক্ত ধারণার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। (গ) চিহ্নিত প্রশ্নটির দিকে লক্ষ্য করুন। প্রশ্নটি একটি ব্যাকরণের অনুশীলনী হইতে লওয়া হইয়াছে। ইহার অভীষ্ট উত্তরটি কি? উত্তর ওই গ্রন্থেই দেওয়া আছে। সেটি এই।—

(i) কর্তৃকারকে প্রথমা।—কর্তৃবাচ্যের কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। 'অ' বিভক্তির সর্বদাই লোপ হয়। যথা,—'পাখী' সব করে রব 'রাতি' পোহাইল।

(ii) কর্মকারকে প্রথমা।—কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—আমা কর্তৃক 'চন্দ্র' দৃষ্ট হইতেছে।

(iii) করণকারকে প্রথমা।—ক্রীড়নার্থ ক্রিয়ার করণে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—তাহারা তাস খেলিতেছে (অর্থাৎ তাস দ্বারা খেলিতেছে)। 'করিয়া' যোগে করণের অর্থ প্রকাশ পায় এবং সে স্থলে করণের বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—শত্রুরা জোর করিয়া ধান কাটিয়া নিয়াছে।

"বিভক্তির লোপ" ইহাকেই প্রথমা বিভক্তির লক্ষণ ধরিয়া গ্রন্থকার 'তাস' এবং 'জোর' শব্দকে প্রথমা বিভক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

প্রশ্নের দ্বিতীয়ার্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া হয় কি না। তাহার উত্তরও গ্রন্থমধ্যেই আছে।

কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কখনো কখনো কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—কর্মবাচ্যে, 'তোমাকে' একথা শুনিতে হইবে। ভাববাচ্যে, 'আমাকে' যাইতে হইবে। কর্তায় যে দ্বিতীয়া হয় একথা স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল। যুক্তি-ধারা এইরূপ।—কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন 'কে'। অতএব 'কে'-যুক্ত সকল শব্দই দ্বিতীয়াশ্রিত।

(ঘ) প্রশ্নে করণে সপ্তমী ও পঞ্চমীর দৃষ্টান্ত চাওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তিনি 'রোগে কাতর' 'দুঃখে ব্যাকুল' প্রভৃতি বাক্যাংশের 'রোগে' 'দুঃখে' এই শব্দগুলিকে করণে সপ্তমীর দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে 'আমা হতে হেন কর্ম হবে না সাধন'-এর 'আমা হতে' করণে পঞ্চমী। এখানেও যুক্তি একই।

অধিকরণে সপ্তমী হয়, অপাদানে পঞ্চমী হয়। সপ্তমীর বিভক্তিচিহ্ন 'এ', পঞ্চমীর চিহ্ন 'হতে'। রোগের দ্বারা অর্থ হইলেও 'রোগে'কে সপ্তমী এবং আমার দ্বারা অর্থ হওয়া সত্ত্বেও 'আমা হতে'কে পঞ্চমী বলা হইল।

বাংলা ব্যাকরণে কারক বিভক্তির এই ধরনের যে সম্পর্ক কল্পনা করা হয় তাহা কি যুক্তিসংগত?

কারক বিভক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক কল্পনার মূলে আছে সংস্কৃত ব্যাকরণের অহেতুক আনুগত্য। অতএব সংস্কৃত ব্যাকরণের দিকেই প্রথমে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি কথাটির নিরুক্তি কি? "অর্থস্য বিভঞ্জনাদ্ বিভক্তিঃ" অর্থের বিভাগ করে যে সে-ই বিভক্তি। আরও পরিস্ফুট করিয়া কেহ কেহ বলেন,—"বিভজ্যন্তে পৃথক্ ক্রিয়ন্তে কর্তৃকর্মাদয়ো যয়া সা বিভক্তিঃ"। অর্থাৎ কর্তা কর্ম ইত্যাদি যাহার দ্বারা বিভাজিত হয় তাহাই বিভক্তি। প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া বিভক্তি তাহাকে 'পদ'ত্ব দেয়। 'পদ'ত্ব দেওয়ার অর্থই হইল শব্দগুলিকে কর্তা কর্ম করণ প্রভৃতি শ্রেণীতে চিহ্নিত করা।

বিভক্তির কথা বলা হইল। সেই সঙ্গে কারকের গোড়ার কথাও বলা হইল।

সপ্ত বিভক্তির সহিত ছয় কারক ও সম্বন্ধপদের সম্পর্ক ধরিয়াই সংস্কৃত ব্যাকরণে নিয়ম করা হইল 'কর্তায় প্রথমা' 'কর্মে দ্বিতীয়া' ইত্যাদি। 'কর্তায় প্রথমা' বা 'কর্মে দ্বিতীয়া' বলিয়া দিয়াই সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজ শেষ হইল না। ব্যাকরণকার জানাইয়া দিলেন কর্তৃত্ব ছাড়াও নানা অর্থে প্রথমা বিভক্তির, কর্মত্ব ছাড়াও নানা অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তির, করণত্ব ছাড়াও নানা অর্থে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এইরূপ চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী বিভক্তিও কেবল সম্প্রদান অপাদান সম্বন্ধ অধিকরণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে না।

কোন্ কোন্ অর্থে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ হয় তাহার একটা আভাস দিতেছি।—

প্রথমা। প্রাতিপদিকার্থ, লিঙ্গ, পরিমাণ, বচন ও সম্বোধন।

দ্বিতীয়া। কর্ম, অনীপ্সিত, অন্তরা ও বহির্যোগ।

তৃতীয়া। কর্তা, করণ, হেতু, অপ্রধান, সহার্থ, সম্বন্ধ ও অবয়ব।

চতুর্থী। সম্প্রদান ও তাদর্থ্য।

পঞ্চমী। অপাদান ও হেতু।

ষষ্ঠী। স্ব-স্বামী, কার্য-কারণ, জাতি-ব্যক্তি, গুণ-গুণী, সামান্য-বিশেষ, গম্য-গমক, অবয়ব-অবয়বী, আধার-আধেয় ইত্যাদি সম্বন্ধ।

সপ্তমী। অধিকরণ, ভাব, হেতু, নির্ধার।

সংস্কৃতে এক একটি বিভক্তির দ্বারা একাধিক অর্থ দ্যোতিত হইতেছে। বাংলাতেও তাহাই হয়। আবার সংস্কৃতে একাধিক অর্থে এক বিভক্তির ব্যবহারও বিরল নয়। বাংলার অবস্থাও অনুরূপ।

সংস্কৃতে বিভক্তির সংখ্যা অনেক। ইহাদের আকৃতি দেখিলেই ইহাদের পরিচয় বুঝিতে পারি। সংখ্যা বেশী বলিয়াই আকৃতির বৈশিষ্ট্যের আবশ্যকতাও বেশী হইয়াছে।

সংস্কৃতে শব্দবিভক্তির একুশটি স্বতন্ত্র রূপ। সম্বোধনকে ধরিলে চব্বিশ। এই

বিভক্তিগুলির একটি একাক্ষর পারিভাষিক নাম 'সুপ্'।[১] 'সুপ্' বলিলেই বুঝিতে হইবে প্রথমার একবচন হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমীর বহুবচন পর্যন্ত একুশটি বিভক্তি চিহ্ন।

বিভক্তির নাম	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সু	ঔ	জস্
দ্বিতীয়া	অম্	ঔ	শস্
তৃতীয়া	টা	ভ্যাম্	ভিস্
চতুর্থী	ঙে	ভ্যাম্	ভ্যস্
পঞ্চমী	ঙসি	ভ্যাম্	ভ্যস্
ষষ্ঠী	ঙস্	ওস্	আম্
সপ্তমী	ঙি	ওস্	সুপ্

ইহার মধ্যে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের রূপ এক। তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমীর দ্বিবচনেও ভেদ নাই। চতুর্থী পঞ্চমীর বহুবচন অভিন্ন। ষষ্ঠী সপ্তমীর দ্বিবচনও একরূপ। বাকী বারটির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। মোট চিহ্নসংখ্যা একুশ হইলেও আকৃতির পার্থক্য বিচারে চিহ্নের প্রকার হইল ষোল।

বৈয়াকরণ যখন প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের কথা বলিতে চান তখন তিনি এত কথা না বলিয়া একটিমাত্র অক্ষর উচ্চারণ করেন 'জস্'। চতুষ্পাঠীর ছাত্রকে অধ্যাপক যখন জিজ্ঞাসা করেন 'দেব' শব্দের উত্তর 'জস্' করিলে কি হয়, তখন সে বুঝিয়া লয় কোন্ পদটি অধ্যাপকের অভিপ্রেত। ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় 'দেবাঃ'। এই 'জস্' যোগ করিলে মুনি হয় 'মুনয়ঃ', গুণিন্ হয় 'গুণিনঃ', লতা হয় 'লতাঃ', নদী হয় 'নদ্যঃ'। সময় এবং বাক্য সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বৈয়াকরণগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন কর্মসৌকর্যের দিক্ দিয়া তাহা অতুলনীয়। সংস্কৃতে বিভক্তির অনেক প্রকার, অনেক সংখ্যা। সেখানে ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বাংলায় বিভক্তি কয়টা? শূন্য, এ (রূপান্তর য়, য়ে), কে, র (রূপান্তর এর), তে, রা, দের। কখনো কখনো দুই চিহ্নের সংযোগ ঘটে। যেমন,—এ + তে = এতে, ঘরেতে পরবাসী; র + এ = রে, সবারে করি আহ্বান। দের + কে = দেরকে, ওদের ডাক, ওদেরকে ডাক।

এই বিভক্তিগুলি ছাড়া অনেকগুলি অনুসর্গ আছে, তাহারাও অনেক পরিমাণে বিভক্তির কাজ করিয়া যায়।

বাংলা বিভক্তি ও সংস্কৃত বিভক্তির মধ্যে পার্থক্য বিচার করিলে দেখিতে পাইব, সংস্কৃতের বিভক্তি চিহ্নটা আসলে বিভক্তিই নয়, অন্ততঃ সর্বত্র নয়। সংস্কৃতের বিভক্তিগুলা এক একটা পারিভাষিক অভিধা। বাংলার সহিত উহার পার্থক্য

১. শব্দ-বিভক্তির মত ক্রিয়া-বিভক্তিমালারও একটি নাম আছে তিঙ্। 'সুবন্ত' = শব্দরূপ প্রকরণ, 'তিঙন্ত' = ধাতুরূপ প্রকরণ।

দুস্তর। 'হাতে কাজ কর, মুখে হরি বল।' এই দুই বাক্যের 'হাতে' এবং 'মুখে' শব্দে 'এ' বিভক্তি বসিয়াছে। বিভক্তিটি শব্দের সঙ্গে দিব্য গায়ে গায়ে মিশিয়া গিয়াছে।—হাত+এ=হাতে, মুখ+এ=মুখে। 'এ' বিভক্তি অনেক কারকেই বসে।

এইখানে আর একটি কথা মনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। শব্দে বিভক্তি থাকিলেই যে তাহা কারক সম্বন্ধ নির্দেশ করিবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। সংস্কৃতেও কারক ভিন্ন স্থলে নানা অর্থে বিভক্তির ব্যবহার হয়। উন-বারণ-প্রয়োজনার্থ শব্দযোগে তৃতীয়া হয়, হেত্বর্থে পঞ্চমী হয়, ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া হয়, অপবর্গে তৃতীয়া হয়। এগুলি অকারক বিভক্তির দৃষ্টান্ত। 'খোকন বলে পাখীটি কোন্ বিলে চরে।' এই বাক্যে 'খোকন' শব্দে শূন্য বিভক্তি বলিতে পারি ; কিন্তু যদি কোন্ কারক জিজ্ঞাসা করা হয় কি উত্তর দিব? বলিব, ইহা কারকের স্থল নহে। তবে বিভক্তি যখন হইয়াছে (শূন্য বিভক্তিও বিভক্তি) তখন একটা অর্থ অবশ্যই আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে[১] বলিতে পারি, 'বলে' এই অব্যয়যোগে শূন্য বিভক্তি। বলিতে পারি অভিধেয়ার্থে শূন্য বিভক্তি। হয়তো আরও ভাল ভাল উত্তর চিন্তা করিয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর প্রশ্নপত্রে সে প্রশ্ন দিবার কোনো সার্থকতা নাই। **'মায়ে ঝিয়ে'** ঝগড়া, **'সাবধানে'** পথ চলবে, তিন **'দশে'** তিরিশ, তোমার **'খুরে খুরে'** দণ্ডবৎ, যা শত্রু **'পরে পরে'**। প্রভৃতি বাক্যে বাক্যাংশে স্থূলাক্ষর শব্দগুলির মধ্যে কারক খুঁজিবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম তাহাতেই ফিরিয়া আসি। বলিতেছিলাম বাংলায় শব্দের সঙ্গে যখন বিভক্তি যুক্ত হয় তখন সে স্বরূপেই বর্তমান থাকে। পরিবর্তন হইলেও বেশী হয় না, পূর্বরূপ চেনা যায়। কিন্তু সংস্কৃতে বিভক্তির রূপ এক এক সময় এমনভাবে বদলাইয়া যায় যে মূলের সহিত তাহার সম্পর্কই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের তত্ত্ব যাহার জানা নাই সে যখন শোনে যে 'নর' শব্দের উত্তর 'টা' করিলে পদ হয় 'নরেণ' তখন তাহাকে হতবাক্ হইতে হয়। আবার একই বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। 'টা' যোগে 'নর' শব্দের রূপ দেখিলাম 'নরেণ' হইয়াছে অর্থাৎ 'টা' বিভক্তি রূপ বদলাইয়া হইল 'এন'। এই 'টা'ই কোথাও হয় 'না'। যেমন,—মুনিনা, সাধুনা, বারিণা, উদ্না, অক্ষ্ণা। কোথাও হয় 'আ'। যেমন,—সখ্যা, দাত্রা, গবা, শ্রীমতা। কোথাও 'য়া'। যেমন,—শ্রিয়া, সুধিয়া। কোথাও 'বা'। যেমন,—প্রতিভুবা। সংস্কৃত বিভক্তি কেবল যে নিজের রূপ বদলায় তাহা নহে, যে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহাকেও সর্বদা স্বরূপে থাকিতে দেয় না। যেমন,—প্রত্যচ্+টা=প্রতীচা, পথিন্+টা=পথা, বিদ্বস্+টা=বিদুষা, ইদম্+টা=অনেন এনেন (পুং) অনয়া এনয়া (স্ত্রী) কিম্+টা=কেন কয়া ইত্যাদি।

১. ইতি অব্যয়যোগে প্রথমার মত।

আমরা দেখিলাম সংস্কৃতে এক 'টা' বিভক্তি 'এন আ য়া বা' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। বাংলায় হইলে এই 'এন আ য়া বা' রূপগুলিকেই বিভক্তি বলিতাম, যেমন, 'এ তে র'কে বলি। সংস্কৃতে 'এন আ য়া বা' বিভক্তি নয়, বিভক্তি হইল 'টা'—এই সংক্ষিপ্ত পরিভাষা—যাহার অর্থ তৃতীয়ার একবচন।

বাংলায় '**কড়িতে** বাঘের দুধ মিলে,' 'গাই-**বলদে** চষে,' 'সফল **চেষ্টায়** আর নিষ্ফল **প্রয়াসে**,' '**ঘিয়ে**-ভাজা তপ্ত লুচি' এই বাক্য-বাক্যাংশগুলিতে 'কড়িতে বলদে চেষ্টায় প্রয়াসে ঘিয়ে' শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি। ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারা বলিবেন, এই সকল শব্দে করণে সপ্তমী হইয়াছে।

বিপত্তি এইখানে। 'এ' যে অধিকরণেরই সম্পত্তি সে কথা কে বলিল? 'এ' যেমন অধিকরণের তেমনি করণের এবং কর্তারও বটে। অপাদানে সম্প্রদানেও তাহার ব্যবহার হয়।

বিভক্তির সংখ্যাবাচক নামগুলা (প্রথমা-দ্বিতীয়াদি) বাংলা ব্যাকরণের পক্ষে নিরর্থক। শুধু নিরর্থক নয়, এই নামগুলার ফলে অনেক অনর্থের উদ্ভব হইতেছে। নিবার্য বিপদকে অনিবার্য করিয়া তুলিব কেন? বিভক্তি বলিতে 'এ য় তে কে র' প্রভৃতি চিহ্ন কয়টিকে বুঝিব। বস্তুতঃ এইগুলিই বিভক্তি, সংস্কৃতে 'স্ ঔ জস্' 'অম্ ঔ শস্' প্রভৃতি যেমন। সংস্কৃতে 'স্ ঔ জস্' এই তিনটি বিভক্তির একটি সাধারণ পরিচায়ক নাম দেওয়া হইয়াছে 'প্রথমা'। 'অম্ ঔ শস্' দ্বিতীয়া। এইরূপ সপ্তমী পর্যন্ত নামকরণ। সংস্কৃতে অনেক বিভক্তি। বচন তিনটা বলিয়াও বিভক্তির সংখ্যা বেশী। বিভক্তির সংখ্যাধিক্যের জন্য এই রকম গাণিতিক শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল। কম্‌পিউটারের যুগে বসিয়াও তাঁহাদের কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। প্রাচীন বৈয়াকরণগণ প্রথমাদি সাত শ্রেণীর বিভাগ করিয়া হিসাবের সুবিধা করিয়াছিলেন। আজ সংস্কৃতের অনুসরণে বাংলায় বিভক্তির সাতটা শ্রেণী নির্দেশ করিতে গিয়া দেখা যাইতেছে সকল শ্রেণীর স্বতন্ত্র বিভক্তিচিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তবু কেন সাতটা শ্রেণী রাখিতে হইবে?

বাংলা কারক সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা ব্যাকরণে কারকের সংখ্যা কমাইবার পরামর্শও অনেকে দিয়াছেন।

১৩০৮ সালে 'বাংলা ব্যাকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"বাংলায় যাহা কিছু সংস্কৃতের নিয়ম মানে না, তাহাকে একদল লোক কুলত্যাগী বলিয়া ত্যাগ করিতে চান। এবং সংস্কৃতের নিয়মকে বাংলায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের চেষ্টা।…বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান।"

সংস্কৃতে ছয়টি কারক আছে বলিয়াই বাংলায় ছয়টি কারক রাখিতে হইবে ইহা কোনো কাজের কথা নহে। কোন্ কোন্ কারকের ব্যবহার বাংলায় আছে তাহা আগে দেখিতে হইবে। যেগুলি বাংলায় চলে সেগুলি বাংলায় থাকুক। যেগুলি নাই সেগুলি বর্জন করা হউক। রবীন্দ্রনাথ এই রক্ষণশীলতার অসারতা প্রদর্শন করিয়া লিখিলেন।—

"সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদান বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে। যদি 'ধোপাকে কাপড় দিলাম' কর্ম এবং 'গরিবকে কাপড় দিলাম' সম্প্রদান হয়, তবে একবচনে 'বালক' দ্বিবচনে 'বালকেরা' বহুবচনেও 'বালকেরা' না হইবে কেন। তবে বাংলা ক্রিয়াপদেই বা একবচন দ্বিবচন বহুবচন ছাড়া যায় কি জন্য। তবে ছেলেদের মুখস্থ করাইতে হয় একবচন 'হইল' দ্বিবচন 'হইল,' বহুবচন 'হইল'; একবচন 'দিয়াছে', দ্বিবচন 'দিয়াছে', বহুবচন 'দিয়াছে' ইত্যাদি। 'তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদান কারকের কোঠায় পড়ে, তবে 'তাহাকে মারিলাম' সন্তাড়ন কারক; 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন কারক; 'সন্দেশ খাইলাম' সম্ভোজন কারক; 'মাথা নাড়িলাম' সঞ্চালন কারক এবং এক বাংলা কর্মকারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে।"

সম্প্রদান কারকের স্বতন্ত্র সত্তা রামমোহন রায় বহুপূর্বেই অস্বীকার করিয়াছিলেন। অস্বীকৃতির কারণ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন।—

"সংস্কৃতে দান ক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান কহেন। এবং তৎপ্রয়োগে বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে, এ কারণ তাহার পৃথক প্রকরণ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাতে রূপান্তরাভাব।"

বাংলা ভাষায় সম্প্রদানের উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য সংস্কৃতের মত স্বতন্ত্র রূপ নাই বলিয়া রামমোহন স্বীয় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে' সম্প্রদান কারক বলিয়া ধরেন নাই।

সম্প্রদানকে স্বতন্ত্র কারকরূপে স্বীকার করা যে অনাবশ্যক প্রাকৃত ভাষার বৈয়াকরণগণও তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই। বাংলা ভাষাতেও সম্প্রদান কারক নাই। "কিন্তু মুগ্ধবোধ পেটেণ্টই হউক আর হাইলি পেটেণ্টই হউক উভয় প্রকার ব্যাকরণেই সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে।"[১] এ উক্তি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। সম্প্রদানের যে বাংলা ব্যাকরণে স্থান নাই এ বিষয়ে তাঁহার অভিমতও সুস্পষ্ট।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩১২ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বাংলা কারকের প্রসঙ্গে সংস্কৃতের সহিত বাংলার তুলনা করিয়া এক বিশ্লেষাত্মক মূল্যবান

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০১।

প্রবন্ধ লিখেন। সে প্রবন্ধেরও শেষ কথা, বাংলায় সম্প্রদান কারক তুলিয়া দেওয়া হউক। ত্রিবেদীমহাশয়ের যুক্তিগুলি যত্নসহকারে অনুধাবন করা উচিত। বাংলা ভাষার, বিশেষতঃ বাংলা ব্যাকরণের, অধ্যয়ন অধ্যাপনা যাঁহাদের বৃত্তি এবং ব্যবসায় তাঁহাদের অবহিত হইতে হইবে। একটা সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে, এই সময় সকলেরই সহযোগিতা আবশ্যক। বাংলা শিক্ষক মহাশয়দেরই সংস্কারের কাজে অগ্রণী হইতে হইবে। তাঁহাদের উদাসীন থাকা উচিত হইবে না। ঔদাসীন্য অপেক্ষা বিরোধিতাও ভাল। দুই পক্ষের দ্বন্দ্বে সত্যের স্বরূপটা সর্বাংশে দৃষ্টিগোচর হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে কর্মে দ্বিতীয়া এবং সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি নির্দিষ্ট।

"এই নির্দিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়াই, কর্ম হইতে ভিন্ন একটা সম্প্রদান কারক বৈয়াকরণেরা খাড়া করিয়াছেন। নতুবা কেবল দানক্রিয়ার পাত্র বলিয়াই উহাকে একটা স্বতন্ত্র কারক করা হয় নাই। তাহা হইলে রবীন্দ্রবাবুর ভাষায় ভোজন ক্রিয়ার পাত্রকে 'সম্ভোজন কারক', তাড়ন ক্রিয়ার পাত্রকে 'সন্তাড়ন কারক', এইরূপ ক্রিয়ামাত্রেরই জন্য এক একটা বিশেষ কারক স্থির করিতে হইত। ফলে ক্রিয়া যাহাকে আক্রমণ করিয়া রহে তাহার নাম কর্ম; উহার নির্দিষ্ট বিভক্তি দ্বিতীয়া; ক্রিয়ামাত্রেরই পক্ষে এই বিধি। কেবল দানক্রিয়ার বেলায় ভিন্ন বিভক্তি চলিত থাকায় উহার জন্য একটা স্বতন্ত্র কারক করা হইয়াছে। নতুবা দানক্রিয়া পরম পুণ্য হইলেও বৈয়াকরণের নিকট উহাকে অন্য সকল ক্রিয়া হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাঙ্গলায় যখন দানক্রিয়ার পাত্রের জন্য কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই তখন উহাকে অন্যান্য ক্রিয়ার সমতুল্য মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সেই জন্য যে ব্যক্তিকে দানক্রিয়া সবেগে আক্রমণ করিয়াছে তাহাকে দানক্রিয়ার কর্ম বলিলে এমন কি ক্ষতি হইবে?...পুনশ্চ দেখ। ভৃত্যায় ক্রুধ্যতি, শত্রবে দ্রুহ্যতি, এ সকল স্থলে সংস্কৃত-ব্যাকরণে ভৃত্যকে ও শত্রুকে সম্প্রদানের কোঠায় ফেলিয়াছেন ও তাঁহাদের জন্য পৃথক্ বিধি করিয়াছেন, 'ক্রোধ-দ্রোহের্ষ্যাসূয়ানাং তদুদ্দেশ্যঃ সম্প্রদানম্'। যিনি দানের পাত্র বলিয়া সম্প্রদান তিনি সৌভাগ্যশালী জীব। কিন্তু এই হতভাগ্য ক্রোধপাত্র দ্রোহপাত্র ব্যক্তিরা সম্প্রদান শ্রেণীতে পড়িলেন কিরূপে? তাঁহারা দৈবক্রমে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য হেতু দেখি না। এইরূপ 'মোদকং শিশবে রোচতে' 'তত্তদ্ ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ দর্শয়ন্' ইত্যাদি স্থলেও কেবল চতুর্থী বিভক্তির খাতিরে শিশুর ও পত্নীর সম্প্রদান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ক্রোধের পাত্র দ্রোহের পাত্র প্রভৃতিও যদি বিভক্তির খাতিরে সম্প্রদানের কোঠায় স্থান পায় তবে বাঙ্গালায় দানের পাত্রকে কর্মসংজ্ঞা দিয়া বিভক্তির খাতিরে কর্মের কোঠায় ফেলিলে এমন কি অপরাধ হইবে?"

অতঃপর সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে বহু দৃষ্টান্ত তুলিয়া রামেন্দ্রসুন্দর দেখাইয়াছেন যে বিভক্তির খাতিরে করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি সকল কারকই কর্মসংজ্ঞা পাইতে পারে। এ অবস্থায় বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকে কর্মসংজ্ঞা দেওয়া অসঙ্গত নয়। অবশেষে বলিয়াছেন,—

"ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা এই তর্কে নীরব হইবেন কি না জানি না। কিন্তু আমরা কেবল এক দানক্রিয়ার জন্য বাঙ্গালায় একটা পৃথক্ কারক রাখিতে রাজি নই।"

রামমোহন হরপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথ যাহা রাখিতে রাজি হন নাই তাহাই এতদিন চলিয়া আসিতেছে। যুক্তি অপেক্ষা পূর্বসংস্কারের প্রভাব যে কত বেশী প্রবল ইহাতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে শুধু সম্প্রদান কারকটিই তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা নয় আরও কয়েকটি কারককে বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছিলেন তিনটার বেশী কারক রাখিবার দরকার নাই।

"কর্তা কর্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক যাহার বিভক্তিচিহ্ন এ এবং তে"—এই তিনটা কারকেই বাংলা ভাষার কাজ চলিয়া যাইবে।

কারকের সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব আজও শোনা যায়। কিন্তু এ প্রস্তাব উচ্চতর পণ্ডিত মহলের শব্দতাত্ত্বিক আলোচনার সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেদিন যেমন ছিল এখনও তেমন আছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নামে নবীন প্রাচীন যত বই মুদ্রিত আছে, কোথাও কারকের সংখ্যা কমানো হইয়াছে বলিয়া জানি না। যাঁহারা কমাইবার যুক্তি মানেন তাঁহারাও নিজের বইয়ে কমাইতে সাহসী হন না। স্বয়ং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে'[১] সকল কারকই রাখিয়াছেন। অনেকটা যেন অনিচ্ছা-সত্ত্বেই রাখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের কারক অধ্যায়ের সূচনায় এই ভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে,—

"বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সহিত নামপদের সম্বন্ধ বা অন্বয়কে ব্যাকরণে কারক বলা হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাঙ্গালা ব্যাকরণে ছয় প্রকার কারক স্বীকার করার রীতি চলিয়া আসিতেছে।" এবং গ্রন্থকার সেই রীতি স্বীকার করিয়াই স্বীয় গ্রন্থে ছয় প্রকার কারকের বিবরণ দিয়াছেন। "ছয় প্রকার কারক স্বীকার করার রীতি চলিয়া আসিতেছে" এই বাক্যাংশের তাৎপর্য লক্ষণীয়। লেখক যেন বলিতে চান, রীতিটা চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তিনি ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তিনি নিজে ছয়প্রকার কারক স্বীকার করেন না। যদি সত্যই স্বীকার না করেন তাহা হইলে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। তিনি বলিলে

১. নবীন সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৭১, মার্চ ১৯৬৫।

শুনিবার লোকের অভাব হইবে না। তিনি সাহস দিলে অন্যে ভয় ত্যাগ করিতে পারিত। রামমোহনের কাল হইতে যাহা গবেষণার বিষয় হইয়া ছিল আজ তাহাকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নামাইয়া আনিবার পক্ষে সময় অনুকূল। বাংলা ব্যাকরণের বিধানের যে সংস্কার এতদিন অসম্ভব মনে হইত আজ তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করি। কিন্তু একজনকে অগ্রণী হইয়া পথ দেখাইতে হইবে।

তর্ক উঠিবে বই কি! তর্কের দুইটি প্রধান কারণ। এক, কারক সংখ্যা আদৌ কমাইব কেন? তাহার উত্তর এতক্ষণ ধরিয়া শোনা গিয়াছে। দুই, কমাইলে কাহাকে কাহাকে ছাড়িব? প্রশ্নটা অসমীচীন নয়। কারক শব্দটি কৃ ধাতু হইতে আসিয়াছে। কৃ ধাতুর অর্থ করা। সুতরাং কারক শব্দের মৌলিক অর্থ হইল ক্রিয়া-সম্পাদক।

কর্তা কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান এবং অধিকরণ ক্রিয়া-সম্পাদন ব্যাপারে ইহারা সকলেই অংশিদার। অংশ কাহারও অধিক কাহারও অল্প। কাহারও কাহারও অংশ আবার এতই অল্প যে তাহাদের মালিকানা আছে কি নাই তাহা লইয়া বিবাদ বাধিতে পারে, বাধিয়াছেও।

এই ব্যাপারে ইংরাজী ব্যাকরণ কি আমাদের কোনো সাহায্য করিতে পারে?

বিগত দুই শত বৎসর ধরিয়া ইংরাজী ভাষায় সহিত আমাদের যোগ বেশ ঘনিষ্ঠ। স্বভাবতঃই আমাদের ভাষার উপরেও তাহার প্রভাব কম নয়। ইংরাজী ভাষার শুধু শব্দোপকরণ নয় উহার অনেক হাবভাবও আমাদের ভাষায় আসিয়া গিয়াছে। অনেক জিনিস আমাদের অজ্ঞাতসারে আসিয়াছে, অনেক জিনিস আমরা জানিয়া শুনিয়া লইয়াছি এবং লইতেছি। কারক সংখ্যা কমাইবার প্রয়োজনীয়তা যাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন, ইংরাজী ব্যাকরণই তাঁহাদের সেই অনুভাবনার আনুকূল্য করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ইংরাজীর case বাংলায় কারক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে দুইটির সংজ্ঞা অভিন্ন নয়। বাংলা অর্থাৎ সংস্কৃতের কারক ক্রিয়ার সহিত অন্বিত। ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্। কিন্তু ইংরাজীর case-এর সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য নয়, কেবল বিশেষ্যের অবস্থাটি বুঝাইবার জন্যই তাহার নিয়োগ। তাই ইংরাজীতে সম্বন্ধ কারক। সংস্কৃতে, সুতরাং বাংলায়, পদ। 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' বাক্য নয়। এখানে ক্রিয়াপদ নাই, কাজেই বাংলা ও সংস্কৃত মতে ঈশ্বরের পদে কারকের অস্তিত্ব নাই। কোনো ক্রিয়ার সম্পাদনে ইহা কোনো অংশ গ্রহণ করিতেছে না। যদি বলি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তাহা হইলেও 'ঈশ্বরের' শব্দে কারক হইবে না। কারণ, 'হউক' ক্রিয়ার সহিত 'ইচ্ছা'র সম্পর্ক থাকিলেও ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নাই। God's will এই দুইটি শব্দ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও ইংরাজী ভাষায় God's পদ possessive case হইবে। অর্থ এক রাখিয়া রূপ

বদলাইয়া দিন, God's will কে the will of God-এ রূপান্তরিত করুন, অমনি case বদলাইয়া যাইবে। 'God's' possessive case ; কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যাংশে 'God' objectjve case, governed by the preposition 'of'। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে ইংরাজীর যে possessive case, সেও একটু ফাঁক পাইলেই কর্মকারকের গর্ভে প্রবেশ করে। ইংরাজীর প্রধান দুইটি কারক 'কর্তৃ' ও 'কর্ম'। আর তৃতীয়টি হইল সম্বন্ধ কারক, সংস্কৃত মতে সেটি কারকের কোঠাতেই পড়ে না।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃকারক ও কর্মকারক রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ইংরাজীতে ওই দুইটি কারকেই কাজ চলিয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহা দেখিয়াই চাহিয়াছিলেন। এবং তৃতীয় একটি কারকের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যাহার নাম দেন নাই, কিন্তু বোঝা যায় ওই প্রস্তাবিত কারকটির দ্বারা অন্যান্য কারকগুলির কাজ চালাইয়া লইবার অভিপ্রায় ছিল। তৃতীয় কারকের নাম না দিলেও পরিচয় দিয়াছিলেন সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি প্রস্তাবিত কারকের লক্ষণ বলিয়াছিলেন "যাহার বিভক্তচিহ্ন এ এবং তে। কাজ চালাইবার জন্য এই তৃতীয় কারকের একটা নাম দেওয়া যাক্ 'তদন্য' কারক। 'তদন্য' কি? না, কর্তৃ ও কর্ম হইতে স্বতন্ত্র আর একটা কিছু। 'তদন্য' কারক অন্য কারকগুলির কাজ চালাইবে।

প্রতিপক্ষ চুপ করিয়া থাকিবেন না। তাঁহারা বলিবেন,—কর্তার কাজ কর্তা করিবে, কর্মের কাজ কর্ম করিবে ইহাতে কে আপত্তি করিতেছে? কিন্তু করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ এই চারিটি কারকের কাজ 'তদন্য' একলা সামলাইবে কি করিয়া? 'জলে কুমির আছে' 'জলে ঘরবাড়ি ভাসাইয়া লইয়া গেল'— এখানে এক 'জলে' করণ, আর এক 'জলে' অধিকরণ। দুইটির স্বাতন্ত্র্য একটি দিয়া বোঝানো সহজ হইবে কি?

কারক তো শুধু বিভক্তি যোগে নয়, অনুসর্গ যোগেও কারক হয়। 'বন থেকে বেরোল টিয়ে', 'তোমার কাছে আরাম চেয়ে'—'বন থেকে' 'তোমার কাছে' কি কারক হইবে? অপাদান হইবারই কথা। 'তদন্য' বলিলে এই কারকের বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশে বাধা হইবে। ইংরাজীর নিদর্শন এখানে খাটিবে কি? ইংরাজীর এক objective case এত ব্যাপক যে একাধারে করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ সব কয়টিকে আপনার কুক্ষিগত করিতে পারে। ইংরাজী case অর্থের তেমন ধার ধারে না। তাহার কাছে to me, by me, from me, in me, বিবিধ preposition যুক্ত সব me-ই objective case। আবার সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম রূপে বসিলে বিনা preposition-এও objective case হইবে। আবার দ্বিকর্মক ক্রিয়ার গৌণকর্মও হইতে পারে।

ল্যাটিনে ছয়টি কারক আছে,—কর্তা, সম্বোধন, কর্ম, সম্বন্ধ, সম্প্রদান ও

অপাদান। লক্ষ্য করিবার বিষয় ল্যাটিনে সম্বন্ধ ও সম্বোধনও কারক। কিন্তু অধিকরণ নামে কোনো কারক নাই। অধিকরণ সেখানে অপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

ইংরাজীতে সম্বোধনকে ধরিয়া তিনটি কারক। ল্যাটিনে যাহার সংখ্যা ছয় ছিল, তাহার কাজ দিব্য তিনে চলিয়া যাইতেছে। সংস্কৃতের কারকসংখ্যাকে কমাইলে বাংলায় কাজের সুবিধা যদি হয় তো তাহাকে কমাইতে দ্বিধা কেন?

দ্বিধার এক কারণ পূর্বে বলিয়াছি। বাংলার কারকবিভাগ অর্থগর্ভ, ইংরাজীর কারক শব্দের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। ইংরাজী ভাষার ব্যাকরণ সুদীর্ঘ অনুশীলন এবং আলোচনার ফলে পাকা হইয়া গিয়াছে, বাংলার ব্যাকরণ পাকা হয় নাই। তাহা এখনও পরীক্ষার স্তরে বিচরণ করিতেছে। এখন নিয়ম কানুনের পরিবর্তন চলিতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন থাকিলেও অকস্মাৎ একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সহ্য করা তাহার পক্ষে বোধ হয় সম্ভব হইবে না। কারকসংখ্যা হ্রাস করার সংগতি স্বীকার করিয়াও যে তাহাকে কার্যে পরিণত করা যাইতেছে না ইহাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। পরিবর্জন যত সহজ পরিবর্তন তত সহজ নয়। কারকের সংখ্যা কমাইতে পরিবর্তনের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু বিভক্তির প্রথমাদি নাম বর্জনে তেমন কোনো অসুবিধা নাই।

বাংলা ব্যাকরণের নূতন পাঠক্রমে এই যে প্রথমাদি বিভক্তির নাম বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে [১] বাংলা ব্যাকরণ সংস্কার সমুদ্যোগের ইহা একটি সার্থক পদক্ষেপ।

১. Curriculum and Syllabuses for Reorganised Pattern of Secondary Education from 1974, W. B. Board of Secondary Education.

শব্দে ও প্রবচনে প্রাণী-নাম

শব্দের ইতিহাস কেবল শব্দেরই উদ্ভব বিকাশ পরিবর্তন পরিণতির গতিপথ অনুবর্তন করে তাহা নহে, উহা মনুষ্যজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও বহু দুর্লভ এবং মূল্যবান্ তথ্য আপন প্রবাহের সহিত বহন করিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু যুগ-যুগান্তরের পলিমাটিতে অনেক সময় তাহাদের মুখের উপর মুখোশ আঁটিয়া দেয়, শত শতাব্দীর স্রোতোবেগ তাহাদের ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন রূপে রূপায়িত করিয়া তোলে। একদিন খালি চোখে দেখিয়া যাহার গোত্র নির্ণয় করা সম্ভব হইত আজ সাধারণ মানুষ তাহার দেহে বংশের কোনো লক্ষণই দেখিতে পাইবে না। প্রত্নতাত্ত্বিকের মত ভাষাতাত্ত্বিকও আজ এক-একটি শব্দের গা হইতে মাটি ছাড়াইয়া তাহার মৌলিক রূপের সন্ধান করিতেছেন, ভগ্ন দীর্ণ টুকরাগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া জুড়িয়া তাড়িয়া মৌলিক অঙ্গসংস্থানের রূপনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। তাহার কিছু কিছু ফল আমরা পাইতেছি। পুরাতনের সহিত নূতনের সংযোগ-সূত্র প্রতিদিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে।

মনুষ্যজাতির সহিত মনুষ্যেতর জীবজগতের সম্পর্ক একদিন বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। মনুষ্যজাতি যখন বানরত্ব হইতে নরত্ব লাভ করিয়াছিল সে যে কত লক্ষ বৎসর আগেকার কথা তাহার হিসাব বৈজ্ঞানিকরা দিয়াছেন। সে হিসাব নির্ভুল না হইতে পারে, কিন্তু ভুল যদি কিছু থাকিয়াও যায় তাহাতে আসল তত্ত্ব খণ্ডিত হয় না। অসভ্য মানুষ আরণ্যক ছিল এবং সভ্যতা লাভের পরেও সে যে অরণ্য-জীবনের অভ্যাস সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ অদ্যাবধি অবিরল। মানবসভ্যতা বিশেষ পরিণতি লাভ করিবার পূর্বে যে নগরের জন্ম হয় নাই—তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আর নগর নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই সকল মানুষ যে নগরে চলিয়া যায় নাই, তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিংশ শতাব্দীর এই তৃতীয় পাদেও সমগ্র পৃথিবীতে নগরবাসীর তুলনায় পল্লীবাসীর সংখ্যা অনেক বেশী, এ বিষয়ে কি কাহারও সংশয় আছে?

অরণ্যজীবনের অভ্যাস লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভ্যাস। মানুষ যখন কথা বলিতে শিখিল তখন পশুপক্ষীই তাহার প্রতিবেশী। তখনও সে সমাজ গঠন করিতে শিখে নাই, জীবজন্তুর মত নিজের উপরেই তাহাকে নির্ভর করিতে হইত, জীবজন্তুর জীবনযাত্রাই ছিল তাহার আদর্শ। এই সকল জীবজন্তুর মধ্যে কেহ ছিল তাহার ভক্ষ্য কেহ বা ভক্ষক, কাহাকেও সে ভয় পাইত কেহ বা তাহাকে ভয় করিয়া চলিত, কোনো জন্তু স্বভাব-গুণে তাহার বন্ধুতা পাইল কেহ বা স্বভাবদোষে তাহার শত্রু বলিয়া গণ্য হইল। শত্রুই হউক মিত্রই হউক এই জীবজন্তুই হইল তাহার সঙ্গী-সহচর। ভাষার তত্ত্বসন্ধানীদের মধ্যে যাঁহারা বলেন পশুপাখীর কণ্ঠস্বর হইতেই মনুষ্যভাষার জন্ম তাঁহাদের কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

মানুষ যখন পুরাপুরি সভ্য হইল তখনও সে জীবজন্তুকে পরিত্যাগ করিল না। পরিত্যাগ করার উপায় নাই। খাদ্যের প্রয়োজন বড় প্রয়োজন। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলে মিলিয়া আমাদের সেই প্রয়োজন মেটায়। স্থলচর, জলচর, খেচর সকল জাতীয় প্রাণীই আমাদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্য প্রয়োজনেও জীবজন্তুর ব্যবহার আরম্ভ হইল। কেহ হইল বাহন, কেহ হইল প্রহরী, কেহ হইল বার্তাবহ। কেহ তাহার লজ্জা নিবারণ করিল, কেহ বা শীতাতপের হাত হইতে তাহার দেহটিকে রক্ষা করিল, কেহ বা তাহার অসুখে বিসুখে ঔষধ জোগাইল। অদ্যাবধি মানুষ কাহাকেও খাঁচায় পুরিয়া মজা দেখিতেছে, কাহাকেও হত্যা করিয়া বাহবা পাইতেছে, কাহাকেও পূজা করিয়া ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে, কাহাকেও কোলে বসাইয়া স্নেহরসে সিক্ত করিয়া করিয়া তুলিতেছে। সে কাহাকেও আদর করে, কাহাকেও গালি দেয়, কাহাকেও ঠেঙ্গায়, কাহারও পিঠ চাপড়ায়, আবার কাহাকেও ঘরে ঢুকিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। মানুষের কাছে ইহাদের মধ্যে কেহ নির্বোধ বলিয়া নিন্দিত, আবার কেহ বা বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসিত হয়। দুর্বল অসহায় বলিয়া কাহারও প্রতি আমরা করুণা দেখাই, প্রবল অনিষ্টকারী বলিয়া কাহারও উপর ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করি।

এইভাবে একান্ত সান্নিধ্যবশতঃ জীবজন্তুরা মনুষ্যজীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভাষার মধ্যে তাহারা কিছুটা স্থান করিয়া লইবে ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি? ভাষার শব্দগঠনে প্রাণী-জগতের দাম কম নয়। জীবজন্তুর নাম অবলম্বন করিয়া কত শব্দ যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অনুসন্ধিৎসু ছাত্ররা তাহার হিসাব লইয়া দেখিতে পারেন। কোনো কোনো প্রাণী বহুসংখ্যক নাম গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। এক প্রাণীর অনেক নাম কেন হইল তাহা আলোচনা করিবার বিষয়। কেবল শব্দে নয় প্রবাদে প্রবচনে রূপকে উপমায় পশুপক্ষীর সাক্ষাৎ সর্বদাই পাওয়া যায়।

মানুষ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে তাহার পরিচিত প্রাণীদের প্রকৃতি সম্বন্ধে এক এক রকম ধারণা করিয়া বসিয়াছে। প্রাণী-নামবাচক বহু শব্দ তাই এখন উক্ত প্রাণীর গুণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল গো-গর্দভ প্রসঙ্গ আলোচনা করিব।

গাধাকে ধরা হয় স্থূলবুদ্ধির প্রতীক। যাহাকে বোকা বলিয়া গালি দিতে চাই তাহাকে 'গাধা' বলি; বলি—তুমি একটি 'আস্ত গাধা'। জগতে অসাধু অসৎ লোকের অভাব নাই কিন্তু যাহারা চালাক চতুর তাহারা ধরা পড়ে না, বোকারাই ধরা পড়ে। 'সব জন্তু মোট বয় ধরা পড়েছে গাধা। সবাই সতী কবলায় ধরা পড়েছে রাধা'—এই প্রবাদে 'গাধা'র বোকামিই প্রকট। 'আদা বেচে গাধা', 'হাঁচি টিকটিকি বাধা যে না মানে সে গাধা' প্রভৃতি প্রবাদের গাধা

আসলে নির্বোধের প্রতিশব্দ। 'ঘোড়ার পেট গাধার পিঠ খালি থাকে কদাচিৎ'—এই প্রবাদেও গাধার নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। গাধাকে 'গর্দভ' করিলে ভাষাটা সাধু হয় বটে কিন্তু তাহার বুদ্ধির মান বাড়ে না। গাধাকে পিটিয়া কেহ কখনো ঘোড়া করিতে পারে নাই। তবে লোকমুখে শুনিয়াছি 'অশ্বেরে পিটিলে হয় গাধা'। গাধার পিঠে যত বোঝাই চাপানো হউক সে নীরবে বহন করে, 'ধোপার গাধা'য় সেই অর্থ প্রচ্ছন্ন। 'গাধা বোট' না 'গাদাবোট'? গাদা বোটটাই বোধ হয় ঠিক। তবে 'ধোপার গাধা' সম্মুখে থাকায় সম্ভবতঃ 'গাদা'র দ মহাপ্রাণ হইয়া গিয়াছে। বোকামি অর্থে 'গাধামি' ভাষায় অপ্রচলিত নয়। 'গর্দভরাগিণী' শুনিলে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন। সংস্কৃত বৈয়াকরণ গর্দভ শব্দের মূল গর্দ্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গর্দ্ ধাতুর অর্থ শব্দ করা। ব্যাকরণের নির্দেশ মানি বা না মানি গর্দভের স্বর যে নিতান্ত সুশ্রাব্য নয় ঈশপ হইতে বিষ্ণুশর্মা পর্যন্ত সকলেই সে বিষয়ে একমত। ফলে গর্দভ শব্দের সহিত উৎকট চীৎকারের একটা যোগাযোগ ঘটিয়া গিয়াছে। 'রাসভরাগিণী' গর্দভরাগিণীরই সানুপ্রাস রূপান্তর। 'দূর থেকে মনে হয় নহবতের বাণী বারবাড়িতে গিয়ে শুনি গাধার চেঁচানি।'—গাধার চেঁচানি দূর হইতে নহবতের বাণী বলিয়া ভ্রম হইবার কোনো কারণ নাই। মন্দ জিনিসকেও দূর হইতে ভাল মনে হইতে পারে।—এই হইল তাৎপর্য। ইংরাজী ass শব্দের কথাটা এই প্রসঙ্গে ভাবুন। যখন কোনো লোক makes an ass of himself তখন বঙ্গীয় বা ভারতীয় গাধার সহিত ইংলণ্ডীয় ass-এর বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। গাধা—যে নামেই হউক না কেন—পৃথিবীর তাবৎ দেশে ছিল এবং আছে এবং থাকিবে। লোকরহস্যের গ্রন্থকার 'গর্দভ'-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নানা দেশে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে।" বঙ্কিমের বক্তব্য সেদিন যেমন সত্য ছিল আজও তেমনি সত্য আছে।

কেবল নির্বুদ্ধিতা নয় গাধার দুর্বুদ্ধিতার অখ্যাতিও মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। 'ঘুলিয়ে খায় গাধা নাম হারামজাদা' অথবা 'সেই গাধা জল খায় তবু গাধা ঘুলিয়ে খায়'—এই দুইটি প্রবাদ লক্ষ্য করুন। গাধা মোট বয় বলিয়াই তাহার মূল্য। খোঁড়া গাধার মত অদরকারী বস্তু আর কিছুই হইতে পারে না। অবস্থার তেমনধারা অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটিলে 'খোঁড়া গাধারও ঘোড়ার দর' হইতে পারে।

নির্বুদ্ধিতার দিক্ দিয়া গোরুকেও গাধার শামিল করা হয়। গোমূর্খ শব্দ গোরুর গোত্বের প্রাচীন প্রমাণ। 'গো-বৈদ্যে'র গো আক্ষরিক অর্থে যতটা চলে আলংকারিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহার অনেক বেশী। গোরুর নিরীহতার আভাস আছে 'গোবেচারা' শব্দে। এ শব্দটা যে খুব বেশী পুরাতন নয় ফারসী বেচারা

তাহার প্রমাণ। 'গোবেড়েন'—প্রাদেশিক 'গো বাড়ান'—প্রয়োজন হইলে মানুষের পৃষ্ঠেও পড়িয়া থাকে এবং যাহার সে আঘাত ফিরাইয়া দিবার শক্তি নাই সে-ই তাহা সহ্য করে।

গো-জাত 'গোবা' 'গোবু' প্রভৃতি শব্দ নির্বোধের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। হবুচন্দ্র রাজার যিনি মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার নাম 'গবুচন্দ্র'। যে হাবা সে গোবাও বটে। দুর্বল নিরীহ নির্বোধ প্রভৃতি অর্থে 'গোরুর' ব্যবহার আছে বটে কিন্তু এই জীবটির প্রতি আমাদের আনুকূল্যেরও অভাব নাই।

গো শব্দের সহিত সংযুক্ত বহু শব্দ আমরা সংস্কৃত হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি।

পুংগব শব্দের অর্থ পুরুষ গো অর্থাৎ বৃষ, ষাঁড়। বৃষকে যে ভারতবর্ষ একদিন শ্রেষ্ঠতার প্রতীক বলিয়া মনে করিত তাহা নরপুংগব মুনিপুংগব প্রভৃতি শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। John Bull কথাটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

গোমাতা শব্দে গোজাতির প্রতি ভারতবাসীর অনুকম্পামিশ্রিত কৃতজ্ঞ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। গোহত্যা তাহার কাছে পাপ। গোঘাতক-এর জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। 'অবোধেরই গোবধে আনন্দ'। যে গোমাংস অতি প্রাচীনকালে ভক্ষ্য ছিল তাহাই একদিন হিন্দুর কাছে অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইল। নিরক্ষর মূর্খ লোকের কাছে 'ক অক্ষর গোমাংস'।

'গোকুল' হিন্দুর কাছে পবিত্র স্থান। কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ 'গোকুলেই বাড়িয়াছিলেন'। গোরুর পায়ের ধূলি উড়ে বলিয়া সন্ধ্যার নাম 'গোধূলি'। কেহ অনেক খাদ্য মুখে পুরিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া খাইলে বলি 'গোগ্রাসে' গিলিতেছে। এক জাতীয় সাপের নাম হইল 'গোক্ষুরা' তাহা হইতে গোখরো। কেন? না, তাহার মাথায় যে চিহ্ন আছে তাহা দেখিয়া কাহারও কোনো কালে গোরুর ক্ষুরের মত মনে হইয়াছিল। অতিক্ষুদ্র আধারের নাম 'গোষ্পদ'। 'গোধিকা' ছোট কুমিরের মত এক প্রকার স্থলচর প্রাণী। ইহা সাপও নয় এবং গোরুর সঙ্গেও ইহার কোনো সম্পর্ক নাই। তবু ইহার নাম হইয়াছে 'গোসাপ'। সংস্কৃতেও 'গোসর্প' 'গোসর্পিকা' পাওয়া যায়।

গো হইতে 'গোপ গোপী গোপিনী গোপীচন্দ্র' ইত্যাদি আসিয়াছে। 'গোপাল' হিন্দুর দেবতা। 'সাক্ষীগোপাল' 'নাডুগোপাল'ও দেবতা বটেন, তবে নাম দুইটি ব্যঙ্গার্থেও ব্যবহৃত হয়। গোরুর মত মুখ বলিয়া কুমিরের নাম 'গোমুখ'। হিমালয়ের যে প্রসিদ্ধ গহ্বরের মধ্য দিয়া গঙ্গা নদী বাহির হইয়াছে তাহার নাম 'গোমুখী'। সেও এই কারণে। জানালার নাম 'গবাক্ষ'। এক সময়ে গোরুর চোখের আকৃতি অনুসারে বাতায়ন নির্মিত হইত। দুধের নাম 'গোরস'। 'গোবিষ্ঠা'র আধুনিক রূপান্তর 'ঘুঁটে'। গোবিষ্ঠারই অন্য নাম 'গোবর'। গোবর নানা অর্থে ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গোবরগাদায়' পদ্মফুল,—এখানে গোবর-

গাদা অর্থে নীচকুল। অকর্মণ্য লোককে বলি 'ষাঁড়ের গোবর'। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে ষাড়ের গোবর ব্যবহারের বিধান নাই বলিয়া এইরূপ অর্থপ্রাপ্তি। এখানে লৌকিক স্মৃতিশাস্ত্র ক্রিয়াশীল। স্থূলদেহ অলসপ্রকৃতি লোককে বলি 'গোবরগণেশ'। 'গোকুলের ষাঁড়' স্বেচ্ছাচারী অনিষ্টকারী ব্যক্তি। 'ধর্মের ষাঁড়'ও এতৎসহ তুলনীয়। ন্যায়শাস্ত্রেও উপমা প্রয়োগের জন্য গোজাতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। 'অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায়' একটি অতি প্রচলিত উপমা। 'গোবিষাণন্যায়' এতটা প্রচলিত না হইলেও একেবারে অপরিচিত নয়। ইহার অর্থ,—যেমন গোরুর একটি শিং আগে ধরিয়া তাহার পর দ্বিতীয় শিংটি ধরিতে হয় তেমনি।

গোহত্যা যে পাপ বলিয়া জানি তাহার প্রমাণ আছে 'গোরু মেরে জুতা দান'-এ। গোরু মারিয়া যে গুরুপাপ হয় জুতাদানের পুণ্য তাহার অনুপাতে নিতান্তই নগণ্য।

গোস্তনের মত আকার বলিয়া সংস্কৃতে দ্রাক্ষাফলের এক নাম 'গোস্তনী'। 'গোষ্ঠ' পশুচারণের মাঠ ; তাহা হইতে মিলনক্ষেত্র, সভাস্থল। 'গোষ্ঠী' শব্দের অর্থও সভা, সমূহ, দল, গণ, পরিবার, পোষ্যবর্গ। 'ইষ্টগোষ্ঠী'র অর্থ এক গুরুর শিষ্যদের মধ্যে ভাববিনিময় ও আলাপ-আলোচনা। 'গোরোচনা' পিউড়িরঙের নাম। জনশ্রুতি ইহা গোমস্তক বা গোপিত্তজাত। কিন্তু আজ যাহাকে গোরোচনা বলি তাহার সহিত গোজাতির কোনো সম্বন্ধ নাই। 'গো' শব্দ একদিন শ্রেষ্ঠ শব্দের সমার্থক হইয়াছিল। 'গোতম' 'গৌতম' শব্দে তাহার পরিচয় আছে।

'গোয়াল' আসিয়াছে গোশালা হইতে। 'গোঠ' শব্দ গোষ্ঠজাত। দুষ্ট গোরুর জন্য ভিন্ন 'গোয়াল' বা 'গোঠে'র ব্যবস্থা লোকশাস্ত্রের বিধান।

সংস্কৃতে গোশব্দের বহু অর্থ। গাভী বৃষ পশু মাতা গায়ত্রী বাণী স্বর্গ চক্ষু ইন্দ্রিয় দৃষ্টি দিক্ কেশ কিরণ জল বাণ সূর্য চন্দ্র ইত্যাদি। গো শব্দ যে অতি প্রাচীন তাহা আমরা জানি। ইংরাজী Cow জর্মন Gau প্রভৃতি শব্দ জ্ঞাতিসূত্রে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। গোবাচক একটি ইন্দো-ইউরোপীয় মূল শব্দ হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। লক্ষ্য করিবার বিষয় ইউরোপে উহাদের মৌলিক অর্থের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু ব্যঞ্জনা-লক্ষণার বলে সংস্কৃতে গো শব্দ অনেক নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। এমন অর্থও গ্রহণ করিয়াছে মূলের সহিত যাহার সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এরূপ অর্থের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

'গো' শব্দের প্রসঙ্গে বৃষ শব্দের কথা উঠে। সংস্কৃতে ইহারও নানা অর্থ। যেমন,—ইন্দ্র ধর্ম বিষ্ণু ময়ূরপুচ্ছ কন্দর্প বলশালী ব্যক্তি জল শুক্র ইত্যাদি। রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশির নাম বৃষ। ল্যাটিন Taurus-এর অর্থও বৃষ। শিবের

নাম 'বৃষবাহন' বা 'বৃষধ্বজ'। 'বৃষোৎসর্গ' শ্রাদ্ধবিশেষ। আলংকারিক অর্থে আড়ম্বর বুঝাইতে 'বৃষোৎসর্গ' শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। বৃষোৎসর্গে বৃষবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠস্তম্ভের নাম 'বৃষকাষ্ঠ'। অতিশয় শীর্ণলোককে বিদ্রূপ করিয়া বলা হয় বৃষকাষ্ঠ। 'বৃষ্য' শব্দের অর্থ বলকর, বীর্যবর্ধক, মাষকলাই। 'বৃষ্যা'র অর্থ শতাবরী, আমলকী। স্থূলস্কন্ধশালী ব্যক্তিকে 'বৃষস্কন্ধ' বলা হয়।

গোরুকে আমরা যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি প্রবাদে প্রবচনে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল মূল্যবান্ সম্পত্তির মত গোরুকেও সাবধানে রাখিতে হয়। গোধন হরণের অনেক কাহিনী পুরাণে পাওয়া যায়। বাংলা দেশের সীমান্তে একালেও তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। তাই লোকশ্রুতির উপদেশ,—'গোরু জরু ধন রাখ বিদ্যমান', নহিলে চুরি যাইবার ভয় আছে। জরুর সহিত গোরুকে এক পংক্তিতে বসাইয়া লোককবি জরুকে হয়তো কিছুটা খাটো করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফলে গোরুর মূল্য কিন্তু অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। 'ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে গোয়ালার গোরু টেঁকে বসে'। এই বাক্যে গোরুর মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে শকুনির চরিত্রেরও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 'গোমড়ক' এদেশের পক্ষে একটা বিষম বিপর্যয়। কোনো স্থানে একসঙ্গে অনেক গোরু বিনষ্ট হইলে সেখানকার অর্থনীতিতে গুরুতর সঙ্কট দেখা দেয়। 'গোমড়কে মুচির পার্বণ'-এর অর্থ 'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ'।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে আজ আর সর্বসাধারণে গোরু পোষে না। দুধের জন্য পল্লীর গৃহস্থেরা কখনও কখনও দুইটা একটা গোরু পুষিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাকে সম্পত্তি বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। চাষী এবং গোয়ালা জীবিকার জন্য গোরু রাখে। কলের ব্যবহার বাড়িলে একদিন চাষের কাজেও হয়তো গোরুর দরকার হইবে না। তবে দুধটা যতদিন কলে তৈয়ারি না হইতেছে ততদিন কেবল দুধের জন্যই গোরুর প্রয়োজন থাকিবে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে যেদিন গোরু ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া ছিল সেদিন ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গে তাহার নাম নানাভাবে চলিত ছিল। আজও ভাষায় তাহার প্রয়োগ প্রচলিত।

গ'ড়ে গোরু, কুঁড়ে গোরু, কানা গোরু স্বভাবতই কেহ কিনিতে চাহে না। কিন্তু বাজারে বিক্রেতার সুনাম (good will) থাকিলে যেমন বাজে মালও কাটিয়া যায় তেমনি 'গাঁয়ের গুণে গ'ড়ে গোরু বিকায়'। বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া বোকা লোকে 'কড়ি দিয়ে কানা গোরু' কেনে। এবং যখন বোঝে এ গোরু দিয়া কোনো কাজ হইবে না তখন তাহা 'বামুনকে দান' করিয়া ভ্রম সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পুণ্যার্জনও করিয়া লয়। এ যুগেও সে রীতি বর্জিত হয় নাই তবে গোব্রাহ্মণের রূপটা কিছু বদলাইয়া গিয়াছে এই যা।

গৃহস্থের ঘরে গাই না থাকা সেদিন ছিল দারিদ্র্যের চিহ্ন। যাহার 'গোয়ালে

গরু মরায়ে ধান সে-ই সংগতিপন্ন'। দারিদ্র্যের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য মানুষ যাহা নাই তাহাই আছে বলিয়া ভান করে এবং অনভিজ্ঞতা বশতঃ ধরা পড়িয়া লজ্জা পায়। 'কোনো কালে নাইকো গাই চালুনি নিয়ে দুইতে যাই'—প্রবাদটির ইঙ্গিত লক্ষ্য করুন।

গোরুর গুণাগুণ প্রসঙ্গে অনেক প্রবাদের জন্ম হইয়াছে। কুঁড়ে গোরু অতিশয় নিন্দাভাজন। কাজ করিবে না অথচ সকলের সমান খাইবে—সেটি যাহাতে না হয় সে জন্য 'কুঁড়ে গোরুর ভিন্ন গোঠ'-এর ব্যবস্থা। 'কলুর বলদ' কোনো কাজের নহে শুধু ঘানিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া মরে। সে জন্য প্রবাদের নির্দেশ 'গাই নেবে দুয়ে বলদ নেবে বেয়ে'। 'বেয়ে' অর্থাৎ লাঙ্গল চালাইয়া।

যে লোভের বশে বৃত্তি পরিবর্তন করিতে চায় সে ঠকিয়া মরে। 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল করল এঁড়ে গোরু কিনে' অথবা 'আগে ভাল ছিল জেলে জালদড়ি বুনে, কি কাজ করিল জেলে এঁড়ে গরু কিনে'।

আর একটি প্রবাদ দেখুন,—'এঁড়ে গোরু, না টেনে দো'। এঁড়ে গোরু বলা সত্ত্বেও যে টানিয়া দুহিতে বলে, সে হয় বধির নয় নির্বোধ। অনুরূপ আর একটি প্রবাদে গাই না থাকিলে বলদ দুহিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

তত্ত্বোপদেশমূলক প্রবাদেও গোজাতির সমাগম ঘটিয়াছে। 'আপন আপন যত কর চিনির বলদ বয়ে মর।' পরের অর্থ লইয়া যে নাড়াচাড়া করে তাহাকে 'চিনির বলদ' বলা হয়। চিনি বহাই সার হয় খাইবার অধিকার নাই।

বোকা অর্থে 'গোরু' শব্দের ব্যবহার হয় সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। রাগ বেশী হইলে কেবল 'গোরু' বলিয়াই মনের ঝাল মিটে না, কেহ কেহ তাহার আগে একটা বন বসাইয়া দেয়। যেমন,—'ওঝার বেটা বন গোরু'। অর্থ পণ্ডিতের পুত্র মূর্খ। পোষা গোরু অপেক্ষা বুনো গোরুর বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম এই অনুমানের উপরেই প্রবাদটির জন্ম

গৃহস্থ গাই ও বাছুরকে নিজের স্বার্থে পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। তবু সুযোগ পাইলেই বাছুর গাইয়ের কাছে আসিয়া দুধ খাইয়া যায় অথবা গাই বাছুরের নিকটে আসিয়া দুধ দিয়া যায়, গৃহস্থ তাহা টের পায় না। গাই বাছুরের এই সম্পর্কটিকে একটি প্রবাদে রূপ দেওয়া হইয়াছে।—'গাই বাছুরে পিরীত থাকলে মাঠে গিয়ে দুধ দেয়'। বাৎসল্যের এই উদাহরণটি মধুর রসের ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 'পিরীত' কথাটির মধ্যেই তাহার ইঙ্গিত আছে।

গণনাবিষয়ক প্রবাদেও গোরুর নাম পাওয়া যায়। যেমন,—'গোনা গোরু বাঘে খায় না'। পাঠান্তর 'হিসাবের গোরু বাঘে খায় না'। অর্থ এই,—গোরু চরাইতে পাঠাইবার সময় গুনিয়া পাঠাইতে হয়, এবং মাঠ হইতে ফিরিলে গোয়ালে ঢুকাইবার সময় গুনিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে হারাইবার ভয় থাকে না

গোয়ালে ঢুকাইবার সময়ই যদি দেখা যায় ছুই একটা কম পড়িয়াছে তাহা হইলে তখনও খোঁজ করা সম্ভব হয়। পরে খোঁজ করিলে ফিরিয়া না পাইবার আশঙ্কাই বেশী। এই প্রবচনটি এখন আমদের মুখে রূপান্তর লাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছে,—'হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না'। গোরু শব্দের যাহা ব্যঙ্গ্যার্থ তাহাই বাচকের মুখে স্বাভাবিকভাবে আসিয়া গিয়াছে, যদিও সমগ্র বাক্যটির আক্ষরিক বিচারে অসঙ্গতি ঘটিয়াছে বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষে গোরুর এমন মহিমা যে গোময় গোমূত্রও উপেক্ষিত হয় নাই। 'গোবর' শব্দের আলোচনা আগে করিয়াছি। গোময় গোমূত্র পঞ্চগব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে স্থান পাইয়াছে। গুণদোষের বিচার প্রসঙ্গে দুগ্ধ ও গোমূত্রের তুলনা করা হইয়াছে এই প্রবাদটিতে—'এক কলসী দুধে এক ফোঁটা চোনা'।

একজনের দুঃখ দেখিয়া অন্যজন যদি নিজের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা না করিয়া হৃষ্টমনে কাল কাটায় অথবা বিপন্ন জনকে উপহাস করে তাহা হইলে আমরা বলি 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে'। 'ঘসি' শব্দটি আঞ্চলিক, ইহা 'ঘুঁটে'-রই প্রতিশব্দ। 'ঘসি ঘাঁটা' একটি নিকৃষ্ট কর্ম। প্রাচীন সাহিত্য হইতে একটা উদাহরণ দিই। কৃষ্ণ স্বীয় বংশী উৎকোচ দিয়া রাধার প্রেম প্রার্থনা করিলে রাধা ঘৃণাভরে উত্তর দিলেন, 'তোর বাঁশি মোএ ঘসি না ঘাটোঁ'।

নামরহস্য

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন দিলে তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরে না জানিয়াও হয়তো কোনো স্নেহান্ধ পিতা চক্ষুহীন পুত্রের একদিন ওই নাম দিয়াছিল। সন্তানের বাহিরের অন্ধতা ঢাকিতে গিয়া সে যে আপনার অন্তরের অন্ধতাই জগতের কাছে প্রকাশ করিতেছে, এ কথা হয়তো সেদিন তাহাব মনে উদয় হয় নাই।

বস্তুতঃ নাম মানুষের বাহিরের পরিচয়মাত্র। অন্তরের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধই নাই, তাই শেক্‌স্‌পিঅর একদিন বলিয়াছিলেন, "নামে কি আসে যায়? গোলাপকে যে নামই দাও না কেন তাহার গন্ধের কোনো তারতম্য হইবে না।" কথাটি নিতান্তই সত্য। গোলাপ, হাসনুহানা, মল্লিকা-মালতী, ডেজি-ড্যাফোডিলকে $ক^১$-$ক^২$, $খ^১$-$খ^২$, $গ^১$-$গ^২$ এই রকম নাম দিলে কাজ যে চলে না এমন নয়। বরং কাহারও কাহারও কাজ তাহাতে সহজসাধ্যই হয়, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকের। কিন্তু মনুষ্যসমাজে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা অবৈজ্ঞানিকের সংখ্যাই বেশী। তাহারা আবার নামের মধ্যে কোথাও বা মাধুর্য এবং কোথাও বা গাম্ভীর্য আশা করিয়া বসে। এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁহারা পুত্র-কন্যার নামকরণের জন্য অভিধানের শরণাপন্ন হন, তাহাতেও ফল না ফলিলে শেষপর্যন্ত শিশুটিকে সঙ্গে লইয়া সম্বামিক কবিগুরুর শ্রীচরণ-সন্দর্শনে যাত্রা করেন।

কবিগুরুর কথাই যখন উঠিল তখন নাম সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি সেটা বলি। তিনি বলেন, —"মানুষের মাধুর্য···সর্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই ন', কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃজন-কার্যের সহায়তা করে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীরপতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।"

কাব্যের নায়ক নায়িকা বা ক্ষুদ্র বৃহৎ চরিত্রগুলি কবি নিজেই সৃষ্টি করেন। কবি তাহাদের যেমনটি করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিতে চাহেন ঠিক তেমনটিই যে আমরা দেখি তাহা নহে। আকৃতি প্রকৃতির যে বিবরণ দিয়া কবি তাঁহার নায়কের মূর্তি রচনা করেন আমরা কল্পনার রঙে তাহাকে আর একটু রাঙাইয়া লই। এই সকল ক্ষেত্রে নামও চরিত্রের অন্যতম পরিচয়। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা এই দুইটি নাম দিয়াই কবি কালিদাস শকুন্তলার দুই সখীর চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের নাম সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমন্ত; চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী; বিক্রম, সুমিত্রা, সুদর্শনা, গোরা প্রভৃতি নামগুলিও যথেচ্ছাসঞ্জাত নয় পরন্তু চিন্তাসভূত।

সত্যই রচনার মধ্য দিয়া যে রস পরিবেশন করা হয় সুনির্বাচিত নাম তাহার

পাত্রস্বরূপ। কনককটোরা আধার হিসাবে নিতান্ত নিন্দনীয় না হইলেও সিরাজি সেবনের পক্ষে পেয়ালাই যে সমধিক প্রশস্ত একথা ওমর খৈয়ম হইতে অত্যাধুনিক খুনখারাপী গজলগান রচয়িতাগণ পর্যন্ত কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

হাস্যরসের ক্ষেত্রে নামের দাম আরও অধিক সেইজন্য যেখানে 'নিমাই' চন্দ্রও যথেষ্ট তিক্ত প্রতিপন্ন হন না সেখানে 'গদাই' নামে দ্বিতীয় বার নামকরণ করার প্রয়োজন হয়। কাছে পিঠে না পাইলে অন্ততঃ বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ী হইতে শ্রীমতী কাদম্বিনীকে পালকি করিয়া আনাইয়া লইতে হয়। রসিকদাদার রসিকতা এবং ভাঁড়ুদত্তের ভাঁড়ামি এক শ্রেণীর না হইলেও দুইজনের নামে ও আচরণে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। চিরকুমার সভার এই রসিকদাদা নৃপ ও নীরর জন্য যে দুইটি 'ফাঁড়া'র আয়োজন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত পাঠকের পরিচয় আছে। তাঁহাদের একটি "বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুটজুতা-পরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালি-পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা, বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত যেটা খুশি ইইতে পারে।" ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি "বেঁটে-খাটো, অত্যন্ত দাড়িগোঁফসংকুল, নাকটি বটিকাকার" এবং আরও নানাবিধ শারীরিক সুলক্ষণ-সমাক্রান্ত। ইহার নাম দারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

যাহার যে নাম তাহাকে সে নামে না ডাকিয়া অন্য নামে ডাকিলে সে কখনো খুশী হয় না—বিশেষতঃ ওই নূতন নামকরণের মধ্যে যদি তাহার শারীরিক, ব্যাবহারিক বা আর কোনো প্রকারের কিছু ত্রুটির সম্বন্ধে ইঙ্গিত থাকে। যাহার নাম বিশেষ সুশ্রাব্য নয় সেও তাহার পরিবর্তন চায় না। "এমন কি যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে তাহার অসহ্য বোধ হয়।" আর নামটাকে বিকৃত করিলে যে পীড়া দেওয়া হয় তাহা যে কিরূপ অসহনীয় সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। 'গিন্নী' গল্পের শিবনাথ পণ্ডিতের এ তত্ত্বটি ভাল রকম জানা ছিল। বাচনিক যতগুলি অস্ত্র তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত এইটি তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিদারুণ। তাই শশিশেখরকে 'ভেটকি' এবং আশুকে 'গিন্নি' নাম দেওয়ায় তাহারা যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিল বেত ও বিছুটির জালাও তাহার তুলনায় অনেক আরামের।

শুধু গ্রন্থোক্ত পাত্র-পাত্রীর নামই নয় গ্রন্থের নাম সম্বন্ধেও গ্রন্থকাররা মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট চিন্তা করেন। চিন্তার বিষয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তকের নামকরণের সময়ে লেখকেরা সাধারণতঃ কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। কেহ বা নামের মধ্য দিয়া গ্রন্থোক্ত বিষয়বস্তুটির পরিচয় দিয়া দেন। যেমন,—মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, সরল বাঙ্গালা অভিধান, ধাতুরূপকল্পদ্রুম। কেহ বা আলোচ্য বিষয়ের মুল সূত্রটি ধরাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন। যেমন,—কৃষ্ণকান্তের উইল, বৈকুণ্ঠের খাতা,

নীলদর্পণ। পাত্র-পাত্রীর নাম লইয়া গ্রন্থের নাম দেওয়াটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ইহার উদাহরণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রধান পাত্র বা পাত্রীর কোনো প্রকার বৈশিষ্ট্য অথবা আলোচ্য বিষয়ের মূল ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে সংকেত-মূল নাম গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করে তাহাই এ যুগে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ নামনির্বাচনে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন এবং সে দক্ষতার অভাব অনেক স্থলেই পরিস্ফুট। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নষ্টনীড়', 'অচলায়তন', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'পণ্ডিতমশাই', দত্তা' 'পরিণীতা', 'অরক্ষণীয়া', 'বলিদান' প্রভৃতি নামে গ্রন্থকারদের যে নামনির্বাচনের নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সর্বত্র সুলভ নহে।

পুস্তকের প্রথম নাম পরিবর্তন করিয়া পরবর্তী সংস্করণে অন্য কোনো নাম দিলে পাঠকের মনে স্বতঃই কৌতূহল জাগে। মনে হয়, প্রথম নামে লেখক যে ভ্রম করিয়াছিলেন দ্বিতীয় নামে তাহার সংশোধন করিতে চাহিয়াছেন। কালির আঁচড় না দিলে অশুদ্ধও শুদ্ধ বলিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু দাগ পড়িলে খাঁটিকেও দাগী মনে হয় এবং কাটা শব্দটির পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য মন তখন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। সেদিন যখন শ্রীমতী 'দত্তা' 'বিজয়া' নামে নাট্যশালায় পদার্পণ করিলেন তখন হঠাৎ মনে হইল 'দত্তা' নাম দিয়া শরৎচন্দ্র কি এত দিন অনুতাপ করিতেছিলেন? অথবা, উপন্যাসের নাট্যরূপে নামেরও পরিবর্তন আইন অনুসারে অবশ্যকর্তব্য? 'দত্তা'র মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম এবং সুনিপুণ ইঙ্গিতটি রহিয়াছে, 'বিজয়া' নামে তাহা নাই। পিতা বনমালী কন্যার ডাক নাম দিয়াছিলেন বিজয়া, দৈবজ্ঞ শরৎচন্দ্র রাশিনাম লিখিয়াছিলেন দত্তা। আজ তাঁহারই দেওয়া দত্তা নাম প্রত্যাহার করায় তাঁহাকে দত্তাপহরণ পাপে লিপ্ত হইতে হইল। 'ললিতা'র লালিত্য সত্ত্বেও 'পরিণীতা' নাম বর্জনে আমাদের সমর্থন নাই। 'অরক্ষণীয়া'র 'জ্ঞানদা' সম্বন্ধেও আমাদের এই মত।

রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রাণী'র সংস্কৃত রূপকে যে 'তপতী' নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট অর্থ লক্ষ্য করা যায়। সুমিত্রার আত্ম-ত্যাগের মধ্য দিয়া এই নাটক পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। 'রাজা' ও 'রাণী' উভয়েই প্রধান নহে। কাজেই 'রাজা' ও 'রাণী'র মধ্যে কাহারও নাম দিতে হইলে 'রাণী'র নামটার প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু 'রাণী' বস্তুতঃ রাণী নহেন, তাই শুধু 'রাণী' নামটাও যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই। সুমিত্রা নাম রাখা যাইতে পারিত, কিন্তু তপতীর মধ্যে যে সংকেতটি রহিয়াছে শুধু সুমিত্রার মধ্যে সেটি নাই। পরিবর্তিত নামের প্রসঙ্গে 'শেষরক্ষা'র কথা মনে আসে। 'গোড়ায় গলদ' হইলে সর্বত্র শেষ রক্ষা হয় না। কিন্তু যেখানে বলি শেষরক্ষা হইয়াছে সেখানে গোড়ায় গলদ হইয়াছিল এ ধারণা আপনা হইতেই মনে জাগে। 'গোড়ায় গলদ' ট্রাজেডি, 'শেষরক্ষা' ট্রাজেডিমূল কমেডি।

গল্পে-উপন্যাসে, কাব্যে-নাটকে নাম স্বয়ং খানিকটা কাজ করে। কিন্তু যাহাকে প্রতিদিন দুই বেলা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি, যাহার নাড়ী এবং হাঁড়ি দুয়েরই খবর আমার সুবিদিত, তাহার নাম যাহাই হউক না কেন কি আসে যায়? কল্পনা-জগতে নামের যে দাম বস্তুজগতে সে দাম নাই ইহা মানিতেই হইবে। মাসের দোসরা তারিখে গৃহিণীর যে মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয় তিরিশে তারিখে তাহার কি কোনো পরিবর্তন হয় না? কিন্তু সেদিনও আপনাকে মঞ্জুভাষিণী, নিদেনপক্ষে মঞ্জু বলিয়াই ডাকিতে হইবে। ভাবিয়া দেখুন তো কি রকম বিড়ম্বনা।

এই যে ঘরবাড়ি, দোকান-দেবালয়, ব্যাঙ্ক-বাজার, যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি সব কিছুরই নিত্যনূতন নামকরণ হইতেছে তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের নব-প্রবর্তিত রুচি ও মনোভাবের একটা বিচিত্র রূপ দেখা যায় মাত্র। এখন শু-স্টোর্সের স্থান অধিকার করিয়াছে বিনামা বিপণি বা পাদুকা প্রতিষ্ঠান, আইডিয়াল কাফের জায়গায় দেখা যায় আদর্শ পেয়াবাস, থিয়েটারের নাম হইয়াছে নাটমন্দির রঙমহল প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু পাদুকা, পেয়, ও প্রেক্ষ্যের কতটুকু তারতম্য হইয়াছে তাহার সংবাদ গোচর করাইবার ভার লেখক লইতে রাজী নহেন। সম্ভবতঃ তাহার প্রয়োজনও নাই। কয়েক বছর আগে কায়স্থসভার উদ্‌যোগে একটি বিরাট ভোজের অনুষ্ঠান হয়। জনৈক বন্ধু ভোজ খাইয়া আসেন, দৈবদুর্বিপাকে কায়স্থ না হওয়ায় এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে ভোজের পরিবর্তে একটি ভোজ্যতালিকা জুটে। তাহার মধ্যে হঠাৎ একটি নামের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভোজ্য হিসাবে বস্তুটি কি রকম উপাদেয় হইবে নাম দেখিয়া তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, বন্ধুর সাহায্যে বুঝিয়াছিলাম। উক্ত খাদ্যের নামটি হইতেছে 'ললনাঙ্গুলিকা'। বঙ্গভাষার প্রতি বাঙালীর যে অত্যুগ্র অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে তাহার জন্য ভাষাজননী অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিবেন। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক।

মোট কথা, এই দেখা যাইতেছে যে বাস্তব জগতে নামটা নামধারীর চিহ্নমাত্র, পরিচয় নয়। নাম যদি কাহারও পরিচয় দেয় তো সে নামদাতার, নামের অধিকারীর নয়। সেই হিসাবে সামাজিক জীবনের ইতিহাসে নামের মূল্য অনেক।

রবীন্দ্রনাথ এক স্থলে বলিয়াছেন, "সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কি সুন্দর!...নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা-ব্যবহার-মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী।" সত্যই মানুষের ব্যবহার মনোবৃত্তি রীতিনীতির সহিত নামের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কোনো সময়ের কতকগুলি নাম আলোচনা করিয়া সেই সময়ের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় হিন্দু সম্প্রাদায়ের মধ্যে দেবদেবীর নামে পুত্রকন্যার নামকরণের প্রথা আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভগবানের

নাম উচ্চারণ করিবার ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। কলিযুগে নামকীর্তন ভিন্ন আর ভবসংসার হইতে উদ্ধার পাইবার দ্বিতীয় তরণী নাই। মৃত্যুকালে গঙ্গানারায়ণকে স্মরণ না-ও হইতে পারে কিন্তু পুত্রের নাম যদি গঙ্গানারায়ণ হয় তাহা হইলে মায়ামুগ্ধ নর সে নাম একবার উচ্চারণ না করিয়া পারিবে না।

দেবতাকে পূজা করিয়া যে সন্তান লাভ হয় তাহাকে উমাপদ, শ্যামাচরণ, কালীকিঙ্কর নাম দিয়া ইষ্টদেবতার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি। বিনা পূজাতেও যাঁহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হন পিতামাতা তাঁহাদেরও 'দেবপ্রসাদ' বলিয়াই মনে করেন।

যাহাকে বড় বেশী ভালবাসি তাহাকে হারাইবার ভয়ে মানুষের মন সর্বদাই আতঙ্কিত থাকে। কয়েকটি নামের মধ্যে এই আশঙ্কার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

'রাখহরি', 'থাকমণি' প্রভৃতি নামের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় অবশ্যই আছে। মৃতবৎসা বা নিঃসন্তান জননীর কোনো সন্তান হইলেই মনে ভয় হয়, ভগবান্ যদি ইহাকেও কাড়িয়া লন। তাই তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা জানানো হয়, 'হরি, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর'। প্রতিবার সন্তানের নামোচ্চারণ প্রসঙ্গে ভগবানের চরণে এই প্রার্থনাই পৌঁছিতে থাকে।

মৃতবৎসার মনে হয়, মায়ের স্নেহ না পাইয়াই তাঁহার স্নেহের দুলাল তাঁহার আদরের দুহিতা অভিমানে কোল খালি করিয়া গিয়াছে। এবার আর তাহাকে ছাড়া হইবে না। তাই তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 'থাক' বলিয়া অভ্যর্থনা করেন।

দুর্ভাগিনী রমণীর কোনো পাপের ফলেই হয়তো তাঁহার পুত্রশোক। এ হয়তো পূর্বকৃত দুষ্কর্মেরই ফল। এইরূপ চিন্তাও মধ্যে মধ্যে জননীর মনকে প্রপীড়িত করে। তাহারই ফলে 'এককড়ি' 'দুকড়ি' 'তিনকড়ি' প্রভৃতি নামের উৎপত্তি। যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কের টাকা ভাঙে আইনে তাহারই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে কিন্তু সে যদি তাহার ঘর বাড়ি অন্যের নামে বেনামী করিয়া রাখে তাহা হইলে সরকারের তাহাতে হস্তার্পণ করিবার উপায় থাকে না। 'এককড়ি' 'দুকড়ি' 'বেচারাম' 'কেনারাম' প্রভৃতি নামের মধ্যে এইরূপ আইন বাঁচাইবার চেষ্টা দেখা যায়। মন্দভাগিনী জননী ভাবেন, আমার সন্তান বলিয়াই ভগবান্ ইহাকে কাড়িয়া লন, কিন্তু আমি যদি ইহার মাতৃত্বের অধিকার অপরের হস্তে তুলিয়া দিই তাহা হইলে আর তিনি ইহাকে গ্রহণ করিবেন না। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবজাত শিশুটিকে তিনি ধাত্রীহস্তে তুলিয়া দেন। পরে অবশ্য এক কড়া কি দুই কড়া কড়ি দিয়া ধাত্রীর নিকট হইতে তাহাকে পুনরায় ক্রয় করিয়া লন। কিন্তু যেহেতু মাতৃত্বের অধিকার একবার ধাত্রীকে দেওয়া হইয়াছে, সেইহেতু অমুকের সন্তান বলিয়া বিধাতা তাহাকে আর হরণ করিতে পারেন না। এখন চিত্রগুপ্তের জন্মরেজেস্টারিতে ওই শিশুর মাতৃনামের স্থলে ধাত্রীনাম লিখিত

হইয়া গিয়াছে। আইন মানিয়া চলিতে হইলে উহার উপর তাঁহার কোনো হাত নাই। তবে রাজার আইন এবং প্রজার আইন তো সব সময়ে একরূপ হয় না।

মানুষের মত দেবতারও সুন্দর জিনিসের প্রতি বড় লোভ। রসগোল্লা দেখিলে আমাদের জিহ্বা সরস হয় কিন্তু যদি কেহ বলিয়া দেয় উহা অনেক দিনের বাসী, পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আর সেদিকে মন দিবার প্রয়োজন বোধ করি না। সন্তানের জননী ভাবেন ভগবানের মনোভাব আমাদেরই মত। তাহারই ফলে 'ফেলারাম', 'গুয়ে', 'মেথরা' প্রভৃতি নামের উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গের আলোচনা পূর্বে হইয়াছে।

কোনো পাঠশালার গুরুমহাশয় একটি পড়ুয়ার নাম দিয়াছিলেন 'নিমাই'। নিমাইয়ের এক সহপাঠী গুরুমহাশয়কে একদিন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন,—"আরে তা-ও জানিস না, ও যে আমায় রোজ একটি করিয়া নিমের দাঁতন আনিয়া দেয়।" নিমাইয়ের সহপাঠী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"গুরুমহাশয়, আমি যদি প্রত্যহ একটি করিয়া জামের দাঁতন আনিয়া দিই?" গুরুমহাশয় আর কোনো জবাব দিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু একথা সত্য যে তাঁহার 'নিমাই' নামকরণ অসংগত হয় নাই। বস্তুতঃ 'নিমাই' শব্দ 'নিম' হইতেই আসিয়াছে। মৃত্যুদেবতাও মানুষের মত তিক্তদ্রব্যের কাছে ঘেঁষিবেন না—এইরূপ মনোভাব লইয়াই জননী সন্তানের দীর্ঘ-জীবন কামনায় এইরূপ নাম দিয়া থাকেন। সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে একদিন শচীমাতাও নবজাত সন্তানের এই নামই দিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে 'তিতারাম' 'তিতুরাম' নামও শুনিয়াছি।

অবস্থাবিশেষে মানুষ আবার সন্তান চায় না। 'আন্নাকালী', 'ক্ষান্তমণি' প্রভৃতি নামই তাহার প্রমাণ। কৌলীন্য-প্রথার দুঃখময় ইতিহাসের সহিত এই নামগুলির কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

তাই বলি, কাব্যের নাম নামধারীর পরিচয়। আর জীবন্ত মানুষের নাম তাহার সমাজের প্রতিবিম্ব।

আজকাল তরুণ সমাজে নামের মধ্যাংশ ছাঁটিয়া মধ্যপদ-লোপ করার রেওয়াজ হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এখন যুক্তাক্ষরবিহীন সুকোমল সুললিত নামেরও বহুল প্রচলন হইতেছে। তাহার ফলে কি হইয়াছে এবং কি হইতে পারে সে আলোচনা 'কচি সংসদ'-এই হইয়া গিয়াছে, এখানে পুনরালোচনা নিরর্থক। কিন্তু ইহা হইতে অতি আধুনিক বাঙালী সমাজের যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা খুব সতেজ এবং সমুন্নত বলিয়া মনে হয় না।

কন্যার দুর্ভাগ্য আশঙ্কা করিয়া বাঙালী পিতামাতা 'সীতা' নাম রাখিতে ভয় পান। ইহা হৃদয়ের কোমলতা এবং ভীরুতা উভয়েরই পরিচায়ক। আজকাল দুই একটি বাড়িতে এই নামটির চলন দেখিতেছি। কেহ কেহ সংস্কার মানেন না

জনসমাজে ইহা দেখাইবার জন্যই এরূপ নাম রাখেন, এমনও শোনা যায়। কিন্তু তাহা না-ও হইতে পারে।

ইভা, নিভা প্রভৃতি কয়েকটি নামের কোনো অর্থ বুঝা যায় না, কিন্তু সন্ধান করিলে প্রয়োগের কারণ আবিষ্কার করা কঠিন হইবে না। 'ইভ' শব্দের অর্থ হস্তী। স্ত্রীলিঙ্গে রূপ হয় 'ইভী'। ধরিয়া লইলাম 'ইভা'ই হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোন্ মাতা হস্তিনীবাচক শব্দ দিয়া কন্যাকে অভিহিত করিবেন? এমন হইতে পারে, বর্ণসংক্ষেপ ও শ্রুতিমাধুর্যহেতু ইভাননী শব্দের দ্বিতীয়ার্ধ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ ইভানন মাতার পছন্দ হইলেও জামাতার তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগ না-ও জন্মিতে পারে। 'নিভ' শব্দের অর্থ সদৃশ। অন্য শব্দের সহিত যুক্ত না হইলে ইহার তো প্রয়োগই হয় না। হয়তো বা জ্যেষ্ঠ ভগিনীর নাম বিভা; সাদৃশ্য এবং অনুপ্রাস বজায় রাখিবার জন্য মধ্যমা এবং তৎপরবর্তী দুই ভগিনীর নাম দেওয়া হইয়াছে 'ইভা' ও 'নিভা'। তাহার পর ধীরে ধীরে নিরর্থক হইলেও নামগুলি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন সাহিত্যেও এই ধরনের নামের নিদর্শন পাওয়া যায়। ময়নামতীর গানে দেখি, রাজা গোবিন্দচন্দ্র এক রাজার দুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাদের একজনের নাম চন্দনা অপরের নাম ফন্দনা। পদুনার বোন অদুনার নাম লইয়া ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু চন্দনার বোন ফন্দনার কি আর কোনো গতি আছে?

স্বস্তিক শব্দটি আমাদের তেমন পরিচিত নয় অথচ শব্দটি সংস্কৃত। এই শব্দটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির ফেরত যখন Swastika রূপে ভারতবর্ষে দেখা দিল তখন 'স্বস্তিকা' বলিয়া আমরা আহ্বান করিলাম। পদান্তস্থিত a বাংলায় আ হইয়া গেল। ফলে মেয়েরা 'স্বস্তিকা' দেবী নাম গ্রহণ করিয়া নূতন করিয়া আর্যা হইলেন। 'সবিতা' দেবী নামও এযুগে শোনা যাইতেছে। কিন্তু হায়, কে বলিয়া দিবে যে সবিতা কবিতার সহোদরা নয়? আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে 'অতুল্য' নামটি সর্বজন পরিচিত। শুনিয়াছি জ্যেষ্ঠ সহোদরের অমূল্য নামের সহিত মিল রাখিবার জন্যই এই নামকরণ।

সর্বভারতীয় লিপি

রাষ্ট্রভাষার সমস্যা স্বাধীনতালাভের পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। এখন তাহার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষাসমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রত্যালোচনা কম হয় নাই। এ প্রসঙ্গে হিন্দী এবং হিন্দুস্থানীর নামই বেশী শোনা গিয়াছে, এখনও যাইতেছে।

হিন্দী এবং হিন্দুস্থানীর মধ্যে কতখানি মিল আর কতখানি পার্থক্য সে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই। তবে এক দিক দিয়া উভয়ের মিল আছে এবং সে মিলটার কথা প্রাসঙ্গিক বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী —এই দুই ভাষাই নাগরী লিপির সাহায্যে লেখা হয়। হিন্দুস্থানীর জন্য উর্দু ও (ফারসী-আরবী লিপি) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমানে হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে যতজন উর্দু ব্যবহার করেন নাগরী ব্যবহার করেন তাহার অপেক্ষা বেশীসংখ্যক লোক।

রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার যোগ্যতার কথাও উঠিয়াছে। বাংলা ভাষার অতীত যেমন গৌরবময় বর্তমানও তেমনি সমুজ্জল। বাংলা সাহিত্য আপন ঐশ্বর্যগৌরবে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য বহু বাঙালী সাহিত্যিকের রচনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাগ্রহে অনূদিত হইতেছে। ভাবপ্রকাশের বাহন হিসাবে বাংলা যে শক্তিশালী ভাষা তাহার তো এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বয়ং গান্ধীজী বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শেষ বয়সে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুদিন পর্যন্ত অভিনিবিষ্ট পাঠার্থীর ন্যায় বাংলা শিক্ষা করেন। মাতৃভাষা হিসাবে কত লোক ইহা ব্যবহার করে সেদিক দিয়া গণনা করিলে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ইহার স্থান সপ্তম এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ তথ্য বহুদিন পূর্বেই সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হউক এ দাবি অসংকোচে উত্থাপন করা চলে। অনেকে তাহা করিয়াছেন।

ইংরাজী ভাষাই এখনও রাষ্ট্রভাষার আসনে অধিষ্ঠিত আছে। আন্তঃ-প্রাদেশিক যোগরক্ষার সেতুরূপে ইংরাজীর ব্যবহার আজও অব্যাহত। সম্প্রতি একাধিক প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ-শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজীর ব্যবহার চিরস্থায়ী হইবে না। কোনো একটি ভারতীয় ভাষা ইংরাজীর স্থান অবশ্যই গ্রহণ করিবে। তবে এই পরিবর্তনের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হওয়া অসংগত। তাঁহার মতে এই পরিবর্তনের জন্য পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে নিম্নতর শিক্ষায় প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার চলিতে থাকুক।

শিক্ষামন্ত্রীর অভিমত অনুধাবনযোগ্য। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বাহন হইবে একটি ভারতীয় ভাষা। এই ভাষাটি কি হইবে সে কথা তিনি বলেন নাই। কিন্তু সে ভাষা যাহাই হউক না কেন, তাহাই রাষ্ট্রভাষা হইবে—(অথবা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া যাহা নির্দিষ্ট হইবে তাহাই উচ্চতর শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহৃত হইবে)—এরূপ অনুমান করা অস্বাভাবিক হইবে না। এ অনুমান যদি অসংগত বলিয়া মনে না করি তাহা হইলে স্বভাবতঃই আরও একটা অনুমান আসিয়া পড়ে,—ভারত সরকার রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে এখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখিলাম সম্মিলিত জাতি সংসদে (UNO) হিন্দুস্থানী ভারতের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে অনেকে হিন্দুস্থানীর ব্যবহার শুরু করিয়াছেন, অনেকে হিন্দীর প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। কোনো কোনো প্রাদেশিক সরকার হিন্দীভাষায় সরকারী কাজকর্মও পরিচালনা করিতেছেন। অ-হিন্দীভাষীরা অনেকে হিন্দী বলিতে পড়িতে ও লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাংলা দেশেই দেখিতে পাইতেছি অনেক বিদ্যালয়ে (যেখানে প্রায় সকল ছাত্র ছাত্রী বাঙালী) নূতন করিয়া হিন্দী ক্লাস খুলিয়া হিন্দী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। আমরা যেন ধরিয়াই লইয়াছি হিন্দীটাই রাষ্ট্রভাষা হইয়া গিয়াছে। আমরা যখন বাংলা ভাষার পক্ষ লইয়া বলি, তখন যেন ঔচিত্যবোধেই বলি, মনে মনে বোধ হয় খুব জোর পাই না।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হউক, আর হিন্দী-হিন্দুস্থানীই হউক, লিপি কি হইবে তাহা আর এক সমস্যা। সর্বভারতের জন্য যদি একটি সর্বভারতীয় ভাষার প্রয়োজন হয়, একটি সর্বভারতীয় লিপিও যে আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। বরং সর্বভারতীয় একটি লিপির প্রয়োজনই সর্বাগ্রে অনুভব করি। কারণ কি বলিতেছি।

ভারতবর্ষে ভাষাবাহুল্য যে আন্তঃপ্রাদেশিক মিলনের পক্ষে অন্যতম অন্তরায় তাহা আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি। প্রদেশ বিভাগের জন্য ভাষাকেই ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিবার নীতি কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ নিশ্চয় এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে রীতিনীতি আচার-ব্যবহার শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতির দিক দিয়া স্বাতন্ত্র্য নিতান্তই অল্প, যেটুকু আছে তাহাও এত অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট যে তাহার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমা নিরূপণ অনায়াসসাধ্যও নহে সুসংগতও নহে। সেই কারণেই এদেশের সীমা নির্ধারণের উপায় হিসাবে ভাষার উপরেই নির্ভর করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য। কিন্তু সে পার্থক্য যত অধিক বলিয়া আমরা কল্পনা করি বস্তুতঃ তত অধিক কি না তাহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়।

ভারতে প্রচলিত প্রধান ভাষাসমূহের মূল এক। আর্য জাতি ভারতে প্রথম

প্রবেশের সময় যে ভাষায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতেন, ঋগ্‌বেদে যে ভাষার নিদর্শন স্থায়িরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাই আজিকার ভারতীয় প্রধান ভাষাসমূহের আদি জননী। এক হাজার বৎসর পূর্বেও হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। এবং এই সকল ভাষা যে সব প্রাকৃত-অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন, হাজার বছর পূর্বেকার সেই সকল ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মিলই ছিল বেশী। বাংলা ভাষার ইতিহাসের ছাত্রগণ জানেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যখন নেপাল হইতে আনিয়া 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রকাশ করিলেন তখন পণ্ডিতসমাজে মতবিরোধ দেখা গেল। যাঁহারা ওই দোহার ভাষাকে পুরাতন হিন্দী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বিদ্বৎসমাজে তাঁহাদের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হইয়া থাকে। আজ যা।। বাংলা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন ওই প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যে তাহাকে বাংলা বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন তাহার অবশ্য সংগত কারণ ছিল। কারণটা আর কিছু নয়। সেটা এই যে, নয় দশ শতাব্দী পূর্বে ভারতের ভাষাসমূহের মধ্যে মিল এতই অধিক ছিল যে, তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ ছিল না। ইতিমধ্যে রূপান্তর অনেক বেশী হইয়াছে। মনুষ্যজীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মধ্যেও জটিলতা বাড়িয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে এমন ঐক্য আছে যে, এক প্রদেশের অধিবাসীর পক্ষে অন্য প্রদেশের ভাষা একেবারে বিদেশী ভাষার মত দুরধিগম্য হইবে না। এই সকল প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে বহুসংখ্যক তৎসম শব্দের ব্যবহারও আছে। এক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশের কাছে যে নিতান্ত অপরিচিত ঠেকে না, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।

ভাষা বুঝিতে অসুবিধার প্রধান কারণ ধ্বনিবৈশিষ্ট্য। যে-ভাষা আমাদের অপরিচিত নহে, তাহাও বুঝিতে অনেক সময় কষ্ট হয় কেন? উচ্চারণ-পার্থক্যই তাহার কারণ। একজন বাঙালীর মুখে যে ইংরাজী বুঝি, একজন খাঁটি ইংরাজের মুখে সেই ভাষাই দুর্বোধ। তাহারও কারণ অপরিচিত উচ্চারণ। নোয়াখালি বা শ্রীহট্টের লোক বাংলা ভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু বর্ধমানবাসী বাঙালীর পক্ষে তাহার অর্থগ্রহণ সব সময় সুকর হয় না। কিন্তু কানের কাজ যদি চোখের উপর ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে অনেক অসুবিধা কাটিয়া যায়। বাংলা অক্ষরে যখন শ্রীহট্ট বর্ধমানে চিঠির আদান প্রদান হয় তখন আর অর্থবোধে বাধা হয় না।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত আর্য ভাষাগুলির মধ্যে অনেক মিল থাকিলেও এক প্রদেশের অধিবাসীর পক্ষে অন্য প্রদেশের ভাষা বুঝিতে অসুবিধা কেন হয়, তাহা দেখা গেল। যে উচ্চারণপার্থক্যের জন্য সে অসুবিধা হয়, তাহা কিছুটা দূরীভূত হইলেই বোঝা সহজ হয়, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। কাশীর

কোনো পণ্ডিত যদি ধীরে ধীরে হিন্দীতে কথা বলেন তাহা আমরা বাঙালীরা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট বোধ করি না। উড়িষ্যার লোকে যে ওড়িয়া কথা বলিতেছে, অতি দ্রুত না বলিলে, আমরা তাহা একরকম বুঝিতে পারি। আর আমার মুখের বাংলা বুঝিতেও তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতির সহিত আমাদের যোগ অল্প বলিয়াই তাহাদের ভাষা হয়তো কানে শুনিয়া বুঝিতে কষ্ট হইবে। কিন্তু এখানেও যদি কানের কাজ চোখের উপর ছাড়িয়া দিই, দেখিব সে সব ভাষাও আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি। আমরা বাঙালীরা হিন্দী শিক্ষা করি কয়জন? কিন্তু মোটামুটি হিন্দী বুঝিতে পারি অনেকে। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলে সহজে বুঝি, দ্রুত বলিলে অল্পস্বল্প বুঝি। কিন্তু নাগরী লিপি জানা থাকিলে লেখা পড়িতে অসুবিধা হয় না। পড়িয়া কাজ চালানো যায়। হিন্দী-ভাষী যে কোনো শিক্ষিত লোক নাগরী হরফে সাধু ভাষায় লিখিত বাংলা বুঝিতে অসুবিধা বোধ করিবেন না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

উল্লিখিত কয়েকটি অনুচ্ছেদে যাহা বলিতে চাহিয়াছি, তাহার তাৎপর্য এই যে, একটি সাধারণ লিপিকে সর্বভারতীয় ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভাষাবাহুল্যের জন্য বর্তমানে যে অসুবিধা ভোগ করিতেছি তাহা অনেকটা কমিয়া যাইবে। অতঃপর সর্বভারতীয় ব্যবহারের জন্য যদি কোন রাষ্ট্রভাষা নির্দিষ্ট হয় তো ভালই। একদিন না একদিন তাহা হইবেই। তখন আন্তঃপ্রাদেশিক যোগের পথ আরও প্রশস্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন এই প্রস্তাবিত সাধারণ লিপির সাহায্যেই আমরা প্রাদেশিক মিলনের ভূমিকা করিয়া রাখি না কেন! চীনদেশে রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদ কিছু কম নয়। তথাপি সেখানে যে জাতিগত একতা দেখিতে পাই একলিপি প্রচলন তাহার অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষে তাহা করা অসম্ভব বলিলেই স্বীকার করিব কেন?

এখন প্রশ্ন এই,—কোন্ অক্ষরকে এই সাধারণ লিপিরূপে ব্যবহার করা যাইবে? রোমক লিপির কথা ইতিপূর্বে বহুবার উত্থাপিত হইয়াছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিদ্বৎসভা হইতে শুরু করিয়া সাহিত্যসভা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে রোমকলিপির দাবি পেশ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। তাঁহার মত ব্যাবহারিক বুদ্ধি এবং অখণ্ডনীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রোমক লিপির পক্ষে বলিবার কি কি আছে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

রোমক বর্ণমালা A হইতে Z পর্যন্ত এই ছাব্বিশটি বর্ণেই সম্পূর্ণ। উর্দু কাশ্মীরী ও সিন্ধী ব্যতীত ভারতের তাবৎ ভাষাই সংস্কৃত বর্ণমালার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত বর্ণমালাকেই একটু আধটু এদিক ওদিক্ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ব্যবহার করা হয়। তাহাতে অযুক্ত বর্ণের সংখ্যা দাঁড়ায় ন্যূনাধিক পঞ্চাশ। কিন্তু

সংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা অনেক বেশী। ছাপাখানার সঙ্গে যাঁহাদের যোগ নাই তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হইবে যে সংযুক্ত ও অযুক্ত সকল রকম অক্ষর এবং প্রয়োজনীয় বিবিধ চিহ্ন ছাপাইবার জন্য ভারতীয় ভাষায় পাঁচ-শ হইতে সাত-শ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রকমের টাইপ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। বাংলা ও নাগরীতেই এই টাইপের সংখ্যা সম্ভবতঃ সর্বাধিক। আবার একই ভাষায় বিভিন্ন ফাউণ্টে (fount) টাইপের সংখ্যারও কিছু কিছু বিভিন্নতা হয়। বাংলায় এক একটি ফাউণ্টে প্রায় ৫৫০ টাইপ থাকে।

রোমকে বড় হাতের এবং ছোট হাতের সাধারণ ও বাঁকা অক্ষর এবং যতি-চিহ্নাদি লইয়া এক-এক ফাউণ্টে শ-দেড়েক মাত্র টাইপ। কোথায় সাড়ে পাঁচ-শ ছয়-শ সাত-শ, আর কোথায় দেড়-শ। মুদ্রণের ক্ষেত্রে টাইপের সংখ্যাল্পতার যে কি মূল্য তাহা জনসাধারণের বুঝিবার কথা নয়। যাঁহারা বোঝেন তাঁহারা সকলে তর্কযুদ্ধে নামিতে চান না। ফলে অন্য দল কণ্ঠ ও সংখ্যার জোরে যুক্তিকে নস্যাৎ করিয়া বসেন।

রোমক লিপি প্রবর্তিত হইলে ছাপার কাজ সহজ হইবে, সরল হইবে, ছাপার খরচ অনেক কমিবে।

রোমকের হরফ-সংখ্যা কম বলিয়া হরফের বৈচিত্র্য বেশী। ইংরাজী পুস্তকে যত রকমের টাইপ ব্যবহার করিবার সুবিধা পাওয়া যায়, বাংলা বা হিন্দী বা ভারতীয় অন্য কোনো ভাষার পুস্তকে তাহা পাওয়া যায় না।

ভারতীয় ভাষার টাইপ-রাইটার অনেক বাহির হইয়াছে কিন্তু এমন একটি যন্ত্রও এ-পর্যন্ত নির্মিত হয় নাই যাহা গতির দ্রুততায় এবং মুদ্রাঙ্কনসৌকর্যে ইংরাজী টাইপ-রাইটারের সহিত তুলিত হইতে পারে। দেশীয় ভাষার টাইপ-রাইটার ব্যবহার করিয়া স্বাজাতিক আত্মপ্রসাদ লাভ হইতে পারে, কিন্তু কোনো কর্মতৎপর মানুষ উহা ব্যবহার করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। দেশীয় টাইপ-রাইটারের অভাব এবং অনুপযোগিতার কথাই বরং সরকারী ও বেসরকারী মহল হইতে সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে রোমক লিপির ব্যবহার প্রচলিত হইলে ইংরাজী টাইপ-রাইটার ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাইবে।

প্রচলিত অণুলেখ (shorthand) পদ্ধতিকেই ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন অনুসারে অল্প স্বল্প পরিবর্তন করিয়া কার্যোপযোগী করা সহজ হইবে। প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের অণুলেখন পদ্ধতি প্রণয়ন করার পণ্ডশ্রম নিবারিত হইবে।

টেলিপ্রিণ্টার মারফত দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভারতীয় ভাষায় সংবাদ আদান প্রদান করা সম্ভব হইবে। বর্তমানে যেমন ইংরাজী ভাষার উপরেই দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলিকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় তখন তাহা হইবে না।

টেলিগ্রাফের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুবিধা হইবে। আন্তর্জাতিক মর্সকোড্‌কে ভারতীয় সকল ভাষায় ক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাইতে পারিব। আপন আপন প্রাদেশিক ভাষায় টেলিগ্রাফের আদান-প্রদান অনায়াসসাধ্য হইবে।

সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা, এই রোমক লিপির সাহায্যে কেবল যে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে একটি ঐক্যবন্ধনের সূত্র পাইব তাহা নহে, ওই সূত্র ধরিয়া ইংরাজী ফরাসী জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষাভাষী জাতিগুলিও আমাদের নিকটবর্তী হইতে পারিবে।

রোমক লিপি প্রবর্তনের দাবি অখণ্ডনীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক বিচার অপেক্ষা ভাবাবেগের আবেদন প্রবলতর। এক ভ্রান্ত জাতীয়তাবোধ রোমক হরফ গ্রহণে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

রোমক লিপির যখন এই অবস্থা, তখন আর কোন্ লিপির শরণাপন্ন হওয়া যায়? রোমক লিপির পর স্বভাবতঃই নাগরী লিপির কথা আসে। ভারতবর্ষে প্রদেশসমূহের মধ্যে ভাষাগত যোগাযোগ রক্ষার পক্ষে ইহার যোগ্যতাও অল্প নয়। কোনো কোনো দিক্ দিয়া রোমানের অপেক্ষাও অধিক।

১. (ক) নাগরী লিপি বিদেশীয় নহে। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম লিপির নাম ব্রাহ্মী লিপি। এই লিপিই আর্যাবর্তে তিনটি রূপ ধারণ করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে ইহার যে রূপ তাহার নাম শারদা। দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে ব্রাহ্মী যে রূপান্তর ধারণ করে, তাহার নাম হয় নাগর। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই লিপি যে রূপ গ্রহণ করিল তাহার নাম হইল কুটিল। ভারতে প্রচলিত প্রত্যেকটি আর্যভাষারই লিপি ব্রাহ্মী লিপির উল্লিখিত তিনটি রূপের কোনো-না-কোনো একটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

(খ) ভারতবর্ষে মালয়ালম্, তামিল, তেলুগু, কানাড়ী প্রভৃতি যতগুলি দ্রাবিড়ী ভাষা প্রচলিত আছে। তাহাদেরও লিপি ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত। সুতরাং আর্যভাষার অন্যান্য লিপির ন্যায় এই সকল দ্রাবিড়ী ভাষার লিপিও নাগরীর সহিত ভগিনীসম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

২. (ক) আর্যভাষাভাষী সমগ্র ভারতবর্ষে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় নাগরী বর্ণমালার সহিত তাহার কোনো অনৈক্য নাই। অর্থাৎ ওড়িয়া, বাংলা, গুজরাটী, গুরুমুখী প্রভৃতি আর্যগোষ্ঠীর সকল ভাষারই বর্ণমালা এক।—অ হইতে ঔ স্বরবর্ণ, ক হইতে হ ব্যঞ্জনবর্ণ।

(খ) দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণ ভারতের বর্ণমালার সঙ্গেও নাগরী বর্ণমালার কোনো অনৈক্য নাই। অক্ষরের নাম, সংখ্যা এবং ক্রম প্রায় একই। কেবল তামিলে বর্ণসংখ্যা কিছু কম।

সুতরাং ভাষার দিক্ দিয়া অল্প বিস্তর বিভিন্নতা থাকিলেও শতকরা ৯৩ জন ভারতীয়ের বর্ণমালা অভিন্ন অর্থাৎ নাগরী বর্ণমালার সমান।

৩. হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা নাগরী লিখে। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা নয় অথচ গৌণভাষারূপে ব্যবহার করে—যে হিসাব ধরিয়া অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় প্রায় ২৫ কোটি আর্যভাষাভাষীর মধ্যে ১৪ কোটি লোককে হিন্দীভাষী বলিয়াছেন—তাহারাও অনেকে নাগরী লিপিই ব্যবহার করিয়া থাকে। মৈথিলী ভাষার বই নাগরীতে ছাপান হইতেছে। গুজরাটীর স্বতন্ত্র লিপি থাকিলেও, নাগরীর সহিত তাহার পার্থক্য অত্যন্ত অল্প। বস্তুতঃ এমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ যে গুজরাটী জানে অথচ নাগরী পড়িতে পারে না। বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটীভাষী লোকের সংখ্যা অল্প নয়। কিন্তু বিজ্ঞাপনে, প্রাচীরপত্রে, স্টেশনের নামের বোর্ডে—সর্বত্রই নাগরীর চলন।

৪. হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা নয় এবং গৌণভাষা হিসাবেও যাহারা হিন্দী ব্যবহার করে না এমন অনেক লোক নাগরী ব্যবহার করে, অন্ততঃ নাগরী লিপি লিখিতে পড়িতে শিখে। সংস্কৃত ভাষা যাহারা পড়ে তাহাদের মধ্যে এমন অল্প লোককেই পাওয়া যাইবে নাগরী লিপি যাহাদের নিকট অপরিচিত। আমাদের দেশেই তাহার দৃষ্টান্ত আছে। বাংলা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণী হইতে সংস্কৃত পড়ানো হয় নাগরী লিপির সাহায্যে। সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এই প্রদেশের অল্পশিক্ষিত লোকও—অর্থাৎ যাহারা অন্ততঃ সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছে—নাগরী লিপির সহিত পরিচিত। লিখিতে না পারিলেও পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

দক্ষিণ ভারতেও, যেখানে হিন্দীর প্রচলন নাই বলিলেই হয় এবং যেখানকার ভাষার সহিত হিন্দীর তেমন কোনো যোগ নাই, সংস্কৃতচর্চার সুযোগে নাগরী অল্পবিস্তর পরিচিত।

৫. ইতিপূর্বে নাগরী জানার সুযোগ না ঘটিলেও যে কোনো আর্যভাষাভাষী অথবা তামিল তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষাভাষী শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নাগরী লিপি আয়ত্ত করা কঠিন নহে। ১ ও ২ সংখ্যক কারণ দ্বারা এ মন্তব্য সমর্থিত হইবে।

এখন যদি স্বীকার করিয়া লই যে সর্বভারতীয় লিপি হিসাবে নাগরীর দাবিই অগ্রগণ্য, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কর্তব্য কি হইবে?

সকলপ্রদেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে নাগরী লিপি ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য প্রচার আবশ্যক। নাগরীপ্রচারিণী সভা ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে আপন অস্তিত্ব অনুভূত করাইতে পারিয়াছেন কিনা জানি না, বোধ হয় পারেন নাই। কিন্তু সেটা করাই সর্বাগ্রে দরকার। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী শিক্ষিত কর্মিদল সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্যে প্রচার করিতে পারিলে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। যদি কেহ ইহাকে দলীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে

করেন তো সে ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। লিপিসম্পর্কে সকল প্রদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত সংগ্রহ, সংকলন এবং সমালোচনা করাও এই সভার অন্যতম কর্তব্য হইবে। সকল পক্ষের মতামত সকলের কাছে তুলিয়া ধরাই ঔদার্যের পরিচায়ক। নাগরীপ্রচারিণী সভা অথবা দুই একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপরেই সমস্ত দায়িত্ব সমর্পণ করিলে ঠিক হইবে না। শিক্ষিত জনসাধারণকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। দেশের শিক্ষকসমাজ এদিকে অনেক সাহায্য করিতে পারেন। প্রাথমিক চারিটি শ্রেণীতে ইংরাজী পড়ানো বন্ধ হইয়া গেল। ইংরাজীর জন্য বিদ্যালয়ের সময় কম যাইত না। বালকবালিকাদের যে সময় এবং শ্রম অহেতুক ব্যয় হইয়া যাইত সেই সময়ের একটা ভগ্নাংশমাত্র দিলেই অনেকটা কাজ হইবে। যে শ্রেণীতে A B C D পড়ানো হইত সেই শ্রেণীতে নাগরী अ आ क ख শিখানো অনেক সহজ। প্রাথমিক তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে একটুখানি সময় দিলেই ছেলে-মেয়েদের লিপি পড়ানো এবং লেখানো অনায়াসে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি লিপিশিক্ষা আরম্ভ হয় তো গোড়া-পত্তনটা ভাল হইতে পারে। আমার বিশ্বাস শিক্ষকসমাজ যদি সাধারণ লিপি প্রচলনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন তো এ কাজ তাঁহারা সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এখন শিক্ষাবিভাগ এদিকে দৃষ্টি দিলেই হয়। প্রত্যেক প্রদেশেরই সরকারী শিক্ষাবিভাগ নূতন শিক্ষাবিধি রচনার সময় এই লিপি শেখানোর আবশ্যকতা যেন স্মরণ রাখেন। অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই সাধারণ লিপিও যেন একটি শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সঙ্গে আর একটি কাজ করিতে পারিলে ভাল হয়। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার প্রসিদ্ধ পুস্তক দুই চারখানি করিয়া নাগরীতে ছাপাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। শখ করিয়া কেহ কেহ এ পরীক্ষা করিতে পারেন কিন্তু এ-কাজ ঠিক ব্যক্তিবিশেষের কাজ নয়, প্রতিষ্ঠানের কাজ। বিশ্বভারতীর কথা ধরুন। বিশ্বভারতী যদি বাংলা ভাষা যেমন আছে তেমনি রাখিয়া রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত বই নাগরী লিপিতে প্রকাশ করেন তো খুব সহজেই নাগরীলিপি প্রচারের একটা সুযোগ হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী এমন অনেক বাঙালী আছেন, যাঁহারা নাগরীলিপিতে রবীন্দ্র-রচনাবলী পাইলে আগ্রহের সহিত পড়িবেন। রবীন্দ্রসাহিত্য সর্বজনগম্য করিবার জন্য বিশ্বভারতী একবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, আর একবার করিতে পারেন। বাংলা এবং আসামের পক্ষে ইহাতে একটা লাভ হইবে। বাংলা ও আসামের অধিবাসীরা পরিচিত জিনিস অল্পপরিচিত লিপিতে পড়িবার সুযোগ পাইবেন। ইহাতে অল্পপরিচিত লিপি অতি-পরিচিত হইয়া উঠিবে।

বাংলা দেশে অনেক বড় বড় প্রকাশক আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ-চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম লেখকদের রচনা পর্যন্ত যে বাংলা হইতে হিন্দীতে বহুসংখ্যক অনূদিত হইয়াছে তাহা হয়তো তাঁহারা জানেন না। আমার

বিশ্বাস, খুব জনপ্রিয় বইয়ের অনুবাদ না করিয়া শুধু লিপ্যন্তরিত করিয়া ছাপাইলে কিছু চাহিদা পাওয়া যাইবেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাধিকার নাগরী লিপিতে বাংলা পুস্তক মুদ্রণের আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতির অভিভাষণে বাংলা ভাষা প্রসারের উপায় হিসাবে তিনি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মনে হইতেছে। সে প্রস্তাব কেহ কার্যে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

উর্দু ভাষীর সংখ্যা ভারতে নিতান্তই অল্প, আর্যভাষাভাষিগণের তুলনায় নগণ্য। উর্দু ভাষা যাঁহারা বলেন, উর্দু হরফও তাঁহারাই ব্যবহার করেন একথা মানিয়া লইলে উর্দু লিপির ব্যবহারও সেই অনুপাতে কম, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য যখন একটা লিপির কথা বলিতেছি তখন অত্যল্প-সংখ্যক লোকের ব্যবহৃত এই লিপির কথা তোলা আদৌ সংগত কিনা তাহা বুঝিতে পারি না। তবু কথা যখন কথা উঠে তখন তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। অন্যান্য গুণে যদি তাহা সমৃদ্ধ হয় অপরিচয়ের দোষটা না হয় উপেক্ষা করাই যাইবে। সুতরাং সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হওয়া যাক্।

প্রথমতঃ উর্দু লিপির উৎপত্তির ইতিহাসটা আমাদের জানা দরকার। ভারতবর্ষে উর্দুর কোন ঐতিহ্য নাই। মোগল-পাঠানের মত ইহারাও বহিরাগত। মুসলমানগণের ভাষা ছিল ফারসী এবং লিপিও ছিল ফারসী। তবে তাঁহাদের ফারসী ভাষায় যেমন আরবী প্রভাব পড়িয়াছিল লিপিতেও তেমনি। সেই আরবী প্রভাবান্বিত ফারসী লিপি মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে আসে। এই লিপিমালার সহিত আর কিছু অক্ষর যোগ করিয়া হিন্দীভাষা লিখিবার একটা কাজ চালানো লিপিমালা তৈয়ার করা হয়। ফারসী অক্ষরে হিন্দীর সকল ধ্বনি প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলিয়া অন্য অক্ষর কিছু কিছু যোগ করা আবশ্যক হইয়াছিল। এই লিপিমালারই নাম হয় উর্দু।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী এই দুইটি লিপিই প্রচলিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে এই প্রাচীন ভারতীয় খরোষ্ঠী লিপি হইতে উর্দুর উদ্ভব। কেবল উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খরোষ্ঠীর এবং বাকী সমস্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মীর প্রচলন ছিল। খরোষ্ঠী লিপি আর্যলিপি নহে ইহাই পণ্ডিতদের মত। তাঁহারা বলেন সেমেটিক আরমায়িক লিপির সহিতই এ লিপির সম্বন্ধ। প্রাচীনকালে ইরানীয়গণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। উঁহাদের লিপি ছিল আরমাইক। এই আরমাইক লিপিমালার আধারে স্থানীয় ভারতীয় ভাষার উপযোগী করিয়া নূতন কিছু অক্ষর সংযোজনপূর্বক এক লিপিমালা রচিত হইয়াছিল। এই লিপিমালা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে ওই লিপির ব্যবহার ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যায় এবং উহার স্থলে ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত এক বা একাধিক লিপির প্রচলন শুরু হয়। ত্রয়োদশ

শতাব্দীতে মুসলমানদের ভারতে আগমন হয়। ওই সঙ্গে সঙ্গে ফারসী ভাষা এবং ফারসী লিপিও আসে। তাহারই উপর উর্দুর প্রতিষ্ঠা, ভারতের পুরাতন খরোষ্ঠী লিপির সহিত ইহার কোনো ধারাবাহিক সম্বন্ধ নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে উর্দু এবং খরোষ্ঠী ইহাদের মূল এক। খরোষ্ঠী দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত, উর্দুরও সেই রীতি। তবু ভারতীয় লিপির ইতিহাসে উর্দু অর্বাচীন, নাগরীর ন্যায় প্রাচীন নহে। সুতরাং ভাবাবেগের দিক দিয়া উর্দুর প্রতি ভারতবর্ষের আকৃষ্ট হইবার কোনো কারণ নাই।

ব্যাবহারিক সৌকর্যের দিক দিয়া বিচার করিলেও উর্দুর পক্ষে বলিবার কিছু থাকে না তাহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রধান কারণগুলি এই।—

১. উর্দু যে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করে নাই তাহার পক্ষে এ লিপি শিক্ষা করা কঠিন এবং উর্দু লিপি বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করে না এমন লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় চুরানব্বই।

২. শতকরা ৯৪ জন লোক সাধারণতঃ যে লিপিতে অভ্যস্ত সে লিপির সহিত ইহার কোনো যোগ নাই। কি ক্রমের দিক্ দিয়া, কি অক্ষরসংখ্যার দিক্ দিয়া, কি লিখনভঙ্গীর দিক্ দিয়া—কোনো দিক্ দিয়াই অধিকাংশ ভারতবাসীর ব্যবহৃত লিপিসমূহের সহিত উর্দু লিপির মিল নাই। অধিকাংশ ভারতবাসীর লিপি দক্ষিণমুখী। উর্দুলিপি বামমুখী। ভারতীয়েরা আজ পর্যন্ত যে রাষ্ট্রভাষা চর্চা করিয়া আসিয়াছে তাহার লিপিও দক্ষিণমুখী, বামমুখী নয়।

৩. উর্দু লিপিমালার ক্রমবিন্যাসের মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা নাই।

৪. স্বরবর্ণের ব্যবহারে নিয়মের একান্ত অভাব।

লোকে যে লিপিতে মাতৃভাষার চর্চা করে, রাষ্ট্রলিপি যদি তাহার সগোত্র হয় তবেই সেটা শিক্ষা করা তাহার পক্ষে সহজ ও সুবিধাজনক হয়। কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রলিপি করিতে গেলে তাহা হইতেই পারে না।

ইহা শিক্ষা করা কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ফলও বটে। সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্য-সম্পদ, তাহার সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস, তাহার ধ্যান-ধারণা চিন্তা ও অনুভূতির কথা যে লিপিতে রচিত আছে এই ফারসী-আরবী লিপির সহিত তাহার কোনো সংযোগই নাই। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন :

"...It is absolutely unnecessary to force the Perso Arabic script upon the Indian body politic as the other compulsory script for the proposed Persianised Hindi (Hindustani) as the National Language ... I would consider the time and energy spent in acquiring that most unscientific and, for

the average Indian individual, practially a useless script, the Perso-Arabic, to be a costly waste..."

ইহার তৎপর্য এই ঃ

হিন্দুস্থানী নামে হিন্দী ভাষার যে ফারসী রূপকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার জন্য ফারসী-আরবী লিপিকে অন্যতম আবশ্যিক লিপিরূপে জোর করিয়া ভারত রাষ্ট্রের উপর চাপাইয়া দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক। এই লিপি শিক্ষা করিতে যে সময় এবং যে উদ্যম ব্যয় করিতে হইবে, আমার মতে তাহা সাংঘাতিক অপব্যয়। কারণ, এ লিপি একে তো কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা ছাড়া ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে ইহা নিতান্তই নিরর্থক।

শব্দগত স্পর্শদোষ

'Contamination of words'—এখানে Contamination-এর বাংলা কি হবে এ নিয়ে কথা উঠেছিল। আমার প্রথমে মনে হয় যে সম্-কৃ দিয়েই কাজ চলবে। তাই 'contamination of words' এই শব্দসমষ্টির প্রতিশব্দ দিতে চেয়েছিলাম 'শব্দসাংকর্য'। সংকর শব্দটা যেমন সাধারণ অর্থে confusion বোঝায় তেমনি এর একটা বিশেষ অর্থও আছে। সেটা হচ্ছে দুই বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর মিলনে উৎপন্ন তৃতীয় এক জাতি। শব্দের ক্ষেত্রেও সংকর শব্দের এই রকম একটা সুনির্দিষ্ট বিশেষ অর্থ এসে যেতে পারে—দুই ভিন্ন ভাষার শব্দের একত্রীভবন। 'স্কুলপাঠ্য', 'গ্যাসালোক' প্রভৃতি শব্দকে সংকর শব্দ বলা যেতে পারে। 'contamination' বললে যতটা বোঝাবে, 'শব্দসাংকর্য' বললে হয়তো ঠিক ততটা প্রকাশ পাবে না। এইজন্য পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসু হই। 'স্পর্শদোষ' শব্দটি তাঁরই দেওয়া। ভাষাতত্ত্বে 'contamination' শব্দের অর্থও যেমন ব্যাপক 'স্পর্শদোষে'র অর্থও তেমনি।

অক্সফোর্ডের স্পূনার সাহেবের সম্বন্ধে গল্প শোনা যায় যে তিনি নাকি কথা বলতে গেলেই শব্দে শব্দে গুলিয়ে ফেলতেন। তাঁর জিহ্বাটা ছিল একটু অবাধ্য রকমের। তাঁর এই অবাধ্য জিহ্বা কোনো-কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এমনতর এক একটা কাণ্ড করে বসেছে যে আজকের দিনে সে-রকম একটা কিছু ঘটলে বড় সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত না। কোনো ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে ভদ্রলোক একটি কুমারীকে অকস্মাৎ অনুরোধ করে বসলেন, "Miss, will you kindly *take me*?" "take me" বলাটা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি বলতে

চেয়েছিলেন, "Miss, will you kindly make tea?" তা তাঁর মনে যাই থাক না কেন প্রকাশ করে যা বলেছিলেন তার উত্তর পেয়েছিলেন এবং সে উত্তরটি তাঁর পক্ষে দুঃখের কারণ হয় নি।

শব্দের উচ্চারণক্ষেত্রে এই ধরনের ভুল আমরাও কম করি না। পাশা-পাশি দুই শব্দ তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করতে গিয়ে উদোর পিণ্ডি অনেক সময়ই বুধোর ঘাড়ে চড়িয়ে দিই—কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বা অজ্ঞাতসারে। কিন্তু এ ধরনের জিনিস ভাষায় কখনো স্থায়ী আসন পেতে পারে না, এক কৌতুকপ্রসঙ্গ ছাড়া। খুব খানিকটা ঘুরে ফিরে এসে যার 'সুখখানি যায় মুকিয়ে' সে অনেক সময় 'এক চাপ্ কা' খেয়ে শ্রান্তি দূর করতে পারে। কিন্তু কাগজ কলম নিয়ে কারবার যাদের তাদের প্রয়োজন বেশী এক কাপ্ চায়েরই। হাস্য-রসের অবতারণায় এ-সব কখনো কখনো আবশ্যক হয়, তা না হলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠীরা তাঁকে 'কশুরে জৈ' বলে জ্বালাতন করবেন কেন? বাংলায় এ-ধরনের শব্দদুষ্টি প্রায়ই দেখা যায়। ইংরেজীতে স্পূনার সাহেবের নামানুসারে একে স্পূনারিজম্ বলা হয়।

এ-ধরনের অবাধ্যতা প্রায় সকলের জিহ্বাই কখনো না কখনো করে থাকে কিন্তু কারও জিহ্বা এত অসংযত যে প্রায়ই সীমা লঙ্ঘন করে বসে। আমার এক বন্ধু কাপড় কদাচিৎ পরেন, 'কাপর পড়াই' তাঁর অভ্যাস। তাঁর বৈকালীন জলখাবারের মধ্যে 'শিঙারা কচুড়ি' থাকা চাই-ই।

শব্দের এমন রূপ-বিকৃতি ঘটে কেন? তার কারণ আমাদের বাগ্‌যন্ত্রটাও একটা যন্ত্র। স্প্রিঙে-চলা ঘড়ির বড় কাঁটা ও ছোট কাঁটা যেমন মধ্যে মধ্যে জড়িয়ে যায়, মনে চলা আমাদের এই বাগ্‌যন্ত্রেরও অবস্থা হয় কখনো কখনো সেই রকম। একাধিক কথা বা ভাব মনের মধ্যে জমবার অবসর পেলেই সেগুলো বেরোবার সময় হুটোপুটি করবে, ছুটির ঘণ্টা পড়লে স্কুলের একটি মাত্র দরজা দিয়ে বেরোবার সময় ছেলেরা যেমন ভিড় করে। বাড়ি যাবার তাড়ায় রামের ধারাপাত যায় শ্যামের ব্যাগে কিন্তু শ্যামের দ্বিতীয়ভাগখানা রামের বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। একজনের চিঠি অপরের খামের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে কত লোকের কত অনর্থ যে ঘটিয়েছে তার হিসেব কে রাখে? এ আর কিছু নয়, এক ধরনের অন্যমনস্কতা। দুটো ভাবের গোলমালে এই অন্যমনস্কতার সৃষ্টি। আজ যা আকস্মিক তাই আবার একদিন নিত্য হয়েও দাঁড়াতে পারে। স্পর্শদুষ্ট শব্দও তেমনি কখনো কখনো ভাষায় স্থান পেয়ে যায়।

মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের যে অচ্ছেদ্য যোগ আছে, আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পলের (Paul) নাম এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,—

"We call the process 'contamination' when two synony-

mous or similar sounding forms or constructions force themselves simultaneously or at least in the very closest succession, into our consciousness, so that one part of the one replaces, or it may be ousts, a corresponding part of the other: the result being that a new form arises in which some elements of the one are confused with some elements of the other."

এর তাৎপর্য এই,—যখন একার্থবোধক বা অনুরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট দুটি শব্দ বা বাক্য যুগপৎ বা উপর্যুপরি আমাদের চৈতন্যকে অধিকার করবার জন্য উদ্যত হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একটির অংশ-বিশেষ অপরের অনুরূপ অংশের সঙ্গে স্থান বিনিময় করে বা ওই অংশকে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত করে। এই দ্বন্দ্বের ফলে উভয়ের কিয়দংশকে বিপর্যস্ত করে একটি অভিনব শব্দ বা বাক্যের উদ্ভব হয়। এই বিকৃতির প্রণালীকেই স্পর্শদোষ বলা যায়। আমরা এখানে শুধু স্পর্শদুষ্ট শব্দের কথাই আলোচনা করব।

স্পর্শদুষ্ট শব্দের জাতি হিসাব করতে গেলে স্বয়ং মনুকেও হার মানতে হবে। আমরা মোটামুটি কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করে সংক্ষেপে তাদের কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইংরেজীতে যাকে স্পূনারিজ্‌ম্‌। স্বনামধন্য স্পূনার সাহেবের নামেই এই শ্রেণীর নামকরণ। 'কশুরে জৈ', 'শিঙারা কচুড়ি' প্রভৃতি বাংলার স্পূনারিজ্‌ম্‌।

দ্বিতীয় শ্রেণীর স্পর্শদুষ্ট শব্দের উদাহরণ হবে মনোরথ। মনোরথ শব্দটা বাংলায় তো চলবেই কেন-না সংস্কৃতেও ওটা চলে। এর স্পর্শদোষটা ঘটেছে সংস্কৃত থেকেই, বাংলায় এসে নয়। আসল শব্দটা ছিল 'মনোঽর্থ'। অপরিচয়ের ফলে শব্দটা আমাদের নূতন ঠেকবে হয়তো। মনোঽর্থ (মনঃ+অর্থ) মনের উদ্দেশ্য বা অভিলাষ। একদা মনোরথ অধিকার করে বসল মনোঽর্থের স্থান। তাই মনোরথ সিদ্ধ হোক্ প্রভৃতি প্রয়োগ ভাষায় চলে গেলেও বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে গোলমাল ঠেকে। সেই জন্যই কারও কারও মনোরথ সিদ্ধ না হয়ে পূর্ণ হয়।

এ রকম স্পর্শদুষ্টি ঘটে কেন? কারণ, পদ বা পদাংশ পরিবর্তিত হয়ে কখনো কখনো নব নব রূপ ধারণ করে, যদি পূর্ব ও পরিবর্তিত শব্দের মধ্যে বেশ একটা ধ্বনিগত সাম্য থাকে। কিন্তু শুধু ধ্বনির মিল নয়, অর্থেরও মিল কিছু থাকা চাই। এখানে মনোরথ অর্থের দিক্ দিয়ে মনোঽর্থের কাজ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিচ্ছে, অন্ততঃ তার অযোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। আর এদিকে উচ্চারণের মিল তো আছেই। স্পর্শদুষ্ট হলেও ভাষার ক্ষেত্রে এঁরা একেবারে অনাচরণীয় নন।

ধ্বনিসাম্যের ফলে আর এক রকম স্পর্শদোষের উদ্ভব হয়, কিন্তু এগুলি

কৌতুকপ্রসঙ্গ ছাড়া ভাষায় অল্পই ব্যবহৃত হয়। ছোট ছেলেরা কখনো কখনো এ-ধরনের শব্দ ব্যবহার করে বসে কিন্তু তার জন্য শাস্তিও পেতে হয়। 'protractor' ব্যতীত 'protector' দিয়ে যে জ্যামিতির চিত্র আঁকা যায় না 'mathematic' এর শিক্ষক মহাশয়ের বেত্রদণ্ড তা বারংবার বুঝিয়ে দেয়। আমরা ঠাট্টার ছলে মাতালের নামানুসারে চা-খোরকে 'চাতাল' বলি। জনৈক অভিভাবক সেদিন কোনো অধ্যাপককে বলছিলেন যে তাঁর পুত্র ইংরেজীতে একটু 'deficit', ছেলেবেলা থেকে নিজে তো পড়ানোর সময় পান নি! কাঠের ও টিনের মিস্ত্রিরা 'রিপিট' (rivet) করে কাঠ বা টিন জোড়ে। মিস্ত্রি-সমাজে 'রিপিট' কথাটা খুব চলে গেছে। 'ডায়মল' (diamond) কাটা বাজু ও 'পায়নাফুলি' (pine apple) শাড়ি স্কুল-কলেজে-পড়া মেয়েরাও মাঝে মাঝে পরে থাকেন। নবোদ্ভাবিত 'পিটুনি' পুলিস খবরের কাগজ মারফত দেখছি বাংলার পল্লীগ্রামেও বাসা বাঁধল। 'মালসি' (M. L. C.) ও তাই। এটা বোধ হয় এম্. এল্. সি. ও মালসা এ দুটো শব্দের ধ্বনিসহযোগে গঠিত।

mango শব্দটা আমাদের খুব পরিচিত, তাই magnolia লোকমুখে ম্যাঙ্গো-লিয়া হয়ে যায়। অনুরূপ কারণে signal এর বদলে 'সিঙ্গল' ডাউন হয়।

অজ্ঞতা, উপেক্ষা বা অনবধানতা হেতু ব্যাকরণের নিয়ম উল্লঙ্ঘন শব্দবিপর্যয়ের আর একটি কারণ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের রচনাতেও এই ধরনের বিপর্যস্ত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। স্বাধীনচেতা মধুসূদন কেবল শ্রুতিমধুর হবে বলে বরুণানী না লিখে বারুণী লিখেছিলেন। মনে মনে আশঙ্কা নিশ্চয় ছিল চলবে কি না। বারুণী শব্দটার সঙ্গে পূর্বপরিচয়ই এখানে স্পর্শদোষ সংঘটন করেছে, এই রকম অনুমান হয়। শরৎচন্দ্র 'লইয়াছি'র স্থানে 'নিয়াছি' লিখেছেন, 'দিয়াছি'র প্রভাবে সম্ভবতঃ। এটাকে analogy র উদাহরণ বলা চলতে পারে। ভাষার নিয়মানুমোদিত না হলেও নিয়াছি-টা চলে গেছে। অনেক লেখকই আজকাল নিয়াছি লিখছেন। দিলীপকুমার গাইতে-র স্থলে 'গেতে' ব্যবহার করেছেন।

একার্থবোধক শব্দ ও প্রত্যয়াদির যোগে প্রায়ই পুনরুক্তির সৃষ্টি হয়। কারণ, যা উক্ত তাও অনেক সময় অনুক্ত বলেই প্রতিভাত হয়। 'অদ্যাপিও' (অদ্য+অপি+ও) —এর 'অপি' এবং 'ও' এই দুইটি অব্যয়ই একার্থবাচক, কিন্তু 'অদ্যাপিও' ব্যবহার করেন যাঁরা, তাঁদের মন অদ্যাপির অর্থ 'অদ্য'র চেয়ে কিছু বেশী বলে গ্রহণ করে না। ধরে দিলে বলবেন—ও তাই তো! 'আয়ত্তাধীন' 'কিয়ৎ-পরিমাণ' 'কেবলমাত্র' প্রভৃতি শব্দও এই শ্রেণীতে পড়ে। 'উদ্বেলিত' 'অধীনস্থ', 'সশঙ্কিত', 'নিঃশেষিত' 'সকৃতজ্ঞচিত্তে' প্রভৃতি শব্দকেও এই শ্রেণীরই অন্তর্গত করা যায়। উপরের শব্দগুলিতে যে সব প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ 'অনাবশ্যকীয়'। অধীনস্থ শব্দটি fallen vacant under your kind disposal স্মরণ করিয়ে দেয়। এ রকম ভুল বাঙালীর মুখে ও হাতে প্রায়ই বেরোয়। আমরা যখন যার

'under-এ' কাজ করি তখন তার। আবার তার কাছ থেকে চলে গেলে তারই 'against-এ' জটলা পাকাই। ভ্যাইসচ্যান্সেলরের কাছে আবেদন পাঠাতে হলে রেজিস্ট্রারের 'through দিয়ে' পাঠাতে হয়। ইংরেজী preposition-এর গায়ে বাংলা post position-এর হরিহর রূপ। ব্যাকরণের ধর্মাধিকরণে এই অপরাধ দণ্ডবিধির আমলে আসতে পারে কিন্তু 'সৌজন্যতা'-বোধে এ সবও উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। দেখা যায় 'নিরপরাধী' ও 'নির্বিরোধী' লোকেই বেশীর ভাগ ধরা পড়ে। 'অংশীদার' 'ভাগীদার' জ্ঞাতি 'সাবধানী' লোককেও 'সদাসর্বদা' ফাঁকি দেয়। 'গুরুতর' কথার সময়ও আমরা গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারি না। শ্রেষ্ঠকেই যখন মর্যাদা দি তখন 'শ্রেষ্ঠতম'কে অবজ্ঞা করি কেমন করে? ইংরেজীতেও innermost প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়।

বিদেশী শব্দ বাংলায় এসে যখন জাত হারায় তখন তার যে রূপ হয় সেটি ভারী মজার। সে-রকম স্পর্শদুষ্ট শব্দের কয়েকটি উদাহরণ আগে দিয়েছি, এখানে আরও কয়েকটি দিচ্ছি। 'নাবালক' কথাটি ফারসী নাবালিগ্ শব্দের বাংলা রূপান্তর। বালিগ্ শব্দটা একে অপরিচিত, তাতে আবার বালক শব্দের সঙ্গে ধ্বনির মিল আছে। সুতরাং না-বালিগ্ দাঁড়াল 'নাবালক' হয়ে, যদিও শব্দের আকৃতি ও অর্থ হয়ে গেল পরস্পর-বিরুদ্ধ। অবশ্য 'অমন্দ'র নজিরে 'না' স্বার্থে প্রযুক্ত বলতে পারি। 'নাবালকে'র দেখাদেখি 'সাবালক'। এই প্রসঙ্গে 'লালটিন' কথাটা উল্লেখযোগ্য। লণ্ঠন (lantern) কে পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে 'লালটিন' বলে। লণ্ঠনটা তৈরী হয় সাধারণতঃ *টিনে* তাই (tern) ঠন-টার স্থান সহজেই অধিকৃত হল 'টিন' দ্বারা এবং নিরর্থক লন শব্দটার জায়গায় এসে বসল 'লাল'। লাল শব্দটার সার্থকতাও হয়তো কিছু ছিল। এদেশে যখন হারিকেন লণ্ঠন প্রথম আমদানি হয় তখন *টিন* ও পিতল উভয় ধাতুর লণ্ঠন আসত। আজকাল পিতলের লণ্ঠন খুব কম দেখা যায়। পিতলের রংটার সঙ্গে লাল শব্দটার যোগ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে একই লণ্ঠন 'লাল' এবং 'টিন' দুই-ই হতে পারে না। 'লালটিন' স্পর্শদোষের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

আর এক রকম শব্দের কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। ইংরেজীতে এই ধরনের স্পর্শদুষ্ট শব্দকে বলে portmanteau words। উদাহরণ দিলে এটা সহজে বোঝা যাবে। প্রথমে একটা ইংরেজী শব্দই বলি। potatomato শব্দটি নূতন বেরিয়েছে। ওদেশের কোনো উদ্ভিদ্‌তাত্ত্বিক আলু ও বিলিতিবেগুন মিলিয়ে এক অভিনব ফল তৈরি করেছেন। তারই নাম দিয়েছেন potatomato। বাংলা রূপকথাটি সম্ভবত এই রকমের রূপক ও কথা এই দুইটি শব্দ সহযোগে গঠিত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিকে 'উত্তরান্তি' বলতেও শোনা যায়। একটি দোকানের নাম দেখলাম বিশ্বাম্বর (বিশ্বম্ভর+অম্বর) স্টোর্স। আর একটি খাবারের

দোকানের 'বিশালক্ষ্মী' মিষ্টান্নভাণ্ডার এই নাম দেখেছি। বিশালক্ষ্মীর আসল রূপ যে বিশালাক্ষী তাতে সন্দেহ নেই। তবে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে লক্ষ্মীর। আমাদের টালিগঞ্জ আর আমেরিকার হলিউড মিলে 'টলিউড' হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ওড়িয়া 'প্রাকর্ম' শব্দটির কথা মনে পড়ে। প্রাচীন ওড়িয়ার পরাক্রম শব্দটি বানান ভুল করে 'প্রাকর্ম' লেখা হত। বানানের সঙ্গে মানেও গেল বদলে। নূতন শব্দের নূতন মানে হল অদৃষ্ট। এই শব্দটি দেখলে মনে হয় স্পর্শদোষ ঘটেছে প্রাক্তন ও কর্ম এই দুই শব্দের মধ্যে।

বিশ্বভারতীতে সম্প্রতি (১৯৬৪) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের জন্যে যে একটি বৃহৎ গৃহ নির্মিত হয়েছে তাকে Administrative building বলা হয়। রিক্শওয়ালাদের মুখে ওটির নাম হয়েছে হেডমিস্ত্রী ভবন। কলাভবন সংগীতভবন বিদ্যাভবন প্রভৃতির প্রভাবে বিল্ডিং হয়েছে ভবন। এখানে মানেটার হানি হয় নি। কিন্তু নামের প্রথম অংশে প্রধানতঃ ধ্বনিটাই ক্রিয়া করছে। তাই ministrative-টা মিস্ত্রিতে পরিণত হয়ে গেল। তবে ad টা যে হেড হয়েছে এটা নিতান্ত নিরর্থক হয় নি। হেড বলতে যে প্রধান বোঝায় একথাটা নিতান্ত অশিক্ষিত লোকও জানে। যে রিক্শওয়ালাদের কথা বলছি তারা জানে এ বাড়ীতে যাঁরা বসেন তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের 'হেড'।

ইংরেজী বানানের মধ্য দিয়ে যে সব ভারতীয় নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে বাংলা বানানে তারা নবরূপ ধারণ করে। কেরল হয় কেরালা। স্বস্তিক হয় স্বস্তিকা।

ইংরেজীতে সংস্কৃত কেন Sanskrit হল, প্রাকৃত কেন Prakrit হল? তার কারণ ইংরেজরা যে পশ্চিম ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃতের পাঠ প্রথম গ্রহণ করেন তাঁরা উচ্চারণ করেন 'সংস্কৃত্' 'প্রাকৃত্'। ভারতীয় উচ্চারণের স্পর্শদোষ সংক্রমিত হয়েছে ইংরেজী নাম দুটিতে। তা না হলে শব্দ দুটির শেষে একটি করে 'a' থাকত।

ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় শব্দোপকরণ

ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে পশ্চিমের প্রভাব লইয়া যতটা চর্চা হয়, পশ্চিমের উপরে প্রাচ্যের প্রভাব সম্পর্কে আমরা তেমন আলোচনা করি না। মনের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাও বোধ হয় আছে। আমরা তাহাদের কি দিয়াছি যে সভা ডাকিয়া তাহা ঘোষণা করিব? তবু মাঝে মাঝে অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা বলিয়া মনটাকে একটু হালকা করিবার চেষ্টা করি। বলি, পশ্চিম যেমন জড়বিজ্ঞানে আমাদের গুরু তেমনি অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে প্রাচ্য তাহার পথপ্রদর্শক। আমরা শুধু গ্রহণই করি না, কিছু কিছু দান করিবার ক্ষমতাও আমাদের আছে।

দানটা কিন্তু সব সময় দাতার উপর নির্ভর করে না, গ্রহীতার উপরেও খানিকটা নির্ভর করে, হয়তো গ্রহীতার উপরেই বেশী। জগতে প্রদান অপেক্ষা আদানের গরজটাই অধিক।

ভাষা সাহিত্য ধর্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই আদান ক্রিয়াটা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। যে দরিদ্র সে তো ধনীর কাছে হাত পাতিতেই পারে। কিন্তু ধনীকেও মাঝে মাঝে মধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্তের দান লইতে হয়।

ভারতীয় ভাষাসমূহের শব্দভাণ্ডার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তাহার একটি বৃহৎ অংশ বিদেশাগত। বিদেশী শব্দসমূহের মধ্যে আরবী ফারসীরই বাহুল্য। দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান রাজত্বের এগুলি পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন। আরবী ফারসী বিদেশী হইলেও প্রাচ্য দেশের ভাষা। আরব দেশ পারস্য দেশ এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত। কিন্তু ইংরেজী ফরাসী পর্তুগীজ প্রভৃতি পশ্চিমী ভাষার শব্দসম্ভারও ভারতবর্ষীয় ভাষায় বহু সংখ্যায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইংরাজীর সংখ্যাই স্বভাবতঃ বেশী। রাজার ভাষা আইনের ভাষা বলিয়া ফারসী একদিন প্রতিপত্তি পাইয়াছিল। একই কারণে ইংরাজীরও প্রতিপত্তি। ফারসীর সাহিত্য-সম্পদ আছে, ইংরাজীর তো কথাই নাই। সে দিক্ দিয়াও এই দুই ভাষা ভারতে সমাদর লাভ করিয়াছে।

আমাদের আলোচনার বিষয় ভাষা নয়, শব্দ। ভারতীয় ভাষায় আমরা যে প্রচুর পরিমাণ ফারসী ও ইংরাজী শব্দ গ্রহণ করিয়াছি, ওই দুই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ করি নাই। নিত্য প্রচলনে শব্দগুলি আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য ওগুলি ব্যবহার করি। উহাদের বিকল্প আর কিছু সহজলভ্য নয় বলিয়া করি। আইন, আদালত, উকিল, মোক্তার, মুন্‌সি, মুহুরি, দলিল, দস্তাবেজ, সেফটি পিন, টাইম পীস, ইস্কুল, কলেজ, সাইকেল, মোটর, ইঞ্জিন, ডাক্তার, ব্যারিস্টার ইহারা যতই বিদেশী হউক না কেন, একান্তভাবে আমাদের

ভাষার অন্তঃপুরে স্থান পাইয়া গিয়াছে। ইংরাজীর কাছ হইতে আজও নূতন নূতন শব্দ লইতেছি। যেমন চিন্তার ক্ষেত্রে তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে নব নব উদ্‌ভাবন হইতেছে প্রধানতঃ ইংরাজীর মধ্যস্থতায় তাহাদের সহিত আমাদের যোগাযোগ ঘটিতেছে এবং যোগাযোগ রক্ষিত হইতেছে। 'অ্যাটম বোমা' আজ বাংলা হইয়া গিয়াছে। উহাকে আরও বাংলা করিতে গেলে উহা আর বাংলা থাকিবে না। তাহা করার প্রয়োজনও নাই। 'অ্যাসিড ইলেকট্রন ঈথর এক্সরে ব্যাক্টিরিয়া টেলিভিশন'—এগুলির বাংলা অনুবাদের চেষ্টা করিয়া কি লাভ হইবে?

ইংরাজীর শব্দসম্পদ অতুলনীয়। এই শব্দভাণ্ডার' একদিনে এত বড় হয় নাই, দিনে দিনে বাড়িয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সে শব্দ সংগ্রহ করিয়াছে। ইংরেজ কখনো সওদাগর, কখনো রাজা, কখনো মিশনারী, কখনো বা দুঃসাহসী অভিযাত্রী। সে যখন যেরূপে যেখানে গিয়াছে সেখান হইতে খালি হাতে ফিরে নাই। যেখানে সশরীরে যায় নাই সেখানকারও সাহিত্য হইতে ইতিহাস হইতে শব্দ লইয়াছে। আমাদের ভাষায় বিদেশী শব্দের সংখ্যা যত, ইংরাজী ভাষায় বিদেশী শব্দ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। ইংরাজী ভাষায় ব্যবহৃত এবং স্বীকৃত ভারতীয় শব্দের সংখ্যাও কম নয়।

Oxford English Dictionary নামক প্রামাণিক অভিধান গ্রন্থে ধৃত ভারতীয় শব্দের সংখ্যা প্রায় নয় শত। এ নয় শত মূল শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দের সংখ্যা কয়েক হাজার।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইংরাজের ভাষায় ভারতীয় শব্দের অনুপ্রবেশ শুরু হইয়াছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরাই সর্বপ্রথম ভারতের ধনরত্নের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ভারতীয় শব্দও স্বদেশে পাঠান। ওই ধনরত্ন যেমন সাদরে গৃহীত হয় শব্দগুলির অদৃষ্টে তেমন সমাদর জোটে নাই। ইংলণ্ডস্থ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ শব্দগুলি লইয়া বিষম বিপদে পড়েন। সব কথার মানে বুঝিতে পারেন না। কর্মচারীদের বক্তব্য অনুপলব্ধ থাকিয়া যায়, কাজ বাকী পড়িতে থাকে, যে সকল সমস্যার দ্রুত সমাধান আবশ্যক তাহার সমাধানে বিলম্ব ঘটে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানির কর্তৃপক্ষ নিতান্ত অপরিহার্য না হইলে চিঠিপত্রে ভারতীয় শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দেন।

ভারতে আগত ইংরাজ কর্মচারীদের চিঠিগুলি কি ধরনের ভারতীয় শব্দে পূর্ণ থাকিত তাহার একটি নমুনা William Foster কৃত The English Factories in India গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। নমুনাটি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের।

Their last of the 15th present, with a copy of the King's 'Furmand'.[১] Since then they have procured the dispatch

of two 'haddies',[২] who are ordered to carry to them the Royal 'farman'[৩] in company of John Willoughby, 'coja'[৪] havinge givne them his 'parwanna'[৫] to see all things restored unto you and re-established againe in youre former trad and priviolidges. The messengers should therefore be acquainted with all moneys unjustly taken from them, either by Safi Khan, 'Chuckedares'[৬] or 'radarries'[৭].

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে উদ্ধৃত পত্রাংশের অন্তর্গত সব কয়টি অনিংরাজী শব্দই ফারসী বা ফারসীজাত। রাজত্ব রাজস্ব রাজকর্মের ভাষা তখন পুরাপুরি ফারসী। কাজেই ইংরাজেরা তৎসংক্রান্ত শব্দাবলী যাহা লইয়াছে তাহার অধিকাংশই ফারসী। ভারতে বসিয়া সেগুলি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই ভারতীয় বলি। অবশ্য উল্লিখিত পত্রটির রচনাস্থান লাহোর। সেটাও ফারসী শব্দের বাহুল্যের একটা কারণ।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যাহা দেখিলাম অষ্টাদশের শেষভাগেও সে অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের শাসনসংক্রান্ত কাগজপত্রে দুর্বোধ্য অনিংরাজী শব্দের বাহুল্য তখনও ইংলণ্ডের শিরঃপীড়া ঘটাইতেছে। হাউস অফ কমনস্ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের শাসনব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যে সিলেক্ট কমিটি প্রণয়ন করেন তাহার নবম রিপোর্টে (২৫শে জুন, ১৮৭৩) স্বয়ং এডমাণ্ড বার্ক ভারত শাসন সম্পৃক্ত কাগজপত্রের ভাষা অত্যন্ত অপরিচিত এবং দুর্বোধ্য বলিয়া মন্তব্য করেন। হবসন-জবসন (Hobson-Jobson) গ্রন্থে ওই সময়কার জনৈক অজ্ঞাতনামা শব্দরসিক কবির এই সকৌতুক কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতাটি ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দাবলীর তথ্য-সন্ধানীদের উপভোগ্য হইবে।

"In common usage here a *Chit*
Serves for our business or our wit.
Bankshal's a place to lodge our ropes.
And mango orchards all are *Topes*.

১. ফরমান
২. রাজদূত
৩. ফরমান (ইংরাজী দুইরকম বানান লক্ষণীয়)
৪. খাজা
৫. পরোয়ানা
৬. চৌকিদার
৭. রাহ্ (রাস্তা) দারী

Godown usurps the ware-house place
Compound denotes each walled space.
To *Dufterkhanna, Ottor, Tanks,*
The English language owes no thanks ;
Since Office, Essence, Fish-pond shew
We need not words so harsh and new.
Much more I could such words expose
But *Ghauts* and *Dawks* the list shall close ;
Which in plain English is no more
Than Wharf and Post expressed before".

India Gazette, March 3,1781.

এইখানে 'হবসন-জবসন' গ্রন্থটির কথা একটু বলিয়া লই। বইটি Col. Henry Yule ও A. C. Burnell প্রণীত। এটি ইঙ্গ ভারতীয় কথ্য শব্দাবলীর একটি প্রখ্যাত সংকলন। Hobson Jobson নামটিই একটি ইঙ্গভারতীয় শব্দ। শব্দটির ইতিহাস কৌতুকাবহ। মুসলমানগণ 'মহরম' পর্ব উপলক্ষে যে 'ইয়া হাসান ইয়া হোসেন' ধ্বনি করিয়া থাকেন ইহা তাহারই ইংরাজী রূপ। ওই 'ইয়া হাসান ইয়া হোসেন' শব্দই কোনো ইউরোপীয়ের কানে 'হবসন জবসন' রূপে ধ্বনিত হইয়াছিল। এবং তাঁহার মুখ হইতেই সম্ভবতঃ শব্দটা ইঙ্গভারতীয় সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। পণ্ডিতে বলেন 'পার্বতীসুত লম্বোদর' অশিক্ষিত চাষাভুষার কানে শোনায় 'পাক দিয়ে সুতা লম্বা কর'। এটাকে যতটা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করা হয় আসলে ততটা অবিশ্বাস্য নয়। হাসান হোসেন হইতে আগত 'হবসন জবসন' প্রধানতঃ মহরম পর্ব অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া এ দেশীয় উৎসব, আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান, তামাশা—এইসব অর্থেও উহার প্রয়োগ হয়। এই শব্দটি আর একটি নূতন অর্থ অর্জন করিয়াছে—লোক-নিরুক্তি। বস্তুতঃ এই কথাটিই লোক-নিরুক্তির একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সহিত গ্রন্থনামের মিল স্বভাবতই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হবসন-জবসনে কবিতাটিতে যে ইঙ্গভারতীয় শব্দগুলি ধরা হইয়াছে তাহাদের প্রকৃতি পরিচয় লইবার চেষ্টা করা যাক। কবি ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে বাস করিতেন তাহা আমাদের জানা নাই। তবে যতদূর মনে হয় তিনি বাংলা দেশের বাসিন্দা ছিলেন না। শব্দগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার আভাস দেখা যায় না। অবশ্য তাহার দ্বারা কবির বাসস্থান সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ হয় না। বাংলা দেশের অধিবাসী ইঙ্গভারতীয়গণের মধ্যে আজিকার দিনেও কয়জন বাংলা বলেন? যাঁহারা বলেন তাঁহারাও হিন্দুস্থানীর অনুবাদ করিয়া যে বাংলা বলেন তাহার

মধ্যে বাংলা শব্দ অপেক্ষা হিন্দুস্থানী শব্দই বেশী থাকে। ব্যতিক্রম নাই তাহা নয়, কিন্তু ব্যতিক্রমকে সর্বদাই ব্যতিক্রম বলিয়া মানিয়া লইয়াই তাহার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

কবিতায় উদ্ধৃত শব্দগুলি ভারতবর্ষেই জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। শব্দগুলির আদিরূপ কি ছিল, ইঙ্গীকরণের ফলে তাহার কি রূপান্তর হইয়াছে এবং ওই সঙ্গে সঙ্গে অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি না, ঘটিলে কতটা ঘটিয়াছে তাহা দেখা যাক। আলোচ্য শব্দগুলির সংখ্যা দশ। শব্দগুলি এই :—

১. চিট ২. ব্যাঙ্কশাল ৩. টোপ ৪. গোডাউন ৫. কম্পাউণ্ড ৬. দপ্তরখানা ৭. অট্টর ৮. ট্যাঙ্ক ৯. ঘাট ১০. ডাক।

১. চিট (Chit)—শব্দটি আমাদের বিশেষ পরিচিত। সব রকমের আপিসে ইহার ব্যবহার। দস্তুরমাফিক পত্র হিসাবে নয়, ছোট খাটো চিঠি হিসাবে এই চিট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলায় চিট নাই 'চিঠা' আছে। যেমন—হাত চিঠা। 'চিঠি' তো আছেই। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্‌শনারিতে Chitty শব্দও ধরা হইয়াছে। ইহা হিন্দী 'চিট্‌ঠি' হইতে পাওয়া। বোঝা যাইতেছে, Chit এবং Chittyর মূল এক। দুইটিই হিন্দী হিন্দুস্থানীর মারফত ইংরাজীতে গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন চিট, চিঠি, চিঠা, এগুলি সংস্কৃত চিত্র হইতে আগত। চিত্র শব্দের এক অর্থ চিহ্ন। ইংরাজী Chit শব্দের মূল অর্থ চিঠি বা চিরকুট এই রকমই ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার বিস্তার ঘটিয়াছে দেখিতেছি। এখন ইহার অতিরিক্ত অর্থ,—ভৃত্যকে প্রদত্ত প্রশংসাপত্র, মদ্যাদির জন্য দেয় মূল্যের প্রতিশ্রুতি-পত্র। ইহা হইতে আসিয়াছে Chit System। ইহার অর্থ নগদ দামের বদলে প্রতিশ্রুতি-পত্র দিয়া হিসাব রাখার পদ্ধতি।

২. ব্যাঙ্কশাল (Bankshall)—ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট ব্যাঙ্কশাল কোর্ট আমাদের অপরিচিত নয় কিন্তু ব্যাঙ্কশাল যে বাংলা শব্দ তাহা আমরা কি কখনো শুনিয়াছি? অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্‌শনারি কর্নেল ইউলের (হবসন-জবসনের অন্যতর লেখক) মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন শব্দটি সম্ভবতঃ বাংলা 'বঙ্কশালা' অর্থাৎ বাণিজ্যাগার হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃত 'ভাণ্ডশালা' অর্থাৎ ভাণ্ডার বা অস্ত্রাগার হইতেও আসা সম্ভব। ভাণ্ডশালার অর্থ না হয় ভাণ্ডার হইল কিন্তু ভাণ্ডশালা হইতে ব্যাঙ্কশাল হইতে পারে না। 'বৃঙ্কশালা' হইতে বাঁকশাল বা ব্যাঁকশাল হইতে পারিত। টঙ্কশালা হইতে প্রাপ্ত টাকশাল, চলতি উচ্চারণে ট্যাঁকশাল তুলনীয়। বঙ্কশালা হইতে আসিলে ইংরাজী বানান যাহাই হউক না কেন বাংলার উচ্চারণে বাঁক বা ব্যাঁক থাকিত ব্যাঙ্ক হইত না। আরও একটা কথা আছে—বঙ্কশালা শব্দটিই কি বাণিজ্যাগার, পণ্যশালা এইরকম অর্থে বাংলাদেশে অতিশয় প্রচলিত ছিল? থাকিলে তাহার প্রমাণ কোথায়? মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই জাতীয় শব্দ পাইয়াছি

বলিয়া তো স্মরণ করিতে পারিতেছি না। ব্যাঙ্কশালকে বাংলা ভাষার শব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন অক্সফোর্ড অভিধান। ইহা ছাড়া তাহার আর কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু অক্সফোর্ড অভিধানও জোর করিয়া কিছু বলেন নাই। শব্দটি পরীক্ষা করিয়া উহাকে বাংলা বলিয়া আমাদের তো মনে হইতেছে না।

ইংরাজী ভাষায় ব্যাঙ্কশাল শব্দের আবির্ভাব ঘটে সপ্তদশ শতকে। এখন এই শব্দ ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশ পর্যন্ত 'গুদামঘর' ও 'বন্দরাধ্যক্ষের কার্যালয়' এই অর্থে প্রচলিত।

মালয়দ্বীপের ভাষায় 'সঞ্চয়শালা', 'আচ্ছাদিত স্থান', 'আচ্ছাদিত প্রবেশপথ'—এই সব অর্থে 'ব্যাঙ্কশাল' শব্দের ব্যবহার আছে। মালয় ভাষা হইতেই যে শব্দটি ইংরাজীতে যায় নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

৩. টোপ (Tope)—তামিল টোপ্‌পু হইতে আগত। তেলুগুতেও এই শব্দ পাওয়া যায়। ফলের বাগান, প্রধানতঃ আমের বাগান, অর্থে এই দক্ষিণ ভারতীয় শব্দটি সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইংরাজীতে ব্যবহৃত হইতেছে।

৪. গোডাউন (Godown)—ইহার অর্থ মালখানা, গুদাম। বাংলায় 'গুদাম' 'গুদোম' হিন্দীতে 'গোদাম'। মালয় ভাষায় 'গোদোং' শব্দ হিন্দী ও বাংলায় এই প্রকার রূপান্তর লাভ করিয়াছে। মালয় হইতে সোজাসুজি অথবা হিন্দীর মারফত ওই শব্দ লইয়া ইংরাজী নিজের সুবিধামত বানান করিয়া লইয়াছে। গোদোং বা গোদাম ইংরেজের কানে go-down এর মত শোনান অস্বাভাবিক নয়।

৫. কম্পাউণ্ড (Compound)—প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান। ইংরাজী সংমিশ্রণ অর্থে যে compound শব্দের ব্যবহার করি সেটি আসিয়াছে ল্যাটিন com (cum) + ponere হইতে। cum মানে 'সঙ্গে' ponere মানে 'রাখা'। কিন্তু 'স্কুল কম্পাউণ্ড' বা 'কলেজ 'কম্পাউণ্ড' প্রভৃতির 'কম্পাউণ্ড' শব্দ এই ল্যাটিন উপসর্গ ও ধাতুর সহযোগে উৎপন্ন হয় নাই। ইহার অর্থের সহিতও 'সংমিশ্রণ' 'একত্র রক্ষণ' প্রভৃতির কোন মিল নাই। এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শব্দ, সম্ভবতঃ মালয় 'ক্যামপং' শব্দ হইতে আসিয়াছে। চীন, ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে এই শব্দের ব্যবহার আছে। compound শব্দের সহিত ধ্বনির মিলন থাকায় ইংরেজ ওই শব্দকে নিজের মত করিয়া লইয়াছে।

৬. দফ্‌তরখানা (Dufterkhanna)—অফিস অর্থে দপ্তর ও দপ্তরখানা

ফারসী হইতে আমরা লইয়াছি। কর্মোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগত ইংরেজও ফারসী হইতে অথবা হিন্দী বা হিন্দুস্থানীভাষীর মুখ হইতে দপ্তরখানা লইয়াছে। তবে এই শব্দটি compound-এর মত একেবারে ইংরেজ বনিতে পারে নাই। চেহারার মধ্যে প্রাচ্যতা প্রকট।

৭ অট্টর (Ottor)—অর্থ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, পুষ্পনির্যাস। ফারসী ইতর্ হইতে আগত। বাংলায় আতর।

৮. ট্যাঙ্ক (Tank)—ধাতু বা কাষ্ঠনির্মিত বৃহৎ জলাধার। এই শব্দের মূলও ভারতীয় বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয় ভাষার কোন্ শব্দের সঙ্গে ইহার যোগ আছে? মনে হয় পর্তুগীজ tanque শব্দ হইতেই ইহার উৎপত্তি। তবে পর্তুগীজ শব্দটি ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজের হাতে আসিয়াছে, এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা এখন যে ট্যাঙ্ক শব্দ ব্যবহার করি—কলের মিস্ত্রীর ভাষায় 'ট্যাঙ্কি'—তাহার মূল পর্তুগীজও নয়, অন্য কোনো অধুনালুপ্ত শব্দও নয়। তাহা ইংরেজী tank ছাড়া আর কিছু নয়। পুকুর অর্থে tank শব্দের ব্যবহারটা নিতান্ত ভারতীয় বিশেষত্ব।

৯. ঘাট (Ghaut)—পর্বতমালা। যথা,—পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট। নদী বা পুকুরে নামিবার জন্য সোপানাবলী।

১০. ডাক (Dak, Dawk)—দূরদেশে পত্রপ্রেরণ বা গমনের জন্য সেকালের ব্যবস্থা। কিছুদূর অন্তর পত্রবাহক ঘোড়া ইত্যাদি বদলাইবার ব্যবস্থা। ডাক-হরকরা, ডাকপিওন, ডাকমাস্থল তুলনীয়। এই শব্দটি ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজী শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছে। ডাকের সহিত আর একটি ভারতীয় শব্দও ইংরাজীতে ঢুকিয়া গিয়াছে। সেটি হইতেছে Bungalow। মাটির (বা ইটের) দেওয়াল এবং চারচালা খড়ের ছাউনিযুক্ত এক ধরনের বাড়ীকে হিন্দীতে 'বাংলা' বলা হয়। সম্ভবতঃ বাংলা দেশের ওইরূপ চালা বাড়ি দেখিয়া হিন্দীতে উহার 'বাংলা' এই নামকরণ হয়। 'বাংলা'ই ইংরাজীতে Bungalowতে পরিণত হয়।

ইংরাজীতে গৃহীত ভারতীয় শব্দাবলীর সংখ্যা কম নয়। শব্দগুলির দিকে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই ভূমিকাস্বরূপ কয়েকটি শব্দের যৎসামান্য আলোচনা করিলাম।

সাধুভাষা ও চলিতভাষা

বাংলা সাহিত্যে গদ্যের অনুশীলন বেশী দিন আরম্ভ হয় নাই। চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ দানপত্র প্রভৃতিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিলে আমরা বড়জোর চার-শ বছরের উজান ঠেলিয়া কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারি। তাহার ওপারে আর নয়।

ভাষার প্রত্নতাত্ত্বিকরা ছিন্নপত্রের দুর্লভ উপকরণ অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন। সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া জুড়িয়া তাড়িয়া ভাষার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের চেষ্টা কম হয় নাই। ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের অন্ধকার যুগের ইতিহাস তাহার ফলে কিছুটা জানা গিয়াছে। আসসুম্পসাওঁ-এর পর্তুগীজ-বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অভিধান ও কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, দোম আন্তোনিও-এর ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের অন্তর্গত গদ্যলক্ষণাক্রান্ত রচনা, চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত চৈত্যরূপ প্রাপ্তি, নরোত্তম ঠাকুরের বলিয়া পরিচিত দেহকড়চা প্রভৃতির নাম বাংলা গদ্যের আদিযুগ প্রসঙ্গে বহুশ্রুত। কিন্তু এ সবের যদি কোনো মূল্য থাকে তো সে নিতান্তই ঐতিহাসিক। বাংলা গদ্যরীতির বিকাশের সহিত ইহাদের তেমন কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই।

শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্যের জড়দেহে প্রথম চৈতন্যের সঞ্চার হইল। কেরী সাহেব এবং তাঁহার অনুবর্তী পণ্ডিত মুনসীরা যে বইগুলি লিখিলেন বাংলা গদ্যের চলৎশক্তির প্রথম পরীক্ষা হইল সেইখানেই। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার প্রশ্নও এক হিসাবে তখন হইতেই দেখা দিল।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কেরীর কথোপকথন প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। বাংলা গদ্যের জন্মকালেই কেরী কথ্য বাংলা ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য কথ্য বাংলার অনুশীলন প্রয়োজন হইয়াছিল। কেরী দেখিলেন বাংলা গদ্যের অনতিপ্রচলিত যে রূপটি তৎকালে বিদ্যমান ছিল তাঁহার উদ্দিষ্ট কাজের পক্ষে তাহার উপযোগিতা নিতান্তই কম। লোকমুখে যে রীতির প্রচলন তাহাকে অবলম্বন করিয়াই জনগণের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার ব্যাকরণ ও কথোপকথন প্রায় এক সঙ্গেই (১৮০১) প্রকাশিত হয়। এইচ. এইচ. উইলসন কেরীর ব্যাকরণের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, বইটি সর্বাংশে সুন্দর কেবল পদবিন্যাস প্রকরণটিতে উদাহরণ আরও কিছু বেশী থাকিলে ভাল হইত। কিন্তু কথোপকথন প্রকাশের ফলে সে ত্রুটিও সংশোধিত হইয়াছে।

History of Bengali Literature in the Nineteenth Century গ্রন্থে সুশীলকুমার দে-ও কেরীর ব্যাকরণের ত্রুটি প্রসঙ্গে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"The syntax however is the least satisfactorily illustrated part but this defect was fully remedied by a separate publication, originally forming a supplement printed also in 1801, of *Kathopakathan* or *Dialogues* in Bengali, with a translation in English, comprising a great variety of idioms and phrases in current Bengali. Carey's extraordinary command over colloquial Bengali is nowhere better exhibited."

কথোপকথনের দৃষ্টান্তগুলির মধ্য দিয়া বাংলা দেশের জনজীবনের সহিত কেরীর পরিচয় যে কতখানি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। স্ত্রী-পুরুষ ইতর-ভদ্র ব্রাহ্মণ-শূদ্র উত্তমর্ণ-অধমর্ণ শ্রমজীবী-ভিক্ষাজীবী সবার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সকলের ভাষা তাঁহার আয়ত্তিগম্য হইতে পারিয়াছিল। কেরী সাহেব নিজে তাহা জানিতেন। প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি লর্ড ওয়েলেসলির সম্মুখে সংস্কৃত ভাষায় প্রদত্ত এক ভাষণে এ কথা বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—এদেশের ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আমার পরিচিত। বাংলা ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি কথোপকথনের দৃষ্টান্তগুলিকে ত্রুটিবিহীন করিবার জন্য দেশীয় লোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হইয়াছে,—

"That the work might be as complete as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural style of the persons supposed to be speakers. I believe the imitation to be so exact that they will not only assist the student but furnish a considerable idea of the domestic economy of the country."—মুখের কথার অবিমিশ্র রূপটিকে, রূপটিকে না বলিয়া রূপগুলিকে বলাই সংগত, সেই অবিমিশ্র রূপগুলিকে তিনি পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে Linguistic Survey of India-র সম্পাদক গ্রিয়ার্সন সাহেবও ভারতবর্ষের ভাষা ও উপভাষাসমূহের নিদর্শন সংকলন করিতে গিয়া এই নীতিই অনুসরণ করেন। আঞ্চলিক উপভাষাসমূহের নমুনা তিনি আঞ্চলিক অধিবাসীদের সাহায্যেই লিখাইয়া লন। তিনি অবশ্য আরও একটি কাজ করিয়াছিলেন। একটি ইংরাজী গদ্যাংশ (বাইবেলের একটি কাহিনী) গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্যে তত্তৎ অঞ্চলের

ভাষায় অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। বাংলা ভাষা ও উপভাষার নিদর্শনগুলি উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে, কৌতূহলী পাঠক দেখিতে পারেন।

কথোপকথনের কতটা অংশ কেরীর নিজস্ব রচনা আর কতটা তাঁহার সহকারী ও সাহায্যকারী পণ্ডিত মুনসীদের লেখা তাহার সূক্ষ্ম বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু সংলাপগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে এই কথাটা উপলব্ধি করা যায় যে লেখ্য ভাষার আদর্শ রূপটি কি হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য কেরী সাহেব যে পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই প্রশস্ত পথ। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়াই তিনি বাংলা ভাষার শারীর-সংগঠনের অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত শব্দশাস্ত্রী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন সূত্র অপেক্ষা দৃষ্টান্তের মূল্য অনেক বেশী। কথোপকথন সংকলন করিয়া তিনি শিক্ষার্থীর শ্রম অনেক লাঘব করিয়া দিয়াছেন।

বঙ্গভাষার একটি সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ লিখনরীতি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, মুখের ভাষাই হইবে তাহার মুখ্য উপাদান। মুখের ভাষারও তো অনেক রূপ। তিনি সকল রূপেরই নমুনা সংগ্রহ করিয়া সম্মুখে সাজাইয়া দিলেন। লেখনশিল্পী তাঁহারই সেই উপকরণরাশিকে নিজের কাজে লাগাইবেন, গ্রহণ বর্জন সংমিশ্রণ সম্মার্জন করিয়া নূতন নূতন রীতি নির্মাণের পরীক্ষা করিবেন; বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে রচনার চাল কখনও হালকা কখনও ভারী হইতে পারে কিন্তু তাহার মধ্য হইতেই বাংলা গদ্যের একটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন মূর্তি প্রকাশ পাইবে।—কেরীর মনে হয়তো এই আশাই ছিল।

কিন্তু কেরী নিজে স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই কোন্ রীতিটিকে তিনি আদর্শ রীতি বলিয়া মনে করেন। কথোপকথনের অব্যবহিত পূর্বেই বাইবেলের বাংলা অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। এই অনুবাদের ভাষা নিতান্তই দুর্বল। তথাকথিত খ্রীস্টানী বাংলার প্রাথমিক রূপ পাওয়া যায় এই অনুবাদে। একটু দৃষ্টান্ত দিই :—

"প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইলেন জলের উপর। পরে ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকার বিভিন্ন করিলেন। ঈশ্বর ও দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি। সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইলে হইল প্রথম দিবস। এবং ঈশ্বর বলিলেন আকাশ হউক জলের মধ্যস্থলে ও সে জল এ জল প্রথক করুক। অতএব ঈশ্বর সৃজন করিলেন আকাশ ও প্রথক করিলেন আকাশের জল নিচের জল হইতে। তাহাতে সে মত হইল। ঈশ্বর সে আকাশের নাম রাখিলেন স্বর্গ। সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইলে হইল দ্বিতীয় দিবস। এবং ঈশ্বর বলিলেন স্বর্গের নিচের জল একত্তর হউক একস্থানে ও সুস্কভূমি প্রকাশ হউক তাহাতে সেই মত হইল।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কথোপকথনের প্রকাশকালও ১৮০১। কথোপকথনের দৃষ্টান্তগুলিতে ভাষার বাক্য-বিন্যাসে যে স্বাচ্ছন্দ্য দেখি বাইবেলের বাক্যবিন্যাসে তাহার নিতান্তই অভাব। কথোপকথন হইতে এমন একটি নিদর্শন তুলিয়া দিতেছি কেরীর নিজের মতেই যাহার রীতি গুরু গম্ভীর (grave) :—

"তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা কেমন আছেন ?"

তাঁহারা মহারাজ চক্রবর্তী তাঁহারদের সহিত কার কথা তাঁহারদের প্রতিযোগিতার লোক আমার দেশে নাই। এবার কোম্পানীর কার্য পাইয়া মহা ধনাঢ্য হইয়াছে তাঁহাদের সমান ধনীলোক আমার দেশে চাকরী করিয়া হইতে পারে নাই। কেবল ধনীও নয় বিষয়ও অনেক করিয়াছে আজি লাগাএদ কমবেস লাকো টাকার জমিদারী করিয়াছে। সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত দেখ দিকি তাঁহারা কি ছিলেন এখন বা কি হইয়াছেন। এ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে। তাঁহাদের পূর্ব বিবরণ আমরা সমস্তই জানি মাতা পিতার দুঃখের পরিসীমা ছিল না। যতক্ষণে বড় ভট্টাচার্য্য কিছু দিতেন, তবেই সে দিন নির্বাহ হইত নতুবা হরিমটুক। এখন ঈশ্বর তাহাদিগকে অতিশয় উন্নত করিয়াছেন ঈশ্বরাধীন কর্ম বড়কে ছোট করিতে পারেন ছোটকেও বড় করিতে পারেন।

আমি চিরকাল দেশছাড়া তাহাদের আহার ব্যবহার কি প্রকার।

তাহাদিগের আহার পরিচ্ছদ ভাল বটে। নিতান্ত আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোকের উপকার করা আছে কিন্তু দানাদি সর্বতোভাবে নাই। ক্রিয়াকর্ম এই ক্ষণে যে রূপ করিতেছে সে নিন্দিত নয়।

কহ জমিদার যে করিয়াছেন সে শাসিত কি প্রকার।

জমিদার কখন ছিল না এই ক্ষণে হইয়াছে কিন্তু শাসন সুন্দররূপ করিতে পারে নাই এ বিষয়ে বিজ্ঞ নয় ইহাতে প্রজালোকেরা সুখ্যাতি করে না।"

বাইবেলের অনুবাদের সহিত উদ্ধৃত নিদর্শনের তুলনা করিলে বিস্ময় লাগে। দুই রচনা একই হাতের বলিয়া মনে হয় না। একটা নিতান্ত আড়ষ্ট অন্যটি তৎকালের পক্ষে অনেক সরল এবং সুপাঠ্য। অনুবাদের লেখক বাংলা ভাষার প্রাণ-রসের সন্ধান পান নাই, ইংরাজী ভাষার নক্সা দেখিয়া বাংলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলাকে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কথোপকথনের লেখকের সঙ্গে বাংলা ভাষার পরিচয় অনেক ঘনিষ্ঠ অনেক অন্তরঙ্গ।

কথোপকথনগুলি বিষয় ভেদে বিচিত্র। আর বিষয় ভেদে ভাষার ভঙ্গীও বিভিন্ন। 'চাকর ভাড়া করণ, সাহেবের হুকুম, মহাজন আসামি, ভদ্রলোক ভদ্রলোক, প্রাচীন প্রাচীন, শুপারিশ, মজুরের কথাবার্তা, স্ত্রীলোকের হাটকরণ,

স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক কথাবার্তা, মাইয়া কন্দল, তিয়ারিয়া কথা' প্রভৃতি অধ্যায়-শিরোনামা হইতেই বিষয়বৈচিত্র্যের পরিধি যে কত বিস্তৃত তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বাইবেলের অনুবাদের সহিত পূর্বোদ্ধৃত একটি উচ্চরীতির (grave style) কথোপকথনের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছি, উভয়ের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। কথোপকথনের পরস্পরের মধ্যেও পার্থক্য কম নয়। উল্লিখিত উচ্চরীতির সঙ্গে স্ত্রীলোকের কথোপকথনের ভাষার তুলনা করিয়া দেখুন।—

"তোমরা কয় যা।

আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা আছ।

কেমন যায় যায় ভাব আছে কি কালের মত।

আহা ঠাকুরাণী আমার যে জালা আমি সকলের বড় আমাকে তাহারা অমুক বুদ্ধিও করে না।

আলো সকলেই কি একে।

না। ইহার মধ্যে ছোট ছুঁড়ি ভাল মানুষের মাইয়া সেইতি আমাকে উপরোধ-বাদ করে।

তবে তাহারি সাথে তোমার প্রীতি আছে।

প্রীতি আছে বটে। কিন্তু সকলে অসৎ তাহাতে সেও সেই মত হয় বা।

সে এখন ছোট আছে তুই একটুকু আস্থা মমতা করিস তবে সে তোরি কানাড়ো হইবে।

আমার কানোড়া হবে তো এমন কানোড়া হবার যোগ্য নয় বাঁশ হইতে কঞ্চি দড়।

তবে যে বলিলি সে কিছু ভাল।

ভাল সে কেমন ভাল আমাকে বড় একটা তুচ্ছ মুচ্ছ করে না।"

সেদিনকার পশ্চিমবঙ্গীয় পল্লীগ্রামের সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা যে ভাষায় বিশ্রম্ভালাপ করিত এ তাহারই নিদর্শন। নিদর্শনটি অবিকল বলিতে পারি না কিন্তু আদর্শের যে খুব কাছাকাছি তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আবার পরবর্তী স্তরের গ্রাম্য স্ত্রীলোকের ভাষাও অনেকটা অবিকৃত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার মাইয়া কন্দলের দৃষ্টান্তে,—

"আর শুনছিসড়ে নির্মলের মা। এই বেণেমাগীর অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হাত্মাখ। কালি যে আমার ছেলে পথে ভাড়িয়াছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলের মা করিলে কি ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে যাইটের বাছা জরে ঝাউরে পড়েছে। এমন গরবাগুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতারখাগি সর্বনাশির

পুতটা মরুক তিনদিনে উহার তিনভাবেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হাঁলো ঝিজামাইখাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিনকুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস।

থাকলো ছারকপালি গিদেরি থাক। যদি আমার ছেলের কিছু ভাল মন্দ হয় তবে তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে। যা মনে আছে তাই করিব তখন তোমার কোন্ বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাছা ২ করে কান্দে তবেই ও অহঙ্কারির অহঙ্কারে ছাই পড়ে। হা বউরাঁড়ি তোর সর্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।"

আবার সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশবাসী নিম্নতর শ্রেণীর মানুষের মুখের কথাও এই কথোপকথন গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

কেরী নানা শ্রেণীর নানা বৃত্তির নানা স্তরের মানুষের মুখের কথার নিদর্শন সংগ্রহ করিলেও দেখিতে পাইতেছি সাহিত্যিক ভাষার যে আদর্শটি তাঁহার মনে মনে রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল তাহা আধুনিক সাধু ভাষারই প্রাথমিক রূপ। কথোপকথনগুলির মধ্যে যেগুলি মাইয়া কন্দল বা তিয়রিয়া কথার মত গ্রাম্য স্ত্রীলোক বা ইতর শ্রেণীর মানুষের ব্যবহৃত অশিষ্ট উপভাষার নমুনা সেগুলির সঙ্গে তাঁহার উদ্দিষ্ট লেখ্যভাষার কোনো যোগই নাই। বরং যে নিদর্শনগুলিকে উচ্চতর রীতির (graver style) বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল সেইগুলির প্রতিই তিনি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তীকালের রচনা ইতিহাসমালার ভাষারীতির প্রতি দৃষ্টি দিলে ইহার সমর্থন পাওয়া যাইবে।

একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে, কেরী সাহেব কথ্য ভাষার রূপটা গ্রহণ করেন নাই কেবল তাহার সারল্য ও সুবোধ্যতার প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। আর তাহা ছিল বলিয়াই তিনি বাক্যগুলিকে যথাসম্ভব ছোট করিতেন। পদবিন্যাসের জটিলতা তিনি সেই কারণেই অনেকটা বর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ক্রিয়াপদের চলিতরূপ প্রয়োগ করেন নাই। সেটুকু করিলেই চলিত ভাষার পথিকৃৎদের মধ্যে তাঁহার নাম থাকিয়া যাইত। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—ক্রিয়াপদ গুলির পূর্ণতর রূপের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তিনি নিশ্চয় ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভাষার সরলতা সাধনের পক্ষে ক্রিয়াপদের হ্রস্বীকরণ অপরিহার্য নয়। প্রচলিত ক্রিয়াপদের পূর্ণতর রূপগুলি সমগ্র বাংলা দেশকে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। হ্রস্বতর আঞ্চলিক রূপ প্রবর্তন করিয়া ভাষা বা জাতি কাহারও হিত সাধন হইবে না।

কেরীর অনুসরণে কোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত মুনসীরা বাংলা গদ্যের অনুশীলন করিয়া চলিলেন। তাঁহাদের হাতে বাংলা গদ্য আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেও যথেষ্ট সবল যথেষ্ট, গতিশীল হইল না। রামমোহন রায় ইহাতে যে কতখানি শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন সাহিত্যেতিহাসের ছাত্রগণের তাহা অজ্ঞাত নহে। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করুন, "রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্র্যানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।"

কিন্তু বঙ্কিমের পূর্বেই বিদ্যাসাগরের কথাটা বলিয়া লইতে হয়। আধুনিক গদ্য ভাষার ইতিহাসে তাঁহার দান অসামান্য। তাঁহার প্রবর্তিত গদ্যভঙ্গী বাংলা গদ্যের আদর্শ রীতিরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত হইয়াছে। বঙ্কিম নিজে না মানিলেও বলিব তিনিও বিদ্যাসাগরকে পাশ কাটাইয়া চলিতে পারেন নাই। আবার বিদ্যাসাগরের ভাষাই বঙ্কিমের হাতে পরিস্রুত হইয়া রবীন্দ্রনাথের কাছ পর্যন্ত পৌছিয়াছে।

বাংলা গদ্যের উদ্ভবকাল হইতে বিদ্যাসাগরের সময় পর্যন্ত সাহিত্যরচনার যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহা সাধু রীতি। কেরী সাহেবের কথোপকথন বাদ দিলে আর কোনো উল্লেখযোগ্য রচনায় খাঁটি কথ্য ভাষার ভঙ্গী অনুসৃত হয় নাই।

সংস্কৃতশব্দবহুল গুরুগম্ভীর ভাষাকেই সাধু ভাষা বলা হইত। আর যে ভাষায় চলিত কথার—তদ্ভব অর্ধতৎসম দেশী বিদেশী শব্দের—বেশী ব্যবহার, তাহাকে লৌকিক বা অনুরূপ কোনো বিশেষণ দিয়া অভিহিত করা হইত।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি প্রথম শ্রেণীর। তাঁহার কোনো কোনো রচনার ভাষা যথেষ্ট সরল হইলেও কোনোটিই একান্তরূপে কথ্যভঙ্গী অনুসরণ করে নাই। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি যখন বাংলা শিষ্ট সাহিত্যের প্রধান, প্রধান কেন একমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বাহন হইয়া দাঁড়াইল, তখনই একটা আন্দোলন দেখা দিল। এ আন্দোলন বস্তুতঃ আর কিছু নয়, ইহা পুরাতনের বিরুদ্ধে নূতনের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃতবহুল রচনার বিরুদ্ধে একটা revolt হইয়াছিল। বোধ হয় ১৮৫৪।৫৫ খ্রীস্টাব্দে রাধানাথ সিকদার 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি কাগজ বাহির করেন, তাহাতে অনেক চলিত কথা ব্যবহৃত হইত। "একটা প্রবন্ধের মধ্যে Xenophon থেকে ভাঙ্গা, এই শব্দ যোজনা ছিল। বিদ্যাসাগর হাসিতেন।"[১]

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ সেকালের অবস্থাটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—"একদিকে পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অপরদিকে খ্যাতনামা

১. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ

অক্ষয়কুমার দত্ত, এই উভয় যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষা নবজীবন লাভ করিল, তখন তাহা সংস্কৃতবহুল হইয়া দাঁড়াইল। ··অনেকে এরূপ ভাষাতে প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের নিকট, বিশেষতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট, ইহা অস্বাভাবিক কঠিন ও দুর্বোধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।···যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবুর সংস্কৃতবহুল বাংলার ভার দুর্বহ বোধ হইতে লাগিল তখন···'মাসিক পত্রিকা' নামে এক ক্ষুদ্রকায়া পত্রিকা দেখা দিল।"

নবীন প্রবীণের ভাষান্দোলনে 'মাসিক পত্রিকা' একটি বিশিষ্ট ভূমিকা লইয়াছিল। সাহিত্যে কথ্যভাষা প্রবর্তনের ইতিহাসে টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) দানের পরিমাণ যে কতখানি তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত নয়। তাঁহার ঐতিহাসিক সাহিত্যকীর্তি 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে। এই পত্রিকাতেই প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫) হইতে আলাল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। দেখা যাইতেছে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ তিন বৎসর আগেই আলাল-এর রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। আলাল যে-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় সেই 'মাসিক পত্রিকা'-র মুখবন্ধটি হইতে বুঝিতে পারি ভাষান্দোলনের নেতৃগণ সর্বসাধারণের, বিশেষতঃ স্ত্রী-পাঠকের, জন্যই পত্রিকাটির প্রকাশে উদ্‌যোগী হন। "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"

"যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়" আলালের ঘরের দুলাল যে সেই ভাষারই নমুনা টেকচাঁদও তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় সে কথা বলিয়াছেন,— "This book has been written in a simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language.....it will perhaps be found useful."

মাসিক পত্রিকার মুখবন্ধ এবং আলাল-এর ভূমিকা একই লেখকের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে; কারণ "মাসিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।"

উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের আপন আপন প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাহাদের সংলাপ রচিত হইয়াছিল বলিয়া বীম্‌স্ সাহেবও টেকচাঁদের সাধুবাদ করিয়া তাঁহার Modern Aryan Languages of India গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"His story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our language, for wit spirit and clever

touches of nature. He puts into the mouth of each of his characters the appropriate method of talking, and thus exhibits to the full the extensive range of vulgar idioms which his language possesses"

অনভিজাত শ্রেণীর সাধারণ মানুষের ভাষার সঙ্গে টেকচাঁদের বিশেষ পরিচয় ছিল। বীম্‌স্ কথিত vulgar idioms অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যে প্রচলিত বাগ্বিশেষগুলির যথাযথ প্রয়োগই তাঁহার ভাষাভিজ্ঞতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সে বিষয়ে বিতর্কের কোন কারণ নাই। তবে একথাও সত্য যে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করিলে বাগ্বিশেষগুলিতে প্রায়শই বক্তার কথ্য ভাষার ভঙ্গীটা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের ভাষা বিচার করিয়া দেখিলে "যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়" আলালের ভাষা সর্বতোভাবে তাহার নিদর্শন হইয়াছে এমন কথা বলা যাইবে না।

আজ আমরা প্রধানতঃ ক্রিয়াপদের মধ্যেই চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ করি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়।

'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্যের কথা বিশদভাবে বলিয়াছেন,—"সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে। 'হচ্ছে' 'করছে'-কে যদি জলচল করে নেওয়া যায় তা হলে জাতঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে।...'তাঁর কাজে ও কথায় অসংগতি' মুখের ভাষাতেও এটা বলা চলে, আবার এ-ও বলা যায় 'তাঁর কাজে কথায় মিল নেই'। 'বাসুকি ভীমকে আলিঙ্গন করলেন' এ কথাটা মুখের ভাষায় অশুচি হয় না, আবার 'বাসুকি ভীমের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন' এটাতেও বোধ হয় নিন্দের কারণ ঘটে না। বিজ্ঞানে দুর্বোধ তথ্য আছে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের সাধু ভাষাও গলদ্‌ঘর্ম হয়, আবার চলতি ভাষারও চোখে অন্ধকার ঠেকে। বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের দেশে যখন ছড়িয়ে পড়বে তখন উভয় ভাষাতেই তার পথ প্রশস্ত হতে থাকবে।"

আলালের তথাকথিত কথ্যভাষায় চলিত ক্রিয়াপদের অপরিহার্যতা স্বীকৃত হয় নাই। চলিত রূপের ক্রিয়া ও সর্বনাম মধ্যে মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসৃত হয় নাই। সাধুরূপও নির্বিচারে ব্যবহৃত হইয়াছে। আলাল-এর আরম্ভ এইরূপ :—

"বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন। তিনি মাল ও ফৌজদারী আদালতে অনেক কর্ম করিয়া বিখ্যাত হন। কর্মকাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উৎকোচাদি গ্রহণ না করিয়া যথার্থ পথে চলা বড় প্রাচীন প্রথা ছিল না বাবুরাম সেই প্রথানুসারেই চলিতেন। একে কর্মে পটু—তাতে তোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি দ্বারা সাহেব সুবাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন এজন্য অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন করিলেন। এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিত্রের

তাদৃক্ গৌরব হয় না। বাবুরাম বাবুর অবস্থা পূর্বে বড় মন্দ ছিল, তৎকালে গ্রামে কেবল দুই এক ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্ব করিত। পরে তাঁহার সুদৃশ্য অট্টালিকা বাগ বাগিচা তালুক ও অন্যান্য ঐশ্বর্য সম্পত্তি হওয়াতে অনুগত ও অমাত্য বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অসংখ্য হইল।"

এই উদ্ধৃতির সব কয়টি ক্রিয়াপদ সাধু,—'করিয়া করিতে হইয়া চলিতেন করিয়াছিলেন করিলেন বাড়িলে হইল'। একটিও কথ্যরূপ নাই। সর্বনামের কথ্যরূপ একটিমাত্র আছে,—'তাতে'। বিদেশী শব্দ আছে। যেমন,—'মাল ফৌজদারী আদালত সাহেব বাগ বাগিচা তালুক'। সংস্কৃত শব্দেরও অপ্রতুল নাই। —'বৈষয়িক প্রবৃত্ত উৎকোচাদি প্রথানুসারে কৃতাঞ্জলি উপার্জন তাদৃক্ তৎকালে অট্টালিকা ঐশ্বর্য অমাত্য'।

আলাল-এর মধ্যে চলিত ক্রিয়ার ব্যবহার যে একেবারেই নাই তাহা নহে। কোনো কোনো চরিত্রের মুখে কথ্য ক্রিয়া বসানো হইয়াছে, কিন্তু কোথাও তাহার ব্যবহার অবিমিশ্র হয় নাই। প্রমদার উক্তি হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাই :—

"তবে শুনবে? আর বৎসর যখন আমি পালা জ্বরে ভুগতেছিনু দিবারাত্রি বিছানায় পড়ে থাকতুম উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না, সে সময় স্বামী আসিয়া উপস্থিত হলেন। স্বামী কেমন, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখি নাই, মেয়েমানুষের স্বামীর ন্যায় ধন নাই। মনে করিলাম দুই দণ্ড কাছে বসে কথা কহিলে রোগের যন্ত্রণা কম হবে। দিদি, বললে প্রত্যয় যাবে না—তিনি আমার কাছে দাঁড়াইয়াই অমনি বল্‌লেন ষোল বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ করে গিয়াছি—তুমি আমার এক স্ত্রী—টাকার দরকারে তোমার নিকট আসিতেছি—শীঘ্র যাব—তোমার বাপকে বল্‌লাম তিনি তো ফাঁকি দিলেন—তোমার হাতের গহনা খুলিয়া দাও।"

চলিত রূপের ক্রিয়া,—'শুনবে ভুগতেছিনু পড়ে থাকতুম হলেন বসে হবে যাবে বললেন করে যাব বললাম বললে'। সাধু রূপের ক্রিয়ার সংখ্যাও প্রায় সমান সমান।—'উঠিয়া দাঁড়াইবার দেখি নাই করিলাম কহিলে দাঁড়াইয়া হইল গিয়াছি আসিতেছি খুলিয়া আসিয়া'।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, উদ্ধৃতিটি স্ত্রীলোকের উক্তি। টেকচাঁদ তাহার মুখে যে ভাষা বসাইয়াছেন তাহাকে নিশ্চয় যথাসাধ্য চলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'ভুগতেছিনু' এই ক্রিয়াপদটি নিতান্তই আঞ্চলিক কথ্য রূপ। এই জাতীয় পদের প্রয়োগ হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সাধুরূপের ক্রিয়াপদ বিমিশ্রভাবে ব্যবহার করায় তাঁহার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই। তিনি যে লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন সে লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারেন নাই, কিন্তু সে পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। সাধুর সহিত সংমিশ্রিত হইলেও ওই

যে কিছু কিছু কথ্য রূপের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলেন তাহাতেই মুখের ভাষার আদলটা আসিয়া পড়িল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ (১৮৫৮) আলাল-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিলেন, 'আলাল'-এর রচনায় "কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া ও ইংরাজী পারসী মিশ্রিত এমন প্রচলিত কথা ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা পল্লীগ্রামে অনায়াসে বোধগম্য হইবে না।" সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলিয়াছেন,—"এ গ্রন্থ কলিকাতার ভাষায় কলিকাতাস্থদিগের শ্লেষে লেখা হইয়াছে; সুতরাং পল্লীগ্রামে ইহা বোধগম্য না হইলে ক্ষতি নাই।"

বঙ্কিমের অন্য মত। বঙ্কিম বলিলেন,—"যে ভাষা সকলের বোধগম্য এবং সকল বাঙালী কর্তৃক ব্যবহৃত প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহৃত করিলেন।" তিনি বলিলেন,—'আলাল'-এর রচনা হইতেই "প্রথম এ বাংলা দেশে প্রচারিত হইল যে যে-বাংলা সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্বজনহৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ।"

আলাল-এর ভাষাকে বঙ্কিম সর্বজনবোধ্য মনে করিলেও তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের একাংশ যে তাহাকে ওইরূপ মনে করেন নাই তাহা পূর্বোক্ত সমালোচনা হইতেই বোঝা যায়। একালে চলিত ভাষার যেটি প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয় সেটি হইল ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ। রাজেন্দ্রলালের উক্তি হইতে জানিতে পারি—তিনি এই সংক্ষিপ্ত ক্রিয়ার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার উক্তি যে কেবলমাত্র তাঁহারই মত সূচিত করিতেছে না, এ মত যে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজেরই একটি অংশের মনোভাবের প্রতিধ্বনি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখি না।

অতীতের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া এই দেখিতে পাইতেছি যে উনবিংশ শতকের শেষের দিকেও সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে যে পার্থক্যের বিচার হইত সেটা রূপের মানদণ্ডে ততটা নয়, যতটা রীতির। কলিকাতার আঞ্চলিক (cockney) কথ্য ভঙ্গীর এবং অনভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত অশিষ্ট (slang) শব্দ ও বাগ্বিশেষের (idiom) অজস্র ব্যবহার সত্ত্বেও প্যারীচাঁদের পরীক্ষা ষোল আনা সফল হয় নাই। প্যারীচাঁদ কথ্য ভাষার রীতিটা (style) ঠিকমত ধরিয়াছিলেন, কিন্তু রূপটা (form) পুরাপুরি পারেন নাই।

রূপের বিচারে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' অনেক উন্নত। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পণ্ডিতদের সাহায্যে অনূদিত হইয়াছিল, 'হুতোম'ও তাঁহার স্বহস্তরচিত কি না, তাহা লইয়া মতান্তর আছে, কিন্তু 'মহাভারত' এবং 'হুতোম' যে বাংলা ভাষার দুই রূপের দুই উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাহা অস্বীকার করিবার নয়। এই উৎকর্ষের কৃতিত্ব কালীপ্রসন্নের। গ্রন্থরচনা যাঁহার হাতেই হউক, ভাষার মান তাঁহারই নির্দেশিত ইহাতে সংশয়ের কোনো কারণ দেখি না। আর যাহাই হউক

গ্রন্থের ভূমিকাংশ যে তাঁহার স্বহস্তরচিত অন্ততঃ সেটুকু মানিতে হইবে তো! 'হুতোম'-এর ভূমিকার আরম্ভ এইরূপ: "আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে। বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা তইরী কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রই একটা না একটা পুতুল তৈরী করে খ্যালা করে, তেম্নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেও ওয়ারিস্‌ান্ থাক্তো, তা হলে স্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তানাবুদ হতে পেতো না—তা হলে হয়ত এতদিন কত গ্রন্থকার ফাঁসি যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাকতেন; সুতরাং এই নজীরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়।"

'আলাল'-এর ভূমিকা কিন্তু অবিমিশ্র সাধু ভাষায় লেখা।—

"অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল। ইহার তাৎপর্য কি পাঠ করিলেই প্রকাশ হইবে। এ প্রকার পুস্তক লেখনের প্রণালী এতদ্দেশ মধ্যে বড় প্রচলিত নাই, ইহাতে প্রথমোদ্যমে অবশ্য সদোষ হইবার সম্ভাবনা, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া ঐ দোষ ক্ষমা করিবেন।" এ ভাষায় অসামঞ্জস্য নাই। সাধুরূপের সহিত চলতি রূপের সংমিশ্রণ ঘটে নাই। কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ভাষা বিশুদ্ধ সাধু। প্যারীচাঁদও যখন সাধুভাষা লেখেন তখন তাহাও বিশুদ্ধ সাধুই হয়। কালীপ্রসন্ন যখন চলতি লেখেন তখন তাহার সহিত সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা গুলাইয়া ফেলেন না, কিন্তু প্যারীচাঁদের চলিত ভাষায় অনেক ফাঁক থাকিয়া যায়। কালীপ্রসন্নই চলিতভাষার প্রথম সচেতন পূর্ণাবহিত লেখক। তথাপি চলিত ভাষার ইতিহাসে 'আলাল' যতটা খ্যাতি পাইয়াছে 'হুতোম' ততটা পায় নাই। সম্ভবতঃ হুতোমের চুটকি নক্‌সা অপেক্ষা আলাল-এর আখ্যানবস্তুই পাঠকের মনকে অধিক আকর্ষণ করিয়াছিল।

যাহাই হউক 'আলাল' এবং 'হুতোম' উভয় গ্রন্থই লেখকসমাজের মনকে বেশ একটা নাড়া দিয়াছিল, তাহা কতটা রূপের জন্য আর কতটা বা রীতির জন্য সে বিচার সূক্ষ্মভাবে করা হয় নাই।

বঙ্কিম বলিয়াছেন, পাঠককে বুঝাইবার জন্যই গ্রন্থরচনা এবং সেই কারণে যে ভাষা সকলের বোধগম্য, তাহাই হইবে সাহিত্যের বাহন। সকলের বোধগম্য হইতে পারে এমন ভাষা যদি না থাকে তাহা হইলে যে ভাষা অধিকাংশ লোক বুঝিবে সেই ভাষাতেই গ্রন্থ লেখা উচিত। এতৎসত্ত্বেও বঙ্কিম কথ্য ভাষায় গ্রন্থরচনা কখনো সম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই। কেন করেন নাই? "কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্ত সঞ্চালন।"

বঙ্কিম হুতোমি ভাষার নিন্দা করিয়াছেন। বলিয়াছেন এ ভাষায় লিখন পঠন হওয়া উচিত নয়। কারণ কি? না—"হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই।" আলালকে যতই প্রশংসা করুন উহাকেও পুরাপুরি লেখ্য ভাষার মর্যাদা দিতে তাঁহার বাধিয়াছে। উহাকে "হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর" বলিয়া কোনো রকমে পাস নম্বরটা দিয়াছেন। "গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয় প্রকাশের পক্ষে টেকচাঁদী ভাষারও যোগ্যতা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। "কেন না এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।"

বঙ্কিমের নিজের ভাষাকে বলা হয় মধ্যগা—বিদ্যাসাগরী এবং টেকচাঁদী এই দুই রীতির মধ্যবর্তী। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা হইতে জানিতে পারি "বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের রচনা পছন্দ করিতেন না এবং বঙ্কিম বলিতেন বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।"

ধাত যতই খারাপ করুন বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের ধারাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার সাহিত্য-সাধনা শুরু করিয়াছেন। তবে তাঁহার ভাষায় যে নবতর রীতির প্রতিষ্ঠা হইতে দেখি সে তাঁহার ব্যক্তিগত সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচায়ক। একই লেখক শক্তিমান হইলে বিভিন্ন রীতিতে লিখিতে পারেন, তাহারও নিদর্শন বিরল নহে। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব ও মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত এক রীতির লেখা নয়। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস এর রীতি প্রভাবতী সম্ভাষণ-এর রীতি হইতে স্বতন্ত্র। তবে জনসাধারণ গড়ের হিসাবেই লেখকের রচনারীতির মান নির্ধারণ করে। কিন্তু সে যাহাই হউক, বঙ্কিম বা বিদ্যাসাগর কেহই কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করেন নাই।

বঙ্কিমের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একই ধারার অনুবর্তন চলিল। সকল সাহিত্যিকই সাধুরূপ আশ্রয় করিয়া লিখিয়া চলিলেন। অবশ্য কাহারও কাহারও রচনায় কথ্য বাগ্‌ভঙ্গীর প্রবণতা দেখা যাইতে লাগিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ লেখকদের রচনারীতির কথা স্মরণ করুন। অনাড়ষ্ট সরল স্বচ্ছন্দ এবং সরস।

কিন্তু ইঁহাদের কেহই কথ্যভাষার বাহিরের রূপটা গ্রহণ করেন নাই। বড় বড় সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল, প্রয়োজন মত চলিত শব্দের, অ-সংস্কৃত এবং বিদেশী শব্দের বহুল ব্যবহার আরম্ভ হইল। কিন্তু কথ্য ভাষার রূপ সাহিত্যে সাধারণ ভাবে গৃহীত বা স্বীকৃত হইল না।

সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রবর্তনের আন্দোলন যাঁহাদের সহায়তায় বল পাইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। স্বামীজি বলিলেন, "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি

জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না ; সেই ভাব সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে দিকে ফেরাও সে দিকে ফেরে তেমন কোনো তৈরী ভাষা কোনও কালে হয় না। ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয় দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃতর গদাই লস্করি চাল ওই এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।" স্বামীজির এই সতেজ সুদৃঢ় উক্তি আমাদের মনের উপর দাগ কাটিলেও লেখক-সমাজের উপর তখনই তাহার প্রভাব বিশেষ পড়ে নাই।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের পূর্বে চলিত ভাষা সাহিত্যের অন্যতম বাহনরূপে পরিগণিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথও 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-এ প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেটাও একটা পরীক্ষা। পত্র হিসাবেই তাহার রচনা। সাহিত্যে চলিত ভাষার পাকাপাকি ব্যবহার আরম্ভ হইল সবুজপত্রের আবির্ভাব-কাল হইতে। সে ইতিহাস বেশী পুরাতন নয়।

ইতিমধ্যে নাটকের সংলাপে কথ্যভাষার প্রয়োগ চলিতেছিল। হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নাট্যকারগণ আপন আপন গ্রন্থে মুখের ভাষা ব্যবহার করেন। সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়া সে সংলাপের মান খুব উন্নত নয়। তবে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, নাট্যকারগণ চরিত্রের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের এবং নিম্নতর চরিত্রের মুখের কথাকে যতটা সম্ভব যথাযথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেন। ইহার ফলে বাক্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া এবং সর্বনাম পদের চলিতরূপ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪) হইতে একটু উদ্ধৃত করি :—

"হাঁরে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি। কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্যে বলেছিল ? কুল ত নয় কুলের আঁটি বড় কঠিন। যার কুল আছে তার কি দায় নেই ? ধম্ম নেই কম্ম নেই ? আহা। আহা। কি দুঃখু নাতনি ! তুই আর কাঁদিস নে। যা মেয়েদের সঙ্গে যা, আবার আসবে ভাবনা কি ? রাগ করে গেচে কি কর্বি ? এবার এই অবধি কাটনাটা মাটনাটা কেটে কিছু হাতে করে রাখ। তবু কাঁদতে লাগলি ? আহা ছেলেমানুষ ! বোন ! কি কর্বি তা বল। এই দেক্ দেখি, আমরা কি কচ্চি ? তোত্ত আছে, আমার যে নেই তা কি কর্বো ?"

কথ্য উচ্চারণ প্রদর্শনের চেষ্টা বানানের মধ্য দিয়া কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়—ধম্ম (ধর্ম), কম্ম (কর্ম), গেচে (<গেছে), কর্বি (<করবি), দেক্ দেখি (<দেখ দেখি), কচ্চি (<করছি), তোত্ত (<তোর ত), কর্বো (<করব)।

নাটকে চলিত ভাষার প্রয়োগ সেদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তবু নাটকের রঙ্গমঞ্চ ছাড়া সাহিত্যের মুক্তাঙ্গনে তাহার স্থান হয় নাই।

যে কথা বলিতেছিলাম।—রবীন্দ্রনাথই সাহিত্যে খাঁটি চলিত রীতির প্রবর্তন করিলেন। প্রেরণা সবুজপত্রের সম্পাদকের তরফ হইতে আসিয়াছিল একথা সত্য বটে, কিন্তু ইহাও নিঃসংশয় সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলনের সক্রিয় এবং সমুদ্যোগী সমর্থক না হইলে এবং সেদিন হইতে চলিত ভাষার প্রবক্তারূপে উহার পক্ষাবলম্বন না করিলে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সাধু ভাষার রাজত্বই চলিতে থাকিত। রবীন্দ্রনাথ শুধু চলিত ভাষার পক্ষই লইলেন না, নিজের লেখায় সাধু-ভাষাকে এক রকম বর্জন করিয়াই বসিলেন।

চলিত ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত দেখিয়া স্বভাবতঃই রবীন্দ্র-অনুবর্তী লেখকগণও চলিত ভাষার সাধনা শুরু করিলেন। প্রথমে সকলের পক্ষে সেটা সহজ হয় নাই। কারণ, সাহিত্যিক চলিত ভাষা যে কথ্য ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মুখের ভাষা। সে ভাষায় যাঁহারা জন্মসূত্রে অধিকার পান নাই শিক্ষার দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা তাঁহাদের সে অধিকার অর্জন করিতে হয়। নূতন ভঙ্গীর প্রতি আকর্ষণবশতঃ অনেকেই তাহার অনুশীলনে উদ্যোগী হইলেন।

কাহারও কাহারও মনে দ্বিধা ছিল। একটি বিশেষ আঞ্চলিক ভাষাকে অন্য সকল অঞ্চলের লোক সর্বজনীন সাহিত্যের বাহন বলিয়া প্রসন্ন মনে সায় দিতে পারিতেছিলেন না। সে প্রতিকূলতাও বেশী দিন স্থায়ী হইল না। গল্পে উপন্যাসে রসরচনায় চলিত ভাষা ধীরে ধীরে স্থান করিয়া লইতে লাগিল। কিন্তু প্রবন্ধে সমালোচনায়, ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গুরুগম্ভীর গ্রন্থে সাধুভাষার মর্যাদা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইল না।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল, চলিত ভাষা মানেই সহজ ভাষা নয়। ক্রিয়া ও সর্বনামের কথ্যরূপটা তাহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও দুই লেখকের রচনায় আকাশ-পাতাল তফাত হইতে পারে। রচনার বিশিষ্টতা, রচনার উৎকর্ষ নির্ভর করে একান্ত ভাবে লেখকের ব্যক্তিগত রীতি অর্থাৎ স্টাইলের উপর। চলিত রূপের লেখা কথ্যভাষাশ্রিত বলিয়াই যে সহজ হইবে এই ধারণাটাই সমূলক নয়। শরৎচন্দ্রের সাধু ভাষার সহিত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চলিত ভাষার তুলনা করিলেই তাহার প্রমাণ পাইবেন।

চলিত ভাষা যতই জনপ্রিয় হউক, আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে সাধু ভাষার ব্যবহার এখনও প্রায় আগের মতই আছে। উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে সাধু ভাষা আজও চলে, পূজাপার্বণের নিমন্ত্রণেও সাধু ভাষারই ব্যবহার অপরিবর্তিত। অবশ্য সরস্বতী-পূজার নিমন্ত্রণের কথা স্বতন্ত্র। রাজাকে রাজা করিয়া দেখাইবার জন্যই শ্রীসত্যজিৎ রায় তাঁহার গুপী ও হল্লার রাজার মুখে সাধু ভাষা বসাইয়াছিলেন।

সংবাদপত্রে সাধু ভাষার একচেটিয়া অধিকার সেদিন পর্যন্ত ছিল। সাধু ভাষা এখনও সেখান হইতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয় নাই। কোনো কোনো পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশ এখনও পুরাপুরি সাধু ভাষায় পরিবেশিত হইতেছে। ইহারও একটা তাৎপর্য আছে।

বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে সাধুভাষা অদ্যাবধি স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত আছে। অবশ্য চলিত ভাষারও চলন হইতেছে। বাংলায় যে সকল প্রশ্নপত্র মুদ্রিত হয় (যে-কোন বিষয়েই হউক না কেন) তাহার অধিকাংশই সাধু ভাষায় রচিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশ্নপত্র দেখিলেই তাহা বোঝা যাইবে। বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই ধরনের নির্দেশ মুদ্রিত থাকে তাহা অবশ্যই অনেকের দৃষ্টিতে পড়িয়া থাকিবে,—"বিশুদ্ধ সাধু অথবা বিশুদ্ধ চলিত ভাষায় উত্তর লিখিতে হইবে। উভয় রীতির সংমিশ্রণ চলিবে না।" এই নির্দেশের কারণ কি? চলিত ভাষায় যাহাদের কিছুমাত্র অনুশীলন নাই, গৃহে বা বিদ্যালয়ে চলিত ভাষায় লিখিবার শিক্ষা যাহারা পায় নাই তাহারা ওই ভাষায় লিখিতে গেলে স্বভাবতঃই গুলাইয়া ফেলে। অনেকে চলিত ভাষায় লেখা আধুনিকতার লক্ষণ বলিয়া মনে করে। শিক্ষকরাও কখনো কখনো ওইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া চলিত ভাষায় লিখিবার পরামর্শ দেন। চলিত ভাষায় উত্তর লিখিলে বেশী নম্বর পাওয়া যায়, কাহারও কাহারও এমন ভ্রান্ত ধারণাও আছে। এইসব কারণে অনভ্যাস সত্ত্বেও চলিত ভাষায় লিখিবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার ফলে বিপর্যয় ঘটে।

চলিত ভাষার প্রতি দেশের মন ঝুঁকিয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে তাহার সুনিয়ত অনুশীলনের কোনো ব্যবস্থা নাই। খাঁটি চলিত ভাষার একটি প্রামাণিক ব্যাকরণ আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। খাঁটি বাংলা সাধু ভাষার ব্যাকরণই বা কয়টি আছে? খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ বলিতে কি বুঝায় তাহা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ পণ্ডিতগণের ভাষাবিষয়ক আলোচনা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন।

বস্তুতঃ ছাত্রগণের পাঠ্য একটিমাত্র ব্যাকরণ বাজারে আছে যাহার লেখক যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করিয়াছেন। আমি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাকরণটির কথা বলিতেছি। এই ব্যাকরণে সাধু ভাষার সহিত চলিত ভাষাও স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাধুর আসনই মুখ্য। ব্যাকরণটি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহার রূপও সাধু। বস্তুতঃ তাঁহার নিজের পক্ষপাত সাধুর দিকেই।

বাজারের ব্যাকরণগুলিতে স্বভাবতঃই সুনীতিবাবুর অনুসরণ দেখা যায়। কিন্তু এগুলির মধ্যেও সর্বত্র মিল থাকে না। সুনীতিবাবুর ব্যাকরণের সংশোধিত নূতন

রূপ বাহির হইলেই বাজারিয়া ব্যাকরণগুলির আসল রূপটি প্রকাশ পায়। কোন্ ব্যাকরণ ছাত্রদের পাঠ্য তাহা আমাদের সরকারী শিক্ষাবিভাগ অথবা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কেহই স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন না।

অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করিয়া আমরা ব্যাকরণের কলেবর দুর্ভর এবং পাঠক্রম ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছি। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়[১] একটি আবশ্যিক প্রশ্ন থাকে কাব্যালংকার সম্বন্ধে। যাহারা একটি ছুটির দরখাস্ত শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে না, তাহারাও যেমন-তেমন করিয়া উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যতিরেক সমাসোক্তির সংজ্ঞার্থ মুখস্থ লিখিয়া কয়েকটি নম্বরের সংস্থান করিয়া লয়। তাহার কি ফল?

মাতৃভাষা সম্পর্কে আমাদের এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেশে শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারের দায়িত্ব যাঁহাদের হাতে তাঁহারা উদাসীন হইলে চলিবে না।

এমন একটি ব্যাকরণ বাংলা শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক যাহাকে কর্তৃপক্ষ প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের পছন্দমত বই নাই বলিয়া যদি তাঁহারা মনে করেন, তাহা হইলে সে বই লিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সে কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। শিক্ষাকর্তৃপক্ষের ইহা একটি বিশেষ দায়িত্ব। বাজারের বইগুলির কোনোটির সঙ্গে কোনোটির মিল নাই। তাহারই মধ্যে কোনো-না-কোনোটি কোনো-না-কোনো স্কুলে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। কেন হয় তাহা বলিতে ভরসা করি না। কিন্তু ছাত্ররা প্রশ্নের উত্তর লিখিবার সময় বিপদে পড়ে। তাহারা রাগ করিলে কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কর্তব্যে ত্রুটি হইলে সে কথা বলিবে কে?

চলিত বা সাধু যে ভাষারই চর্চা করি না কেন, শিখিবার জন্য ব্যাকরণ আবশ্যক। চলিত ভাষার পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। সাধু ভাষার একটা ধারা চলিয়া আসিতেছে, সাহিত্যিক চলিত ভাষা নিতান্তই অর্বাচীন।

আমরা মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন করিয়াছি। স্কুলে কলেজে সকল বিষয়েরই পঠন পাঠন হইতেছে বাংলায়। সাহিত্য-সংকলনের দুই চারিটি রচনা ছাড়া চলিত বাংলার সহিত ছাত্রদের যোগ নাই বলিলেও চলে। ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতি, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রজ্ঞান (Humanities) এবং বিজ্ঞানের (Science) যত বই ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত হইয়াছে তাহার বেশীর ভাগই সাধু ভাষায়। তাহাদের সমগ্র পাঠ্য বস্তুর শতকরা পঁচিশ ভাগও চলিত ভাষায় পড়ে কি না সন্দেহ।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখিতেছি রাজ্য-সরকার কিছুকাল হইতে চলিত ভাষা

১. সম্প্রতি উচ্চ-মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণীর) পাঠক্রম পরিত্যক্ত হইয়াছে। মাধ্যমিক এবং বি. এ.-বি.-এসসি.র মধ্যে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর একটি নূতন শিক্ষাস্তর প্রবর্তিত হইয়াছে।

প্রবর্তনে উৎসুক হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্য 'কিশলয়' নামক তিনখণ্ড সাহিত্যপুস্তকের নাম শিক্ষিত সমাজের অশ্রুত নয়। এই কিশলয়ের মধ্য দিয়া সরকারের সে ঔৎসুক্য অত্যন্ত প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯৬৪) কিশলয়ে সাধু ভাষার রচনা বর্জন করিবার নীতি গৃহীত হয়। সাধু ভাষার লেখকদের সম্বন্ধে কি করা যাইবে? কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন, সাধু ভাষায় লিখিত মূল রচনাগুলিও কথ্যরীতিতে রূপান্তরিত করা হইবে। তাহাই হইল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি স্বনামধন্য লেখকদের রচনা ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল। এই ভাষান্তরণ ব্যাপারটা অনেকেই প্রসন্নমনে গ্রহণ করিলেন না। কাগজে পত্রে প্রতিবাদ প্রবল হইয়া উঠিল। ফলে কর্তৃপক্ষ আবার নূতন করিয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। নূতন পর্যায়ের সম্পাদনার জন্য তাঁহারা যে সমিতি নিয়োগ করিলেন বর্তমান লেখক তাহার সহিত সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

আমি ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকগণের মূল রচনার উপর হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলাম। সে আপত্তি অন্যান্য সভ্যদের অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। তাহার ফল বিপরীত হইল। বাংলা দেশের শিশুরা তাঁহাদের রচনার আস্বাদ লাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল। চলিত ভাষা ভিন্ন সাধু ভাষার লেখা কিশলয়ে মুদ্রিত হইবে না, এ সিদ্ধান্ত পূর্বেই গৃহীত হইয়াছিল। তাহার পরিবর্তন হয় নাই। ভাল কথা, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ সরাইয়া দিয়া আমারা কি বাংলা শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়াছি? কিন্তু সে কথা এখন থাক।

সরকার প্রাথমিক স্তরে বা প্রাথমিক স্তর হইতেই সাধু ভাষা তুলিয়া দিয়া চলিত ভাষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বেশ কথা। কিন্তু নীতি গ্রহণ করিলেই তো দায়িত্ব শেষ হইবে না, তাহা রূপায়ণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিশলয় পুস্তকে চলিত ভাষার পাঠ বসাইয়া দিলেই কি সে কাজ সম্পূর্ণ হইবে? প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার জন্য সরকার যে গণিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভাষা চলিত হইল না কেন? যুক্তিটা কি? আরও এক কথা, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাদানের ভার যাঁহাদের উপর তাঁহারা কি চলিত ভাষায় বিশেষজ্ঞ? সাধু ভাষার নিয়মকানুন তবু কতকটা পাকা হইয়া গিয়াছে, চলিত ভাষার ভাঙা-গড়া এখনও শেষ হয় নাই। শীঘ্র যে শেষ হইবে এমন কথাও এই মুহূর্তে বলা যায় না। এই ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় যোগ্য শিক্ষকের নিতান্ত অভাব। চলিত ভাষায় লিখিতে পড়িতে শুদ্ধ উচ্চারণে বাক্যালাপ করিতে শিখাইবে কে?

সাধু ভাষায় 'আসিলাম' কথাটার এদিক ওদিক হইবার জো নাই। কিন্তু চলিত ভাষার বেলায় এলাম লিখিবেন, না এলুম লিখিবেন, না এলেম লিখিবেন ইহা লইয়া পণ্ডিতদেরই ধন্দ লাগিয়া যায়। অনেকের মুখে 'আসলাম' শুনিয়াছি এবং শুনিতেছি। প্রাথমিক শিক্ষক যদি তাঁহার শ্রেণীতে 'আসলাম' বলেন, তাঁহার হাত হইতে শিশুপালকে বাঁচাইবে কে?

বাংলা বানানের সমস্যা একটা দুস্তর সমস্যা। ছাত্ররা বানানে গুরুতর ভুল করে বলিয়া আমরা তাহাদের নিন্দা করি। কিন্তু ভুলের দায়িত্ব কতটা তাহাদের এবং কতটা শিক্ষকদের তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। চলিত ভাষায় বিপত্তি আরও বাড়িয়া যাইবে, কারণ, সেখানে অনিয়মের অন্ত নাই। প্রধান বিপত্তি ক্রিয়াপদের বানানে। সাধু ভাষায় যেখানে 'করিতেছি' লিখি সেখানে চলিত ভাষায় 'করছ ক'রছ কর্‌ছো ক'র্‌ছ কোরছ কোর্‌ছ কর্চ্ছ কোর্চ্ছ ক'র্চ্ছ কোর্চ্ছো করচ কর্‌চ কোর্‌চ কোর্চ্চো ক'র্চ্চ ক'চ্চ ক'চ্চো কোচ্চো' ইত্যাদি বিশ পঁচিশটা রূপ হইতে পারে। 'করিতেছ'-র কোনও বিকল্প নাই। 'করিতেছ'-র স্থলে কেহ 'কোরিতেছ' বা 'করিতেছো' বা 'কোরিতেছো' লেখার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। কিন্তু 'করছ'র বেলা সবই সম্ভব, যাঁহার যেমন খুশী বানান করিতেছেন। এমন একটা অভিধান পর্যন্ত নাই যাহার সাহায্যে একটা নির্দেশ পাওয়া যায়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি চলিত বানানের নিয়মাবলী বাহির হইয়াছিল কিন্তু তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, আট পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। তাহাতে বানানের ইঙ্গিতটুকু মাত্র দেওয়া হইয়াছে। সে ইঙ্গিতও যদি সকলে অনুসরণ করিতেন তাহা হইলেও কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যাইত। কিন্তু লেখকসমাজ সেদিকে কদাচিৎ দৃষ্টি দেন। প্রকাশকরা অবহিত হইলেও কাজ চলিত। কিন্তু দুই একটি অভিজাত প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান ছাড়া বানানের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে কেহই শিরঃপীড়া অনুভব করেন না।

এ অবস্থায় শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সাধু ভাষা তুলিয়া দিয়া কেবলমাত্র চলিত ভাষা চালু করিবার প্রয়াস সংগত হইবে কি? যতক্ষণ না উপযুক্ত গ্রন্থাদি বিশেষতঃ অভিধান ও ব্যাকরণ রচিত হইতেছে এবং যতদিন না প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শুধু বাংলার নয় সকল বিষয়ের শিক্ষক, চলিত ভাষায় লিখন পঠন শিক্ষা দানের মত যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন, অন্ততঃ ততদিন পর্যন্ত পুরাতন রীতিই চালু থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

সংস্কৃতের শব্দসম্পদেই বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলি, "সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কি জ্ঞানের কি ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ-বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে।"—সাধুভাষার বই না পড়িলে স্বভাবতঃই সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে বেশী পরিচয় ঘটিবে না। ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের

ভিত্তি দুর্বল হইয়া থাকিবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের স্থান কিরূপ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। সাধু ভাষার চর্চাও যদি বন্ধ করিয়া দিই তাহা হইলে ক্ষতির পরিমাণ নিদারুণ বাড়িয়া যাইবে। অন্য কোনো দিক দিয়াই তাহার পূরণের উপায় থাকিবে না।

কাব্যের ভাষার কথাটাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ হইতে যত কাব্য রচিত হইয়াছে তাহা কোন্ ভাষায়? এখন যাহাকে ভাষার সাধুরূপ বলি তাহাই সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যের অবলম্বন। কাব্যের ভাষা যে গদ্যের ভাষার মত সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক হইতে পারে না তাহা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু সে ভাষারও একটা ছাঁদ আছে সেটা সাধু ছাঁদ। সে ছাঁদ বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষাকে সমগ্র বাংলার সুবোধ্য করিয়াছে। চাটগাঁইয়া কথ্য বাংলা আজও বীরভুঁইয়া বাঙালীর পক্ষে বোঝা কঠিন। কিন্তু সাধু ভাষার ছত্রচ্ছায়ায় বঙ্গদেশের পূর্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ একত্র আশ্রয় পাইয়াছিল। রবীন্দ্রকাব্য হাল আমলের জিনিস কিন্তু তাহারও অধিকাংশই সাধুভাষার আধারে রচিত। প্রাচীন বলিয়া 'ধ্রুপদী' বলিয়া সেগুলিকে অতিভক্তি সহকারে পুস্তকাধারের সর্ব্বোচ্চ শিখরে তুলিয়া রাখিবার দুর্মতি যেন আমাদের পাইয়া না বসে। সাধু ভাষায় লিখিত সাহিত্যের যে মহৎ ঋকৃথ আমরা পূর্ব ঋষিদের নিকট হইতে পাইয়াছি তাহা শুধু পরিমাণে বিপুল নহে তাহার গৌরবও সুমহান্।

এতক্ষণ ধরিয়া আমার মনোভাবের একটা আভাস দিয়াছি। এবার স্পষ্টাক্ষরে আমার অভিপ্রায়টি প্রকাশ করি।

বাংলা সাহিত্যে চলিত এবং সাধু দুই ভাষাই চলিতেছে। দুই ভাষাই চলুক। দুই ভাষাকেই চলিতে দেওয়া হউক। লেখক আপন রুচি ও শক্তি অনুসারে স্বীয় রচনার বাহন নির্ণয় করুন। যাঁহার হাতে সাধু ভাষা সহজে আসে, কেবল আধুনিকতার মোহবশতঃ তিনি যদি চলিত আশ্রয় করেন তাহা হইলে সাহিত্যের লাভ হইবে না কিন্তু তাঁহার ক্ষতি হইবে। ভাষার দুই ভঙ্গী চলিলে শক্তির অপচয় হইবে এমন কথাও মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না। ভাষার শতাধিক রীতি চলিলে তো সে কথা বলি না। রীতির বৈচিত্র্য যেমন বৈচিত্র্য, রূপের বৈচিত্র্যও তেমনি বৈচিত্র্য। সে বৈচিত্র্য ভাষাকে শক্তিশালী করিবে। চলিত রূপের মাধ্যমে যেমন একাধিক রীতির উদ্ভব হইয়াছে সাধুরূপের লেখকদের হাত দিয়াও তেমনি কত রীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে একবার ভাবিয়া দেখুন। সাধুভাষার চর্চা দীর্ঘকালের, স্বভাবতঃ সাধুরূপাশ্রিত রীতির সংখ্যা অনুপাতে অনেক অধিক। সাধু ভাষার প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া না দিলে সাধুভাষার লেখককে নিরুৎসাহ না করিলে সে সংখ্যা অধিকতর হইবে। তাহাতে সাহিত্যের লাভ হইবে না এমন কথা মনে করিব কেন?

যদি বলেন ব্যাপকভাবে সাহিত্যের প্রবণতা যখন চলিতের দিকেই দেখা

যাইতেছে তখন চলিত রূপের অনুশীলনে মনোযোগী হওয়া উচিত, তাহা হইলে যত সত্বর হওয়া যায় ততই ভাল।

এ বিষয়ে আমার মত, চলিত সাধু উভয় রূপেরই অনুশীলন করিব। উভয়-প্রকারের সাহিত্য পাঠ করিব। বিদ্যাসাগর বঙ্কিম হইতে শুরু করিয়া, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তারাশঙ্কর সুধীন্দ্র দত্ত বিষ্ণু দে কাহাকেও বাদ দিব না। তেমনি বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ও কথামালা হইতে বঞ্চিত করিবার প্রয়াসকেও নিন্দা করিব।

আমার দ্বিতীয় মত এই যে লেখাটা সাধু ভাষা দিয়াই আরম্ভ করা ভাল। শিক্ষকদের পক্ষেও সুবিধা শিক্ষার্থীর পক্ষেও সুবিধা। কেন সুবিধা তাহা পূর্বে বলিয়াছি পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। সাধুভাষায় লেখা অভ্যাস করিবার পর কেহ যদি চলিত ভাষায় লিখিতে চান লিখিবেন তাহাতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই। সাধুভাষায় যাহার হাত পাকিয়াছে চলিত ভাষায় তাহার হাত অনায়াসে চলিবে। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তারাশঙ্কর তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

চলিত ভাষায় যাঁহাদের লেখা শুরু হইয়াছ সাধুর পথে তাঁহাদের আর কখনো পা বাড়াইতে হয় নাই, হইলে ফল কি দাঁড়াইত তাহা বলিবার উপায় নাই। কিন্তু যাঁহারা চলিত ভাষাকে দ্বিতীয় পক্ষ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে তাহার প্রসন্ন আনুগত্য লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ চলিত ভাষা আজ যে শক্তি যে দীপ্তি যে ঐশ্বর্যের গৌরবে গৌরবান্বিত সে গৌরব তাঁহাদেরই দেওয়া। সাধুভাষার উত্তরাধিকার লইয়াই চলিতের প্রসার প্রতিপত্তি। আজও সাধুভাষাকে পাশাপাশি চলিতে দিলে চলিত ভাষারই লাভ।

সাধু ভাষার ব্যবহার আরও একটি কারণে চালাইয়া যাওয়া আবশ্যক মনে করি। আমরা আজকাল জাতীয় সংহতির কথাটা সভা-সমিতি সংবাদপত্র এবং সরকারী ইস্তাহারে প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি। সাহিত্যকেও সে কাজে লাগানো যায়। বাংলা সাহিত্য প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া সে কাজ করিয়া আসিতেছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রমুখ সারস্বতগণের মধ্য দিয়া আমরা ভারতের বৌদ্ধিক জগতে সম্মানিত আসন লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের রচনা কখনো মূলতঃ কখনো অনুবাদের সাহায্যে আমাদের পরিচয় বহন এবং বিস্তার করিয়াছে, দূরকে নিকট বন্ধু এবং পরকে ভাই করিয়া তুলিবার পথ দেখাইয়াছে। বিদেশীর পক্ষে বিভাষীর পক্ষে কথোপকথনের ভাষা অপেক্ষা সাহিত্যের সাধু ভাষা অপেক্ষাকৃত অনায়াসবোধ্য। কাজ চালাইয়া লইবার মত কথ্য ভাষার যৎসামান্য জ্ঞান থাকিলে ভ্রমণকারীর কাজ চলে। সাহিত্যচর্চার পক্ষে জ্ঞানের মান অনেক উন্নত হওয়া আবশ্যক। সাধুরূপের মাধ্যমে সে জ্ঞান যত সহজে অর্জন করা যায় চলিতের মাধ্যমে ততটা যায় না বলিয়াই আমার ধারণা। তাহার কারণও সুস্পষ্ট। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের মুখ্য ভাষাগুলির আদি জননী

সংস্কৃত। দক্ষিণভারতের ভাষাগুলি দ্রাবিড়ী হইলেও সংস্কৃত শব্দসম্ভারে ইহাদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ।

পরিশেষে শুধু এই কথাই বলি যে, চলিত ভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমি কোনো তর্ক তুলিতেছি না। আমার আপত্তি সাধু ভাষার বর্জনে। সাধু ভাষা বর্জন না করিলে চলিত ভাষার পথ সুগম হইবে না—এই ধারণা অমূলক। আমার বিশ্বাস উভয়ের সহাবস্থান সম্ভব এবং সঙ্গত। এবং সেরূপ সহাবস্থান উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। গত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস সেই সত্যই সপ্রমাণ করিয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপভাষা

যতই দিন যাইতেছে ততই মানুষ মানুষের কাছাকাছি চলিয়া আসিতেছে। পর ভাই না হউক, দূর যে দুয়ারে আসিয়া পৌছিতেছে তাহা প্রতিদিনই লক্ষ্য করিতেছি। পথঘাট সুগম এবং চলাচল ব্যবস্থা দ্রুততর হওয়াতে পল্লী ও নগরের ব্যবধান ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। নৈকট্যসাধনে স্কুল কলেজ সিনেমার ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। নৈকট্য যে কেবল আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদ চিন্তা-ভাবনার দিক হইতেই দেখা যাইতেছে তাহা নয়, লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে মুখের ভাষাও ধীরে ধীরে এক হইয়া যাইতেছে। আমরা যে ভাষাকে আদর্শ ভাষা বলি, স্কুলে-কলেজে, সভায়-সমিতিতে, সর্বপ্রকার শিষ্টজন-সম্মিলনে যে ভাষায় ভাবের আদানপ্রদান করিয়া থাকি, প্রাদেশিক কথ্য ভাষাগুলির উপর তাহা অনিবার্যবেগে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ফলে নগরের ভাষা ও গ্রামের ভাষা এক হইয়া যাইতেছে।

শিক্ষিত শিষ্টজনেরা প্রাদেশিকতা—সর্বপ্রকারের প্রাদেশিকতা—সযত্নে পরিহার করিতেছেন এবং তাহাই স্বাভাবিক। তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সমাজের অনুন্নত অংশও 'নাগরিকতা' শিক্ষা করিতেছে। প্রাদেশিক ভাষায় প্রাদেশিকতার বৈশিষ্ট্য আজ সেই কারণেই দুর্লভ। দুই চারিজন গ্রামবৃদ্ধা ছাড়া কাহারও মুখে আর বিশুদ্ধ প্রাদেশিক ভাষা শুনিতে পাওয়া যাইবে না। পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিতে চান তাঁহাদের সংগ্রহণযোগ্য উপকরণ আর অনায়াসলভ্য নহে। এখনও যেটুকু আছে তাহাও যায় যায়। প্রাদেশিক উপভাষা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গে গবেষণার কাজ চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুগণের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। এই প্রবন্ধে মেদিনীপুর জেলার একটি আঞ্চলিক উপভাষার কথা বলিব।

গ্রিয়ার্সন তাঁহার লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া গ্রন্থে এই উপভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কথিত হয় বলিয়া তিনি ইহার নাম দিয়াছেন South West Bengali বা দক্ষিণ-পশ্চিমা বাংলা। মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ জুড়িয়া এই ভাষার প্রচলন-ক্ষেত্র। অন্যান্য সকল আঞ্চলিক ভাষার মত ইহারও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আদর্শভাষার কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে। এখনও যাহা আছে তাহার নিদর্শন সংগ্রহ করিতে হইলে অন্তঃপুরিকাদের কাছে যাইতে হইবে। সঙ্গে শুধু কাগজ-কলম নয়, টেপ রেকর্ডার লইতে হইবে।

বাংলা ও ওড়িশার সীমারেখা হয়তো একাধিকবার পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু সে পরিবর্তন রাজনৈতিক পরিবর্তন, ভৌগোলিক পরিবর্তন। দেশের অধিবাসী এবং তাহার অধিবাস তো আর সে পরিবর্তন মানিয়া ভূমিরেখার অনুবর্তন করিয়া চলে নাই। বাংলা দেশের দক্ষিণে ওড়িশা রাজ্যে এমন মানুষ বিরল নয়

যাহার মাতৃভাষা বাংলা, আবার ওই সীমান্তের এপারে এমন বাঙালী এখনও আছেন যাঁহারা অন্তঃপুরে ওড়িয়া এবং বহিঃসমাজে বাংলা বলিয়া থাকেন। সমাজের উচ্চস্তরে এই দ্বিভাষিকতা স্বভাবতই বিরল হইয়া আসিতেছে। ঘরে যাহারা এককালে ওড়িয়া বলিত তাহাদের অধিকাংশই এখন ঘরে বাহিরে উভয়ত্রই বাংলা বলিতেছে। সে বাংলায় ওড়িয়ার ছাপ যে থাকিবে তাহা স্বাভাবিক।

দুই ভাষার সীমান্ত ভৌগোলিক সীমান্তের মত লাইন টানিয়া বেড়া তুলিয়া ভাগ করা যায় না। তথানির্ণীত ভাষাসীমান্তের দুই দিকেই দুই ভাষানদীর সুদূরব্যাপী সম্মিলন চলিতে থাকে। মেদিনীপুর সীমান্ত হইতে বালেশ্বরের বেশ কিছুদূর পর্যন্ত যে ওড়িয়ার প্রচলন তাহাতে বাংলার মুখের আদল আছে। তেমনি বালেশ্বর সীমান্ত হইতে মেদিনীপুরের কিছুদূর পর্যন্ত যে বাংলার ব্যবহার ওড়িয়ার সঙ্গে তাহার বেশ মাখামাখি। আলোচ্য ভাষা স্বভাবতই ওড়িয়ার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত।

গ্রিয়ার্সন বলিয়াছেন দক্ষিণ-পশ্চিমা বাংলা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মুখেই কথিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "The members of the Kaibartta class speak the curious dialect which I have named S.W. Bengali and they are so numerous in the centre of the District and the west of the Tamluk Subdivision that the language must be considered the main language of the tract."

এই উপভাষা কেবল কৈবর্ত নামক সম্প্রদায়টির দ্বারা কথিত হইত কি না তাহা প্রমাণ করা কঠিন। আজিকার অবস্থা দেখিয়া কোনো সিদ্ধান্ত করা যাইবে না, কারণ আজ এ ভাষার ব্যবহারই নিতান্ত বিরল। গ্রিয়ার্সন যাঁহাদের কৈবর্ত বলিয়াছেন তাঁহাদের সকলের মুখেও এ ভাষা সচরাচর শোনা যায় না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিবার আছে। গ্রিয়ার্সন কৈবর্ত বলিয়া যে সকল পরিবারের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ নিজেদের কৈবর্ত বলেন না। অন্যে তাঁহাদের কৈবর্ত বলিলে তাঁহারা অপমান বোধ করেন। নাম না লইয়া আমরা বরং অঞ্চলটার কথাই ধরি। সেটা এই।—মেদিনীপুর ও ডেবরা থানার দক্ষিণ, শবং থানা সম্পূর্ণ, নারায়ণগড়ের উত্তর, পাঁশকুড়া তমলুক ও নন্দীগ্রামের পশ্চিম। প্রধানতঃ এই অঞ্চলটি আলোচ্য ভাষার কথ্যভূমি। এই ভাষাঞ্চলের ঠিক দক্ষিণে কাঁথি থানা। কাঁথির দক্ষিণ হইতে ওড়িশা আরম্ভ। গ্রিয়ার্সন কাঁথির ভাষাকে বাংলা বলেন নাই। বলিয়াছেন বাংলা-ওড়িয়া মিশ্র ভাষা। লিঙ্গুইস্টিক সার্ভের প্রকাশ কাল ১৯০০। সে সময় হয়তো তাহা সত্য ছিল, বর্তমানে কাঁথির ভাষাকে আর মিশ্র ভাষা বলা সংগত হইবে না, বরং ওড়িয়া-প্রভাবিত বাংলা বলাই উচিত হইবে। তবে এখনও এই অঞ্চলের কোনো কোনো পরিবারের মধ্যে দুই ভাষার প্রচলন আছে। অন্তঃপুরে কখনো কখনো ওড়িয়া কথিত হয়।

ওড়িশার সীমান্ত হইতে কিছু দূরে হইলেও এই উপভাষার উচ্চারণরীতি এবং ব্যাকরণ উভয়ত্রই ওড়িয়ার প্রভাব সুস্পষ্ট। আলোচ্য ভাষার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হইল।

ব্যঞ্জন

বর্গীয় ব। পাওয়া খাওয়া প্রভৃতি শব্দে আদর্শ ভাষায় অন্তঃস্থ বয়ের উচ্চারণ হয়। আলোচ্য ভাষায় ওই সকল ক্ষেত্রে বর্গীয় ব উচ্চারিত হয়। যথা.—খাবাইলু্ (খাওয়াইলি), পাবাইলু্ (পাওয়াইলি), দিবা-থুবা (দেওয়া-থোওয়া)।

ব ধ্বনির কোথাও কোথাও বিলুপ্তি ঘটে। যেমন,—আপ্পা (<বাপ্পা)।

শব্দের মধ্যস্থিত ব কখনো কখনো অঘোষ হয়। যেমন,—চেপি (<চর্বি), ধুপ্পানন্দ (<ধ্রুবানন্দ)।

ড, ড়। আদর্শ ভাষার মতই আদিতে ড, অন্যত্র ড়। যুক্তাক্ষরে ড। যেমন—এণ্ডরিপেণ্ডরি (ছেলেপিলে)। ণ যুক্ত ড (ণ্ড)-এর ড় হইবার দিকে প্রবণতা আছে। এই ড্ যখন ড় হয় তখন ণ চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং পূর্বস্বরে যুক্ত হয়। যথা,—গঁড়া (<গণ্ডা), তুঁড় (<তুণ্ড), দঁড়পাট (<দণ্ডপাট)।

ল। অনাদি ল-এর উচ্চারণ আদর্শ ভাষার মত। ল-এর দ্বিত্ব হইলেও উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন,—কল্লা (ভান), পাল্লুনিক (পারিলে না), কুল্লে (মোটে)।

পদমধ্যে বা পদান্তে স্থিত ল-এর উচ্চারণে বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা [l] পার্শ্বিক (lateral) ল এবং তাড়িত (flapped) ড়-এর মধ্যবর্তী। বৈদিক ভাষায় এই ধ্বনির প্রচলন ছিল, পরবর্তী কালে ইহা ড়-এ পরিণত হয়। 'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্'—এস্থলে ঈড়ে-র ড় ধ্বনি স্মরণীয়। ল-এর 'তাড়িত'-ত্ব বর্তমানে আর তেমন শোনা যায় না, অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই প্রায় লোপ পাইয়াছে। তথাপি লাতি লাউ লেম্‌সি প্রভৃতি শব্দের আদ্য ল এবং আইলা পোইলা দাখিল খোল্ চালুণী প্রভৃতি শব্দের অনাদ্য ল-এর উচ্চারণে ঈষৎ পার্থক্য আছে, তাহা সতর্ক কর্ণে ধরা পড়িবে।

ড় র। ড় ও র-এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই অঞ্চলে পাঠশালার পড়ুয়ারা কখনো বর্ণ পরিচয় করিবায় সময় ড-য়ে শূন্য ড় বা ব-য়ে শূন্য র বলে না, অন্ততঃ আগে বলিত না। একালে বোধ হয় বলিতে শুরু করিয়াছে।

ন ণ। মূর্ধন্য ণ-এর প্রাচীন উচ্চারণ [ɳ] এই ভাষায় বর্তমান আছে। সংস্কৃতে এই ধ্বনি ছিল। ওড়িয়া মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি কোনো কোনা আধুনিক ভাষায় এই ধ্বনি এখনও আছে। এই উচ্চারণ কতকটা ন ও ড় এর মধ্যবর্তী, অনেকটা

ড়ঁ-এর মত। শব্দের আদিতে ন-এর মূর্ধন্য উচ্চারণ হয় না। মূর্ধন্য বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে যুক্তাক্ষরেও হয় না। যথা,—নিখঁাউতী, নিদাউঠুি, নাই, নাম, মন্নিষ, কন্নে, ধন্যি, গন্না—দন্ত্য উচ্চারণ। কিন্তু জাণি (jaṇi), বালিকানায় (balikaṇay) —মূর্ধন্য উচ্চারণ।

শব্দের আদিস্থিত ন-এর ল হইবার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন,—লয় (নয়), লিস্তার (নিস্তার), লিব্‌ভা (নির্বাহ), লিচ্চয় (নিশ্চয়), লিচ্ছুক (নিছক)।

ঢ ঢ়। আদর্শ বাংলার মতই ঢ় কদাচিৎ শোনা যায়। শব্দের আদিতে ঢ অবিকৃত থাকে, যুক্তাক্ষরেও তাই। যেমন,—ঢোল, ঢাক, গোবাড্‌ঢান। অন্যত্র অনাদি ঢ় ড়-এর মত শোনায়।

মহাপ্রাণ। গ্রিয়ার্সন বলিয়াছেন, আলোচ্য ভাষায় মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণে পরিণত হইবার দিকে একটা প্রবণতা আছে। সাধারণভাবে সেটা সত্য বটে, কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, আদর্শ ভাষা অপেক্ষা তাহা অনেক কম। আদর্শ ভাষায় স্বরযুক্ত মহাপ্রাণ বর্ণও কখনো কখনো মহাপ্রাণতা হারায়। মেজো, বাঁজা, সাঁজের, বাআন্ন। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন লেখায় আসচে ভাবচে হচ্চে মরচে চাচ্চি (চাচ্ছি) প্রভৃতি বানান অবিরল। আলোচ্য ভাষায় স্বরযুক্ত মহাপ্রাণ কদাচিৎ অল্পপ্রাণ হয়। বরং অল্পপ্রাণ বর্ণকে কখনো কখনো মহাপ্রাণ হইতে দেখি। যেমন,—মেডুণফুর (মেদিনীপুর), বঠে (বটে), বাফু (বাপু)। মধ্য হইতে আগত হইলেও আদর্শ বাংলায় 'মেঝো' কেহ বলেও না এবং লেখেও না। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমা বাংলায় 'মাঝ্যি' শব্দে মহাপ্রাণ আছে। প্রাচীন বাংলার হাবলাষ (<অভিলাষ) শব্দটি এখানে পাওয়া যায়। এখানে মহাপ্রাণ ধ্বনি স্থান বদলাইয়াছে। কিন্তু আদর্শ বাংলার 'ফেলারাম' আলোচ্য উপভাষার মহাপ্রাণ হারাইয়া 'পেলারাম' হইয়াছে।

বর্ণদ্বিত্ব। শব্দ-মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে দ্বিত্ব হইবার প্রবণতা দেখা যায়। শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরেই ইহার প্রাধান্য। যেমন,—শীত্তল (শীতল), ভোক্কে (ভোকে), মাচ্চা (মাচা), লিচ্ছক (নিছক), আপ্পা (বাপা)।

স্বর

আলোচ্য উপভাষার স্বরধ্বনিতেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। তাহার মধ্যে অপিনিহিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন,—আঁইখ (আঁখি), মৈচ্ছ (মৎস্য), বুইস্যা (বসিয়া), আইস্যা (আসিয়া), চইড়্যা (চড়িয়া)।

য় য়া প্রায়ই ইতে পরিণত হয়। যেমন,—গোইণা (গয়না), পোইলা (পয়লা), পোইতী (পোয়াতী), গমাই (গোময়)।

ক্ষ ও জ্ঞ এর উচ্চারণে ই-ধ্বনির আভাস আছে। পইখ্যে (পক্ষে), আইগ্‌গ্যা (আজ্ঞা), লইখন (লক্ষণ)। এই ক্ষেত্রে ওড়িয়ার সহিত মিল আছে।

আদর্শ ভাষায় প্রচলিত স্বরসংগতি আলোচ্য ভাষায় বিরল। যেমন,—ধুলা কুটা মুড়া জুতা চুলা গুলা। ধুলো, কুটো মুড়ো প্রভৃতি রূপ এ অঞ্চলে অজ্ঞাত।

আদর্শ ভাষায় শোয়া লোটা তোলা ধোঁয়া মোওয়া। কিন্তু আলোচ্য ভাষায় শুয়া লুটা তুলা ধুঁয়া মুয়া (<মুখ) প্রভৃতি মূল রূপ বজায় থাকে। আকারের পূর্ববর্তী উ কারগুলি ও হয় না।

আকারের পূর্বে ও-কার থাকিলে তাহা কখনো কখনো অ হইয়া যায়। যেমন,– গলাম (গোলাম), দকাণ (দোকান), বতল (বোতল), মটা (মোটা), গটা (গোটা), খট্টা (খোট্টা), দক্‌তা (দোক্তা), তমার (তোমার), খকা (খোকা), বকা (বোকা), কঁছা (কোঁছা), গড়া (গোড়া), পণা (পোনা), পড়া (পোড়া)।

আকারের পূর্ববর্তী ও-কার বিকল্পে উ-কারও হয়। যেমন,– গুলাম (গোলাম), কুম্পানি (কোম্পানি), পড়া ও পুড়া (পোড়া), বাইগন পুড়া (বেগুন পোড়া), পড়ামুআ (পোড়ার মুখো)।

ব্যাকরণ

কারক বিভক্তিতে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়।

অপাদানে হু, উচ্চারণ ণু। সে মুড়াণু ই মুড়া (সে প্রান্ত হইতে এ প্রান্ত), রাজার পিঁড়াণু (রাজার বাড়ি হইতে)।

সম্প্রদানে ও অধিকরণে কে। কিসকে (কিসের জন্য), এউ ভাদর মাসকে (এই ভাদ্র মাসে), কবিকে যে বুদ্ধ্ হবে (কবে যে বুদ্ধি হইবে), বাপঘরকে বয়্যা দিছে (বাপের বাড়িতে বহিয়া দিয়াছে), কাইকে (কোথায়), মন্নেকার সাইকে আসবিণ (আমাদের গ্রামে আসিবেন), মাথি পিঁড়াকে গিজ্জোটে খবর আস্‌সে (মাথি বাড়িতে গেজেটে খবর আসিয়াছে)।

সম্বন্ধে-কার। বহুবচনে-কার বিভক্তির ব্যবহার হয়। যেমন,—তন্নেকার (তোদের), আমান্নেকার (আমাদের), যারাকার (যাহাদের), বৌমেণকার (বৌদের)। তুলনীয় ওড়িয়া মনুষ্যমাণঙ্কর।

বহুবচন। -রা, -মাণে, -শে, -গা, -মেন, -বিন্দোল প্রভৃতি যোগে। যেমন,— আমান্নে (আমার + নে = আমরা), কাহারমাণে (কাহারগণ), ধাণমাণকে (ধানগুলিতে), কথাগা (কথাগুলা), কত্তগি (কতগুলি), তমামগাকে (সবগুলাকে), ছেণাপেণাবিন্দোল (ছেলেপিলেগুলি)।

বহুত্ববাচক বিশেষণ যোগে। ব্যাক গুলাম (সব গোলাম, গালি), বিকুর্ল মড়ামড়ীকে (সব মড়ামড়ীকে, গালি)।

ধাতুরূপ

বর্তমান। নিত্য। কই (বলি), দেই (দেয়), কউ (বলিস), বলু (বলিস), আইসে (আসে), জাণন (জানেন), আছু (আছিস), খুজু (খুঁজিস), ক (বল), কণ (বলেন)।

বর্তমান। ঘটমান। করিবঠি, করিঠি (করিতেছি), কউঠু (কহিতেছিস), করুব্‌ঠু করুঠু (করিতেছিস), লেউঠু (লইতেছিস), দেখুবঠু, দেখুঠু (দেখিতেছিস), পেলিঠি (ফেলিতেছি), কইঠি (বলিতেছি), উঠায়ঠে (উঠাইতেছে), ফাটেঠে (ফাটিতেছে), দেখঠ (দেখিতেছ), করঠণ (করিতেছেন)।

বর্তমান। পুরাঘটিত। দিছি (দিয়াছি), কচ্ছি (করিয়াছি), আস্‌সি (আসিয়াছি), আস্‌স্থু (আসিয়াছিস্), শুনছু (শুনিয়াছিস), ধচ্ছে (ধরিয়াছে), কচ্ছ (করিয়াছ), কইছণ (কহিয়াছেন)।

বর্তমান। অনুজ্ঞা। কর (পার কর হে), আইস, বুস, উঠ্, বুস্, লেউ, যাউ, করু (করুক), জিগাস্ (জিজ্ঞাসা কর)।

অতীত। সাধারণ। গেণি (গেলাম), আইণি (আসিলাম), ডুবণি (ডুবিলাম), হৈল, গেলু (গেলি), কল্লু (করিলি), আইল (আসিল), ছিলণ (ছিলেন), কইল (কহিলে)।

অতীত ঘটমান

অতীত। নিত্য। হৈত, উঠত, বসত, পাইতিন (পাইতাম), আসতিন (আসিতাম), লিতু (লইতে), খাতণ (খাইতেন)।

অতীত। পুরাঘটিত। আস্‌সলণ (আসিয়াছিলেন), আসসিণি (আসিয়াছিলাম), বারাইছিলু (বাহির হইয়াছিলি), আস্‌সল (আসিয়াছিলে)।

ভবিষ্যৎ। সাধারণ। গাড়ব (তুমি পুঁতিবে, আমি পুঁতিব), যাবিণ (তিনি বা আপনি যাইবেন), থাবে (থাকিবে)।

ভবিষ্যৎ। অনুজ্ঞা। অনুজ্ঞায় সাধারণ ভবিষ্যতের রূপই বজায় থাকে। যেমন,—ভাত ছাড়বি তবু সাঁথ ছাড়বি নি।

কৃৎ। ইতে, ইলে, আ, ইয়া, ইবার। কইতে, অজ্জাইতে (অর্জন করিতে), কল্লে (করিলে), হৈনে (হইলে), বুলা (যে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেমন, বুলা গয়লা), দিবা থুবা (দেওয়া থোওয়া), ধাঙ্যা ধাইপ্যা (ধাইয়া ধাপাইয়া), লিবার (লইবার)।

সর্বনাম

উত্তম পুরুষ। মুই, মোকে, মন্নে, আমান্নে, মোরহে (<মোর ঘরে<মোর ঘরের = অর্থ মৎসংক্রান্ত), মন্নেকার, আমান্নেকার।

মধ্যম পুরুষ। তুই, তোকে, তন্নে, তুমি, তমার, তমান্নে, তমারহে ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ। সে, তিণি, তিণ, তাণ (তাঁহার)। অ্যার ঘরে ইণ তাণ ঘরে তিণ (ইহার ঘরের ইনি তাঁহার ঘরের তিনি)।

সমাস

দ্বন্দ্ব। ঘদ্দর (ঘর দ্বার), লুহাখাড়ু, ছুঁচছড়া, কাবাকুইলি, পড়েকছড়েক।

কর্মধারয়। ছাঁই-(ছাঁকনি) জাল, কুণীবুড়ী, গুয়াপেতী, আঁইস্যাপেতী, আমভোক (প্রথম ক্ষুধা)।

তৎপুরুষ। করমকুড়ী, তাম্বাহাঁড়ি, পুন্নাকাল্যা, বাপঘর, গেড়্যাঘাট, জুণি পোক (জোৎস্না পোকা=জোনাকী), রসকাঁদনা।

উপপদ, বহুব্রীহি। কাবাউড়াণী, পোড়পুড়ী, বেলগিল্লা (বেলগিলা ছাত্তি= বেল গিলিতে পারে এমন বুক) কোপুরকাঁতি (<কর্পূরকান্তি, একজাতীয় ধান), বৌ-খেঁটকী, আগাধুয়া, আদাঁতঘসা, পাঁকতাড়ী, গাড়পশা, গব্বাখাউকী।

প্রবাদ প্রবচন

হেলায় কায্য নাশায়।

দাঁড়ায় মাড়ায় খড়াস্,
মণ পটে ত কর্ব কাজ
নাইতো পিছুর বাটে হড়াস্।

দাতা বড় ভগমাণ,
ঘোল খাবি তো চালুণ আণ।

বাপের গায়ে নাইক মল্যা চাম
বাজনায় কিতিকিতি।

জাউ খাবি না মাছি তাড়াবি?

থিতি ধণে বিনশ্যতি।

ঠকায় কিষ্ট ঠকায় রাম।

তোর ধাঞ্যা ধাইপ্যা রার
মোর বুস্যা থায়্যা তের।

তোর খেতে পড়ু বাজ
মোর ধাণমাণকে কাজ।

পরের বেদণ পর কি জাণে
জাহাণ থাকতে হাঙ্গলে টাণে।

হাণ তো হাণ তাঁত কামাই।

যা নাই দেখবে ছুলয়াণে
পিত্তে না যাবে গুরুর বচণে।
ঘোল কেণে পাণ্যারে
না গরাক ধচ্ছে টাণ্যা।
খালি নামে গলা কাঁজি ভৈখণ।
তুই জাণু কি মুই জাণি আর জাণে হর‍্যা
মর‍্যা গেছে তোর বাপ মোর ছপণ কড়ি ধার‍্যা।
দড়ি মাজণে সরু কথা মাজণে মটা।
ছেলিয়ে যেদি পোতলি মাড়ত
তেবে গোরু বাছুরে পিরোজণ কি ?
কাজের বেলা ন ইক সাড়া
পতর পাড়তে হাজার গঁড়া।
কাইকার বা কে
ছুটা তমড়া ভাতে দে।
মুড় বজর বল্যা কি পাথরে কুড়বি ?
পাথরে হাত পশক্যা পস্তাইলে কি হবে ?
হাস্যা দিণে ভাস্যা গেণি।
সাপ যেঠি নেঞ্জুর সেঠি।
মুরাদে নাই সীমা।
পচ্চা মাছে গীমা॥
লৈ নাই দেখ্যা ন্যাংটা হয়্যা ঢাপাসি খায়।
ধস ধস ধস্কা।
তিন মুড় তার দশ পা (ধাঁধা)॥
চাক্কা চাক্কা গোল গোল।
উপর নিদা ভিতর পোল (ধাঁধা)॥
হৈল বুড়ীর ঘরকন্না।
বুড়ীকে বার কন্না রে বার কন্না॥
মুণিব পায়ণি কুঁড়া চাকর নুড়া নুড়া।
বাট জাণি ঘাট জাণি কুটা গাদার আছাড় জাণি
কি করব জাদু মর‍্যা আছি।
বিল্লী জাণবেণি ভাত হাঙ্গল জাণবেণি পাত।
পরের ধণে পরধাণী শুকা ডোলে মহাজণী॥
রঙের বেলা রাঙের কড়ি
রঙ্ ফুরাইলে গড়াগড়ি।

কয়েকটি বিশিষ্টার্থক বাক্য ও বাক্যাংশ

মু মুড়ে (অনিচ্ছা প্রকাশ করে)। কঁপা-কাত করা (বিপদে ফেলা)। পাণির পুড়া (অসম্ভব ঘটনা)। তু কচ্ছে ত হু (হ্যাংলামি)। ভুঁই অঁ্যাচুড়্যা পড়া (আলসেমি করিয়া শুইয়া থাকা)। পয্যাপালা (যেমন তেমন করিয়া সারা)। ভগার খালে ডুবা (গঙ্গা স্নান করা)। দমে জাহাণে লাগা। নাইর বা বইছে ('নাই' এই কথার বাতাস বহিতেছে। যাহাকে কোনো জিনিস চাহিলে না না বলে তাহার সম্বন্ধে উক্তি)। অমুকের মুঞে জুমড়া জাঁকি (মুখে জ্বলন্ত কাঠ দিই। গালি)। আঁউঠ গাড়া তাণিক (প্রসব করা অবধি)। দাঁতবাম্থি করা (ঝগড়া করা)। মাপ্সাদ লাগ্যি করিণি (অন্নস্পর্শ করি নাই)। গা নামা (গর্ভস্রাব হওয়া)। বান্নি পরাপৎ (বৈতরণী প্রাপ্তি, মৃত্যু)। সাপের গাড়ে হাত ঢুঁইক্যা (ইচ্ছা করিয়া বিপদ ডাকিয়া)।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার এই উপভাষাটির সম্বন্ধে বৃহত্তর আলোচনার অবকাশ আছে। এখানে কেবল সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে জনৈক স্থানীয় শিক্ষক এই উপভাষা অবলম্বন করিয়া দুই খণ্ড পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর আগে বই দুইখানি মেদিনীপুর হইতে সংগ্রহ করি। আলোচ্য ভাষার নিদর্শন স্বরূপ এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি এখানে পুনর্মুদ্রিত করিয়া দিলাম। আমার পুরাতন ছাত্র অধ্যাপক ডঃ সুধীর করণ একসময় মেদিনীপুরের ভাষা-চর্চায় উৎসাহী হইয়া আমার সাহায্য চাহিলে তাঁহাকে এই বইটি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম তাঁহার হাত দিয়াই ইহা প্রকাশিত হইবে, কিন্তু তিনি গবেষণার পথ পরিবর্তন করায় এ বিষয়ের আলোচনায় আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেই কারণে নিজেই বইখানি ছাপাইয়া দিলাম। ভাষা-তাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এই আশা করিতেছি। বইটির নাম 'সোণার পাথর-বাটী'। লেখক শ্রীগোলোকনাথ বসু।

আমরা বইটির বানান কিছুমাত্র বদলাই নাই। আঞ্চলিক উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য লেখক যে পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছেন তাহা নির্দোষ এবং ধ্বনিতত্ত্বসম্মত হইবে এমন আশা করা অন্যায়। তবে এই অঞ্চলের মুখের ভাষার সঙ্গে যাঁহার যৎসামান্য পরিচয় আছে তাঁহার পক্ষে লেখকের বানান-প্রণালী দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অনুধাবন করা কঠিন হইবে না। আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক লিপিমালায় রূপান্তরিত করিয়া ইহার একটি সটীক এবং সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। বইটির বানানে হস্তক্ষেপ না করিলেও এই প্রবন্ধে আঞ্চলিক ভাষার দৃষ্টান্তগুলিতে বাংলা হরফের সাহায্যে উচ্চারণ যতটা বোঝান যায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। 'ন'-এর মূর্ধন্য উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য কোথাও কোথাও 'ণ' বর্ণটি ব্যবহার করিয়াছি।

সোণার পাথর-বাটী

প্রথম খণ্ড

(গ্রাম্য উপন্যাস)

বঙ্গভাষা হইয়া কিম্ভূত কিমাকার,
ধরিয়াছে অপরূপ খিচুড়ি আকার।
ভোজন করিতে তাহা, পাত্র কিছু চাই,
সোণার পাথর বাটী স্থষ্টি হ'ল তাই।

সতীর হাট—বটবৃক্ষতল

হাব্সী—মেই কাপের ঝি! গড় করিব্ঠিমা পাধ্ধ্লা দ্যা।

হাপৎরঙ্গী।—কে উটীমা মালাঝি নাকি? আগো এঠি কিনিগো? হাট আস্ব্ নাকি? মর্‍্যা যাইমা, মোর আঁইখে পুড়ুমা, উঠ্মা উঠ্, ভাগ্যিমানী আয়োয়াণী হয়া পাক্কামুড়ে ঝুরাপর্. হাতের লুহাখাড়ু শীত্তল হৌ, মুদ্দের মুঞে তাটী দিয়া ছেনাপেনা বিন্দোল লিয়া সুখেসস্তে ঘদ্বর কর্। মালোমা! মোর আর ধূরতড়িক লজর কাটেনি, খালি ছ্যাব্ ছ্যাব্ করে। আলসাট্টে অট্‌কলে হাল্যা হাল্যা তেবে কোশেক বাট আইনি মা, ব্যাক্ ধূঁয়াজ্জানা। পো-পুদ্দর লাতি লাৎকুড় হৈল, লিজে অসাম্‌রৎ অথ্‌ব হৈনি, দাঁতগা বল্যা কিমাকার একটাউ নাই, দেখ্‌ব্ঠুতমা আর কি কৈ। মোর হাম্‌কালপের সাঁথিগা তমাম ছাড়্যা কার্‍্যা সেপুরী চল্যা গেছে। মালোমা! যৌ বারাসতি বচ্ছর স্বরগ্নু বুড়াবুড়ী ঝোট্ কাট্‌তে কাট্‌তে লাকের ব্যাসর হারা কর্‍্যা দিয়া মঞ্চভূমকে খুজ্‌তে আস্বলন্, সৌ বচ্ছর মুঞী মার পেটে থাইনি, তেবে আর ক যুগ বাঁচ্‌ব মা? ছুকুড়ি বচ্ছরের লোককে চাল্‌স্যা ধরে আইনক্ পরে, মুঞীত ছোটবড়র আশ্রীপাদে ছ্ দশন্ত এক ছগণ্ডা কাট্যা কার্‍্যা আরো দেড় বচ্ছরে পা-দিনি। অখন তোন্নেকার পাঁচটা এগুরি পেগুরির ছামু যাইতে পান্নে হয়। ভৌত খাইনি ভৌৎ পন্নি ভৌৎ দেখ্‌নি-শুন্নি, আর কিচ্ছো চাইনি খালি বান্নিপরাপৎ হয় কেন্নে এউটাউ হাব্‌ল্যাষ্। আ! লুরুদেব পার করহে! আ! আ! আজ বল্যা লিধ্মা টিট্ খরাটা হৈছে, গীড়ষমের কহতব্যি নাই, ঝাম্বোলে গাছ পালাগা খালি সিজ্যা মুসড়্যা ডাং হয়া গেছে, ব্যাংমা ব্যাংমীগা কোটর ঢুঁক্‌ছে, হাঙ্গল কুত্তাগা বুদা অছাড়ে কড়পাড়্যা হাঁকাড়্যা রৈছে, শুঁড়কাটা হাতীগা দঁকে পড়্যা চর্কট মদ্দন হৈছে, হাটুয়া বাটুয়া গা গিড়গিড় আসেঠে, ভিড়ভিড় ভাগেঠে, ভূঁ-টা পিপ্পিড় ফাটেঠে! মুঞীত মা, সাত সকালা ফক্ত টুক্‌চার কাঁজি দিয়া গরাসটাক পাক্ষাল খায়া আস্নি, সে গা অৎবা মুকে উঠ্যা তিষ্যায় খালি জুটা আইঢাই কর্‍্যা ঘনতাল্যা হাই উঠায়ঠে।

ওঠি ছাইতরায় লহমাটাক্ বুস্যা বুস, দক্তা কক্তা একটু খাবা যাউ। ভোৎ দিনহু তোম্বাঁথে ভেট্ হয়নি সুদা, দুটা গটাক্ বাৎ চিৎ হৈ আয়। আরোকি ঢেদ্দিন বাঁচব যেমা লৌট্যা কার‍্যা মুলাগাৎ হবে? মালাঝি! তুই কৎবা ঘরহু বারাইছিলু গো? (বৃক্ষতলে উপবেশন)

হাব্সী—আগোমা। যৎবা রাইৎটা সাঁ্যা সাঁ্যা কর‍্যা ঝঝ্র্ পুয়াপাট মার‍্যা আইল, মেঘে তারাগা জিজ্জিল করেঠে, পগারের বেবুর গাছটায় জুনিপোক গা, খালি জড়েঠে ছাড়েঠে উঠেঠে পড়েঠে, শুকটা ইমুড়াহু উমুড়াকে যায় যায় কচ্ছে তেম্নু ওক্তে উঠ্যা পড়্যা মা দৈরপ কন্নি—পেরায় রাইৎটা পৈল। তাবাদে ডিগ্রি-পদ্দীক্ জাল্যা দাঁত ঘস্নি, দক্তা খাইনি, লুটুর খুটুর কত্ত কি কন্নি তব্বো মা দিগ্গজ্যা রাইৎ পয়নি। ফেরমা গইল গঙ্গা কাড়্যা গরুবাছুরের মেঘামেনি কন্নি, সাজো গমাই গুল্যা ছঁচ্ ছড়া দিয়া বাসি আড়তি সারনি, তব্বো মা রাইৎটা লিশ্বুড় পৈবার ধ-প নাই, পাইক পাখালীগারত সাড়া শ্বদো মিলেনিক। তৎবা মনে কন্নি, ফের শুব না কি কর্ব্ব? না—অৎবা শুইনে হেলায় কায্য নাশায় হয়া পড়বে। ঐ ভাব্যা মনে মনে একটা মুসবিদা আঁট্যা ধ্যাচচ্চর জুড়্যা দিনি। চাইতে তন্নি একগার দেড় ঢপ্পা তুলার পাঁজ কাট্যা সান্নিমা তব্বো মড়ার জঙ্গম্যা রাইৎ ফাঁক্কা হয়নি, পা-কে পা দিশায়নি জন মান্বীর আউতাগম নাই ব্যাক্ লিচ্চুপ। ফেরমা আম ভোকটা উত্র্যা পিৎ পড়্যা যাবে বল্যা একটা বান্নিফল সেঁক্যা হাঁড়িহু এক দশটা পান্তো বাড়্যা মাপ্পাদ লাগ্যির মতু তুঁড়েদিনি, আঁচাইনি, তৎবা মা গাছে পালায় রাইৎটা আছে, চুলার কোলপেঁচাটা বুভায়ঠে। তাবাদে পেটটা কমন কত্তে গেড়াঘাটের বাটে বার‍্যা গেনি ঘুর‍্যা আইনি, হাট আস্বার কড়িপতর আখা উখি গচ্ কন্নি তেবে মা দুরন্ত্যা রাইৎ ফাচ্চা হইল, কাবা কুইলী গা রাক্কাড়ল, পূগ ভিত্তা ধূয়া মাল্ল, হেন সঞ্জোগে ফুজ্জি দেবতা লাল ম্যাকুল হয়া তাম্বা হাঁড়িজ্জানা উদৈ হৈলন, মুয়োভি ইবাটে আইনি।

হাপৎরঙ্গী—মালাঝি! তোর বৌর পড়েক ছড়েক কটী মা?

হাব্সী—কিনি কৈল মা সেকথা? সে আঁটকুড়ী গর্ব্বা খাউকী নিংস্থণী চাড্যাল খাউকীর ঝির কথা কিস্কে ক মা? সে কি মোর বৌড়ি গমা! উহুঁ, সে ভিটার ধমৎকান্নী মুই তার শাউড়ি লয় নেউড়ী। মালো মা! এন্ক্যা আকাট্ করম-কুড়ী কি আর তল্লাটে পাব? আড়তির কথা কৈনে কেউ যমন তাকে বলিপ্পড়দান কত্তে অড়গড়ির মুঁঞে লিয়া অসাল্ল। কুনোপদে ওৎরি কি তত্তরি পাবনি, হয়ত হৌ, নাইত নাই, মন্মন সদা। যেদি কভু কুনো খুঁটি খাব, সে হৈনে সৌ কথার তাক্কি ধর‍্যা অষ্টঘড়ি গজর ভটর হাপরহাটা তাকুস্পাড়া রঞ্জঘস্ কর‍্যা তুজ্যার কর্ব্বে। সোকৃড়ি আবড়ি মানেনি, আগাধূয়া আদাঁতঘসা গাড়ায় পশ্কায়, আড়বাড় উন্দি খুন্দি ব্যাক্ আউড়া অঞ্জড়া লাতা জব্ড়া কর‍্যা রাখে, খালি একানস্ব। মোর পো-টীতমা হাউড়া জাউড়া লেকা ভেকা লিক্ষিদ্রি লিজ্জীবা অকববা পড়েক। মাগো

মা! হুঁট কত্তে তাস্বাঁথে মুসগগস মার্গমা-গজড়ধমা। পড়েক ছড়েকের কথা যে কৈল মা সেকি বিক্কির মঞ্জি হৈছে যে মনে কন্নে পাড়্যা লেস্‌ব? সে যেদি লিজের মন্নিষের সাঁথে হাঁস্যা কথা কৈলনি, দুচোক পাড়্যা দেখলনি, ভেট্ হৈনে গরস্ গরস্ কর‍্যা গোর্গোর চল্যা গেল তেবে আর কেম্নে কি হবে মা? হাটবাটনু চচ্যা লাড়্যা কুনো দরিবজাৎ লেইস্যা দিনে মা—কাবা উড়ানী পোড়পুড়ী সে গাকে লতিবতিছতি কর্ব্বে! পুন্নাকাল্যা চেরাকনু তাকুড়ানু পনকিনু খিক্কাৎনু কোট্‌রানু কুর‍্যোটনু বাঘের দুচোক ছাড়া কত্তকি লাকুড় থাকুড় আল্‌মাল মেলমন্দার দরিব দানি সাউতা থাইল মা, ক্ষুয়ারী চুন্নী—পেড়ির কুঞ্জি কাঠি মুক্যা কার‍্যা তমাম গাকে বিচ্যা নানা থানা তফরখানা কর‍্যা বাপ ঘরকে বয়া দিছে। মাগোমা! অমন বেল গিলা ছাত্তি কারো নাই। সাপে খোপে আন্দারে বিন্দারে দাউ পাইছেত যায়া মার পিঁড়ায় হাজ্জীর। অঁটায় কর‍্যা কুনো খাজ্জিপতর ছেনাটার তরে নুক্যা রাখবত রাখর, নাইত দেখা'ব' গাড়ে সমাইবেনি। টিবি গেড়্যায় চ্যাং মাছ গা খালি গেঞ্জি রাখ্‌ছিলি মা, পাঁকতাড়ী সে গাকে ছাইজাল দিয়া ছ্যাকা ছ্যাক পড়া কর‍্যা মষ্টে মষ্টে ফয়ার কচ্ছে। আঁইস্যা পেতী যুগ্নী কারো পাতে এক তুন্‌কাও ছুঁয়ায়নিক। আন্দার কর্ণে বুস্যা হাঁড়ির মুয়ে হুৎহুত্যাগা সুঞ্চু হাম্‌চা হাম্‌চা কর‍্যা টাউস্যা দেই। টঁকার চাউল গাকে চিব্যা পার করে। সঁটাক্কেনে গুড় ফুড় রাখনে তাকে খাম্‌চা খাম্‌চা কর‍্যা কাব্‌র‍্যা সারে। টক্‌রানি টাকে পপ্পড় পিঞা মারে। আমান্নে দিনেদ্দিন চ্যাচড়া উপাস দিয়া মরি আর কি? ছোটে পুর‍্যা কপূরকাঁতি ধান কত্তগি রাখ্‌ছিলি মা তাকে ত ফুক্কে উড়্যা দিছে। টঙ্গের ঠ্যালা প্যালাগাকেত হুড় হুড় টাণ্যা দুদ্দুড়্যা চুলীর মুঞে মেট্যা দেই। কুনী বুড়ীকে যত্ত ক, যত্ত গাজ, যত্ত হেল্লিক কর তার একরঞ্চও হেলকম্প নাই। লিহাৎ বদ্দাস্ না হৈনে যেদি বা কালে কস্মপে সে কথার উঙ্গুস তুল্যা একটু পরিকর্ম্মা দেখাব সে হৈনে খালিটা আঙ্কাট্টা এড়িতেড়ি বাত্যা নাপাকটা স্যাঁকর স্যাঁকর রস কাঁদনা কান্দ্যা চক্ষের লোহে হোড় ভাসাবে। ভেংচ্যা ভিরকিট্টি কর‍্যা আপ্টালেই লাগাবে। হাক্কঁড়ে সাইপড়শী উজাগর হয়া কাত্তার বান্দ্যা দাঁড়াবে। গাড়পশা মন্নিষত্ত কোল্যাহুড়ী পালাহোড়কীর গুণাগুণ্ বুঝ্‌বেনি, খমস্‌থাটা মোর বৌথেঁটকী চিড় তুল্যা হরিধ্ব্‌নি দিয়া উচ্ছান লাগাবে, থাই হৈতে দিবেনিক। খালি তিতিক্ষা বিস্পিত্তা বাজবান্দা বিথাবাই লাজেহাল কর‍্যা ছাড়বে। মেইকাপের ঝিগো! দুক্কুর কথা কি কৈব মা, ভাব্যা ভাব্যা গার চোল চোল লোহু শুক্যা গেল, চক্ষে মুড়ে আড়ে বাড়ে লাগল, কাগ্‌সেন মাপ্তর কাঁথডা পুরকে ধব্‌লাট কর‍্যা ছাড়ল। আর লিস্তার নাই, কুনোপদে বর্কৎ নাই, সুঞ্চু ঐরাণে তস্রুপাতে গেল, কৈতে কি এক্কালে ভুট্ ভুট্ ভুট্ হয়া গেনি।

হাপৎরঙ্গী—বাপ্পালো মা! ইকি উগ্‌গুরচাঁড়া জগজ্জিতা আজাইবাজাই মায়া গো! পর্ব্বাবতীর খুরে খুরে কোট্ কোট্ তস্যায় নমঃ। এন্‌ক্যা কহবাজ দাঁড়ী

মগ্‌রা মায়াকে খুম তুষ্ট দানিষ্টি—বির্কাট মৃত্যু—অগড়ধত্যা আখাম্বা—কিম্বত্যা—জবড়জং মরদ হৈত কি? তেবে সান্ত? হেলেকে পচ্ছিমাকুটা কুটত বারেক্কে টিপ্পান চণ্ডীদিয়া চাঁদি গরম কত্ত, উঠ্‌তে বুস্‌তে বেঘাত্যা গোবাঢ্যান চড়াইত তেবে রোঘা হিঙুলি হয়া বোলহিজড়া খুরসুঙ্গা পর্কিৎ ছাড়ত, লতিলঙ্গনা হৈত, ধুমুস্যা লাদ্‌নাচ্চোটে ভূতপেৎ ভাগ্‌ত, চোর চণ্ডাল কাঁদত। হঁগ, মালাঝি! বলি—তোরকি আঁইখ থাইলনিমা? এন্‌ক্যা হিল্লি কাব্যড়ীর ঝিকেও আন্তে আছে গ! মোরত আপ্পা এক্কা ভাগ্যা কথা—দাড়ায় মাড়ায় খড়াস্‌, মন পটেত কৰ্ব্ব কাজ নাইত পিছুর বাটে হড়াস্‌ হড়াস্‌ হড়াস্‌।

হাব্‌সী।—আগোমা! তারু বাপজড়্যাত যত্তলাটের গুরু। সৌ মড়ার কথায় ভর্কসি কর‍্যাত ঔদশায় পড়ছি। পৰ্কিথিনা গিদ্ধড়্যা ডক্‌রা, হপর্‌ হপর্‌ আইস্যা যায়া কত্ত অভয়লটা খায়া, গুস্ক্যা, চাঁদা মামুকে হাতে পশ্‌ক্যা, লিক্কর দুবাইশ টাকা পণাঁপ্পণ গেঞ্জায় টুঁক্যা—চ্যাংমুড়া ধীপড় মন্ত্রী কাইনু একটা উঁচকপালী চিরন্দাতী চির্কুণী পাত্যাস্থুণী বাঁশলটার গুয়াপেতীকে গলায় বান্দ্যা দিল মা, খালি চক্ষের বাটে জু লিক্‌ল্যা ছাড়েঠে। কেউলীর বন্নটীত লয়? যমন ধানসিজা ব্যাসায়ির তলী, পিঠটী পুইমাচ্চা, ওদরটী আটকুড়্যা ধামা, বত্তিশাগি গোহাড়া-জ্ঞানা। সারস ঠ্যাঙ্গীর স্বগ্‌গে এক ঠ্যাং আর মঞ্চে এক ঠ্যাং। আন্দারে বুদ্দা অছাড়ে ভেট্‌ হৈনে তমার পাট্টি পড়্যা যাবে। মাগোমা। মোন্নেকে চোদ্দভুবন দেখ্যা ছাড়ায়ঠে। এন্‌ক্যা গত্তিয়ে পুড়ু পুড়ু পুড়ু। তার বাপ ওচ্ছিতা অদচ্ছিনা খাউমুস্কা ঘুটুরঘুমা বিশোল ঘাৎক্যার সাঁথে একটাবার ভেট্‌ হৈনে হয় সে হৈনে হাদেখ মেই কাপের ঝি! (প্রদর্শন) এউরকম দাঁড়া লাথে তাকে গাড়ব গাড়ব গাড়ব। এন্‌ক্যা লিচ্চণ্ডাল ধড়ী ধাপ্পাবাজ বেমান বৈরঙ্গের মুখালগন কত্তে নাই।

হাপৎরঙ্গী।—আগো সেকি তোর পিঁড়াকে আহু আইসেনি? চিজপাতি দিয়া তালাসেওনি?

হাব্‌সী—দূরহা! ছ্যা করমা! ফুস্‌ফুস্‌! খালি ঢিঢি, কঁক্ক। মুরাদে নাই সীমা, পচ্চা মাছে গিমা। দাতাবড় ভগবান, ঘোল খাবিত চালুন আন। বাপের গায় নাইক মল্যা চাম, বাজনার কিতিকিতি। মাগোমা! দিবাথুবাত ভোৎধুর দাউ পায়ত সরগ লাশটী কর‍্যা ছাড়ে। সেচড়াচিপ্টা লিকুটকুটা লিপৌরা কুরকুঁট্যা কাঁক্কোড়ের দরিবে ঝাট্টামারি। হিয়াকঙ্কলী হাদদ্দরী হাক্কাল্‌সী লিল্‌খুণী লাফরা-খাউকী ব্যাণেঁর মুঞ্চে জুম্‌ড়া জাঁকি। গুস্বাঁই জাণ্‌ন্‌ মা তমার পা পরশ কর‍্যা কৈঠি কভ্‌ভু একটা ঘাসের চিজ্‌বল্যা জাণিঁনিক। মাগোমা! যদ্দিন এউ মালাঝির গতর আছে তদ্দিন আস্তা যান্তা, আড়তি পাইট, গা-গাতাস, আপোষপর, লোক লোগিতা, উপরি অপথানি লিয়া ঘরকন্না। নাইত এক লহমা আঁইখ মুদনে ব্যাক্‌ কাণেফাণ। ধা-রে বাবাই ধা, ইপাড়ানু উপাড়াকে যা যা যা।

হাপৎরঙ্গী—সে বঠে মা, একা কি ভেকা। একলা কুন্‌বাটে কি কৰ্ব্বি, জাউ

খাবি না মা ছি তাড়াবি ? ওকু বলে থিতিধনে বিনশ্যতি। মোর ত মা তিন তিনটী বৌ, তব্বো রাইৎদিন খিলিবিলি ঝল্‌খলি সৈতে খালি দমে জাহানে লাগ্যা যায়। একবারো বল্যা ঠকায় কিষ্ট ঠকায় রাম কর্ব্বার অপ্সর পাইনিক। সে কথা বা যে হো মা, মোর বৌমেন্‌কার কারো মুঞে উটক্ষোর, ফাক্‌চা পাড়া, টপ্‌কাহাণঁা, থ্যার্সাণঁা বাক্যি নাই। কোলকাজ্যা-কুচ্ছন-কূলকুলহাটা-কাড়াহিঁচ্‌ড়া কাটন-ছিড়ন কুত্তাকুন্দালী বাদ-খুলাখুলি তানাজা তড়িথড়ি ঢামাঢালি ঢিকামিকি করেনিক। বড়পো লিতাইর কোপ্‌ল্যাটী সাইখাৎ সণার পিড়তিমা অপক্ষরী। বন্নটী পাক্কাতমের পারা, চহটে চাবা যায়নিক। হাম্‌স্যা গেন্সা ইল্লত্যা হয়া থায়নি, খুম পট্‌পটি রংচঙ্গ্যা হামসী। মালোমা! সে যৎবা লাড়্যা চিকণঁ মাথ্যা, মুড়র্থাক্যা, ফুলসোদে পাটী পাড়্যা, রাংতা পর্‌্যা, গেঁড়া ফুলটুল জুড়ায় গুঞ্জ্যা, মিসি ঘস্যা, পান্দক্তা খায়া, সাড়ী পর্‌্যা, পো কোড়ে কর্‌্যা, চাকামাড়ি খায়া, গজগিরি হয়া বুস্‌বে, তৎবা মোর ছাতিটা অঠ হাত! ঘরটা যমন ইন্দ্রালৈ! মালোমা, তার কি ছেনা বল্যা ছেনা গ! আবুক কড়তাটিরু আটিকুটি। হেই পা হাত গি মেস্‌মেস্যা, হেই পেটটি গুড়নান্দা, হেই গালপাট্টাগি লুড়পিঠ্‌ঠা, যমন ভক্কাভুঙ্কুণ্ডা ভঁচ্চাকুমীর বজ্জর কপাট! তার নাম দিছিমা 'ভত্তা'। যে হোমা, পাঁচ পৈতি-সত্তিপীরের ষষ্ঠীবুড়ীর চক্রাউড়ে নেড়ামুড়া বেলকুম্‌ড়া কালকুট্রা কালুষ্ট্যা হয়া বাঁচ্যা রৈনেউ বঙ্গশের নাম। এউ আগুর লদরমাসকে তার পূরা ছবচ্ছর লমাস উম্বোর হবে, এরুমৈধে চাটশালীর ফলাছিঁড়্যা খড়িঘসা পাঠ হয় হয় কচ্ছে। এঠি গরুদথ্‌ন্যা শিশুবধ গাবা সায় হৈনে ফের কুম্পানীর ঘরে টুং টাং ইস্থালে প্যাংমংশীর পাঠ গাইতে যাবে। সেঠিকে গেনে নাকি মা মেলেচ্চি আইস্যা কার্‌্যা অঁটাদড়ি কণ্ঠি আর চৈতনচুটকী ছিঁড়্যা লিয়া তুঁড়ে থুৎকুড়ি দিয়া জাইৎ মার্‌্যা কিরিস্তান কর্‌্যা দেই। সৌদায় মুঞী আণ্ডো পুণ্যা গড়বিড় কচ্ছিলি, ফের মোর জামাইর ভাই আইস্যা কিরাকঠুর কর্‌্যা কৈলন যে সেগা লিচ্ছুক ঢুয়া বাদ্দিকথা—পাণীঁর পুড়া। তিন্ সৌখালে পড়্‌ঠন। সেঠি পড়্যা পর্ক্যা দিয়া পাঁউশ কন্নে নাকি লিজে মেষ্টুরী পড়ধানী কর্‌্যা গগ্‌গল্যা টঁাকা অজ্জাইতে পার্ব্বে, গিরগুষ্টীকে পত্তাপোষ কর্ব্বে। মোর আর কিচ্ছো হাবল্যাষ নাই মা, ফক্ত সড়গড়্যা কর্‌্যা কিত্তিবাসকে হাঁক্তো আর টিকৎরক্ষাগা পড়তে পান্নে মার্‌্যা দি।

হাব্‌সী—ইস্থালের কথা সৎ মা সৎ। একটা দিষ্টাং শুন—মোর গাঁর গব্‌রা ধবার পো পোদ্দা মেহুনফুরের পাদরা সাইবের ইস্থালে পড়্যা জলপান পায়া নামাল তরপের লাউসেণী টেঁকসের দোপট্টি হাকিম হৈছে গো! আগো ঝড়াকে ঝড়া টঁাকা অজ্জায়ঠে। অষ্ট ঘড়ি আংরাখা ঘুড়্যা সিল্‌পটের জুত্তা মাড়্যা, মুড়ে কম্ফাট্‌ জড়্যা, ফড়ায় চড়্যা, গাঁয় গাঁয় ঘুরেব্‌ঠে। তার নাম পর্চাটুহৈছে—পত্থলচন চটংপাত্থাবাবু। কের্মাগতে তার নাকি আরো উচ্চা পায়া হবে।

হাপৎরঙ্গী—কি আচ্যাজ্‌ কথা! আগো সে অছ্যরের পোর অত্ত জরাট কপ্পাল?

তারিপ তারিপ! তার মা বাপের ধন্যি তপিস্যা! তেবে মা লিচ্চয় ভত্তাকে সৌখালে পাঠ্যা দিব। মাগো মা! মোর গাঁর সরকার‍্যাটা কিচ্ছো জাণেঁনিক, লিহাৎ গরু। খালি ছেনাগাকে একঠেঙ্গ্যা চোত্তপায়া কর‍্যা, বিছাতি দিয়া, ধন্নায় টাঙ্গ্যা মস্ত তাড়মুড় করে। সৌদায় ভত্তাটাও খালি মু মুড়ে আস্‌লু যাইতে মাঙ্গেনিক। মাড়েচ্চোটে এখো এখো দিনা কঁছায় অসম্বাল কর‍্যা পেলায়।

হাব্‌সী—দূর করমা, সে উসব ভবিস্তার শিক্যা কাইনু জাণঁবে? বাপকাল্যা পুঁজি সৌ—"কিরি খিরি গিরি ঘিরি ঙয়ারি, চিরি ছিরি জিরি ঝিরি নিঞারি" বিত্রং আর কিচ্ছো নাই। মোর পোকে মা দিনা গাতেক একটার ছামুকে পাঠ্যা দিছনি, ললভাঙ্গাটা স্থদা গাবাইতে পাল্লনি, ভেদা পেঁচায় ভিক্ মাগায় ধূম তুল্ল, তাত্তরে মা গ্রিন্থে ডোর দিছি।

হাপৎরঙ্গী—ইঁয়াইঁ, সে কথা মিচ্ছা লয়। কথায় বলে—তোর ধাঞা ধাপ্যা বার, মোর বুস্যা খায়া তের। তোর ক্ষেতে পড়ু বাজ, মোর ধাণমাণঁকে কাজ।

হাব্‌সী—যাউ মা সে কথা। তমার আর দুটী বৌ কেন্‌ক্যা মগ্নিষ বল।

হাপৎরঙ্গী—কৈশুণঁ মা কৈশুণঁ। মোর মাঝ্যাপো জগাইর ইস্ত্রীটির একুল-সিঙ্গা হিঙ্গুসকুড়্যা পর্কিৎনাই, তেঠা আরিমান গৈরব ঘসা জাণেঁনি, অলাইনানির মতু লবাত্তি লয়, খুম লাজকুড়ী থাণ্ডা সমশীত্তল লোক। তার আইলাপেলা একটা গা নাম্যা যাবায় ফের ই লমাস গরব্বাস গব্বসংখা। আর মোর কুথ্‌লি ঝাড়া কোড়পুচ্ছা কচ্যাপো মাধাইর ভায্যাটি দুসাত বচ্ছরের হৈতে অন্‌কুল মাসটাক ধিরালগনে ঘর আস্বন। এক্কা ঘরের আল্লাষ্যা খুকী বল্যা মাধনি টুক্‌চার টিচ্চা উড়বং ঠিক্রা ট্যাক্কোর মৃ-পাবা রকম। স্থাঁজের মুঞে বাতি নাই পড়তে তান্ আঁইখে যে অনামার ঢাকুল লাগল, পদ্ম লাভ কল্লন, হর্গিজ আর সঁতর হবন্নি। এন্‌ক্যা পাহাড়্যা নিদ কুনোঠি কারো দেখিনিক। ডাকতে গেনে ঝাঁক্র্যা উঠবে, নাইত কচ্যা খুকীজ্জানা ওজোঝোর কাঁদবে—তিরোধারা বৈবে। খালি হেংলী কদ্‌লিটা। কবিকে যে বুদ্ধু হবে, ধাক ভেক শিখ্‌বে কে জাণে মা?

হাব্‌সী—বেস্ত করিমা! বাজে আইসি মা! তমার যে লিহাৎ দুষ্যা ছাড়া কথা! তার কুন্‌বা বইস্ হৈছে, গাল টিপনে দুধ বারায়, গেন্যা গোডিমাটা বৈ পুঁজি লয় তেবে তার কিগো? অল্‌বত্তা ছেনা-পেনার মা হৈনে ই থস্‌লৎ থাবেনিক। মোন্নেকার সাঁথে দু দশদিন হাটবাট গেনে আইনে ব্যাক্ ভবিস্তা শিক্যা তালিম হয়া যাবে। আগো মা। মোন্নে কি পথুম পথম খাটো ঢামালি কিড়তি কচ্ছি? এখোদিনকার রংঢঙ্গের কথা ক্ষম হৈনে মনে মনে কত্ত হাঁসি। সে কথাবা যে হৌ মা তমার লাতির কথা শুণ্যাঁ কার‍্যা চিৎটায় বড্‌ডো স্থখাদৈ হৈল। আশীঙ্গস করি—লদীর বালি যত, তার পরমাই হৌ তত্ত। ফুপার দয়েত অস্রুপীর লেখন হৌ, মুড়ে আখ্যৎ পড়ু, সণার মোড়ে ব্যা যাউ। হঁ ভালা ক্ষম হৈল, এউ লজিকের মৈধে কি তার ব্যা দিব?

হাপৎরঙ্গী—হঁমাহঁ কুন্‌কালে কুন্ ভবিষ্যতি, অক্ষু আছি অক্ষু নাই, পদ্মপতরের জল করে টলমল, ভবাদৈবা কার লিবন্ধে কি আছে কে কৈতে পারে মা, কত্ত দে-দেব্ তার পাদস্তনা কর‍্যা যেদিবা খুদের কর্ণ তুল্‌বা শিকড় একরঞ্চ পাইছি, কুনো পর্কারে তার একহাত্‌কে দুহাত কর‍্যা দিনে ভগার খালে ডুবদি। মনে মনে ঔ কথার ভাং কোড় তক্কতাগাদা কর‍্যা পচ্ছি লিদাঁতা গাঁয় দুজ্জে খাঁড়ার ঝির সাঁথে সমঁধ কচ্ছি, অপশ্বু দিনা লিজ্যাস ব্যাহবে। লুদবার দিনা দেশ মারাজা পাঁচ পঞ্চত্ত আরা স্বঞ্চু লোক একাঠি জোমো হয়া বিকুর্ল লিমাংসা লিম্পিৎ কারেন্দা কেরেকট্ গির্মিট কর‍্যা গেছন।

হাবসী—তেবেত কামধর ভারি লিক্টলিক্টি! মুব্বা কথার কিরকম হবে নাকি? খুম আটম্বরি সিল্‌সিলা জাঁক্‌ড়ো ঘট্টা-ঘোর হবে না পয্যাপালা রকম?

হাপৎরঙ্গী—কিনিগো পয্যাপালা কিনি? আগো পূগালী ঢল কঁদের উখড়াভুজ্জা, চাউল লাড়ু, খিরি পিঠ্‌ঠা হবে, বৌ মেনকে খৈচড়া আর কোদোকুটবার বরাৎ কচ্ছি, খঁদ কুটা ঘব্বর উল আশ্রা হয়ঠে, আকুত্তা দরিবে ঢিল্লি মার‍্যা গেছে। ফাতীল্লাদন ফোলোত্তেলে লদীলালা বয়া দলমাদ্দল উড়্যা যাবে, পয্যাপালা কিনিগো? আগো সে কিনি? রাজার পিঁড়ান্থ ফাতী ফড়া ফুঁট ফগ্‌দী আন্তে চিকুর্ট বাত্তা ছাড়া হৈছে, খড়খড়ি আস্‌বে, আর দাঁতড়দার দনি দঁড়পাট, লারাণঁগড়ের লল্লারাণঁ লাইক, পলাস্তার পুরস্তম পড়ধান, লিজগাঁর লিদ্দাস, ভোক্ষাম্‌রী, গিদ্ধর খুঁট্যা, চকদ্ধর পড়্যা আরা দশগাঁর পাঁচজর্ণ মুকাদিম জেন্টমান ভদরস্ লোক ব্যা দিতে যাবিন। তাবাদে কড়তাটীর স্যাঙ্গাতের মালাগুরের-পোর-লাৎজামাই মোর লিজের-সানো-আজার পেস্তাগুরের শোড়ু কিনা তাউ তানোভি স্বদা যাবার কথা আছে। ইছাড়া এনঘরে ইন্ তান্‌ঘরে তিন্ এনাপেনা কত্ত গঁড়াউত ফুলছড়ি-মশ্বাল ধর‍্যা যাবাত্তরে খালি ঠ্যাং তুল্যা আছন। তেবেমো তুই যে পয্যাপালার কথা কৈলু? আগো সেকিনি? ঝাঁকিড় কিড় কিড় কাড়া লাগরার জগঝম্পী বাদ্দি বুসবে, বরের খড়খড়ির আগাড়ি পিছাড়ি ফর্ক্যাল খাত্তা যৎবা কুদ্দা মার‍্যা শূন্যে উড়াপাক খাবে ওঃ তৎবা খালি সাসার্টে থর্রি কম্পবান! আগো সে কিনি? ভূঁচাক্কা হাবাইছচ্ছরি ফঙ্কাগড় সহর গোলের ঢাঢ়্বুই ধড়াকৃধুম আবাজে গির্গিন্দা কাট্যা যাবে, ফাণে তালা লাগ্যা যাবে, মেঘ ওদ্র্যা পড়বে, ধুমধড়থায় দিগ্‌দিশা থাবেনি, পয্যাপালা কিনিগো? আগো সে কিনি। গাঁ দেবতী লেকুড় স্বুণীঁর থানে সাজো বইৎ তুল্যা মিদং কংসাল বাজ্যা পূজতে হবে, আরো কত কি হবে, ইকি ফাল্‌তু ঘরের ইল্‌চি কথা হৈছে মা? ইকামটী লিভ্‌ভা কত্তে গৈণা গাঁঠিন্থ কাহার বাজাদারন্থ, চিজ পাতিন্থ ধান চাউল বাদে মূড়াতাবা মাত্তে—অতিলিকিষ্টে লিত্যান পৈথে না পাম্যিমানে লগ্দা লিক্কর মাপ্পা কাঠাক্কেনে ঠঠ্যা রূপচাঙ্গের খচ্চা। কৈতে কিমা লিগুর্ণে আজ কদিন একামুছু খাট্যা খাট্যা ঘুরা চক্করে কমরে পাক পড়্যা গেল। দিনাপন্ত্র আগু

খণ্ডিজলদোষী হয়া কুড়ুরকফ্‌টা চুড়চ্ছিঞা দিয়া লাট্‌ক্যাটা টিপটিপ্পান খায়া গা-দেড়ি কচ্ছিল ফের ঐউদানী উবাতে একটা বিপজ্জে বির্কোদর‍্যা বাল্যাদাড়া হয়া বাতপিয়া দিয়া কের্মে অভার হয়া আসেঠে এরু উপ্রে কদস্তন সয়া হাট আস্বিমা।

হাবসী—আগো তেবে অৎক্ষণঁ মোকে কনি কিনি? ইটাত চুচ্চিকথা। ইথের মূলে ইৎকর‍্যা দিনে ই হয়, সে নাই হয়া ই কর‍্যা ই পাব্‌ঠ। তমাকে লিরোলে লিরাবিল্লে কৈশুণঁ ফাকটি কর্বনিক। জনপোকের তমাবস্থায় যৎবা গন্নালাগবে, তেম্ন্‌ ওক্তে বেলা পট্টাক থাইতে জনটা ভূঁভাঙ্গা দিনে পরে তিরদশীর বার বেলা কাট্যা বিষ্কুম্‌ যোগে আগম্‌ গেড়্যার নিগম ঘাটে ডুব্যা অঘাটে উঠ্যা তেমাথাণিঁর উপ্রে শূন্যে দাঁড়্যা উত্রা মুয়া এক নিশ্বাসে এক্কাঘোটে কাঁচা পড়া কচ্ছিম খলা টুকু ঘট কর‍্যা খায়া মট্‌ কর‍্যা চায়া পেল্‌ব। মুই ছাতি ঠুঁক্যা কৈঠি সেহৈনে জনম ভোর ভারসা-মগ্‌জী-বাইশিলা-বিচ্চানামা-কাক্‌-বিরালী-উপরবা-লজর দোষ কি কুনো ব্যাম্ম হবেনি, অস্তাতের লেক্‌ড়ির গুবাণে রোম্‌তে রোম্‌তে লিস্‌থাজ্জি হয়া যাবে। আচ্ছা অৎবাকার মতু একটা ফুঁক মার‍্যাদি ঘুর‍্যা বুস।

(মন্ত্র)

কাই যাউরে গঁমা পেঁচা রুগীর কন্দ ছাড়্যা—
কয়লাস বাসণী মাগো তমায় জাণিঁ আমি—
যাই যাই শ্ববদে খঁাদা করিল পয়ান
লোরসীং আইগাঁয় দূত্তু ছাড়িয়া পালায়
বাধ্বি ছাড়িয়া পালায়—কার আইগাঁয়?
বাবাহনুমন্তের আইগাঁয় ফুক্কে ছাড় ফুক্কে ছাড়।

মাগো! ইবার আর কৈতে হবেনি, দণ্টাক বাদে ব্যাক্‌ কসট্‌ নিয়াংশা হয়া যাবে। ইটা তমার দাপ্ট্যা চলায় কাপ্যা উঠ্যা কোপ্‌টিটা টাস্তা ধচ্ছে। হাট না আসাউ কত্তুব্যি ছিল।

হাপৎরঙ্গী—নাই আইনে অত্তগি অন্‌কুড় বিশাশয় দরিব কে কিন্‌বে মা? সুঞ্চু যে অন্থল্যা হবে। কার উপ্রে মদার দিয়া থাবমা? মোরুত গরজগাঁই। বলে—হান্‌তহান্‌ তাঁত কামাই। উন্‌ত উন, তিন ত তিন, সে ত সে, সর‍্যা গেল আর কার ভস্বা?

হাব্‌সী—আগো-কিনি? তমার গাঁর হারি পারি, কুটরি মুটরি, বেচি পচি, সাদি রাধি, আলি পেলি, কুচ্‌লি, হুলালি, কুড়ানি কাঞ্চনি, দর্ক্যারমা, দপিঝি হুর্পতীদিদি, কন্নিমাউসী আরা সাইপড়শী থাইতে থাইতে কেউকি তমার ঘরে কাজে সাপক্ষী হয়নিক? তেবে আর অরস্‌পশ্বী কিসের গো?

হাপৎরঙ্গী—হায় হায়! কিস্কে কৌমা সে কথা? কথায় বলে,

আপকায্যং তাৎপয্যং পরকায্যং যবস্থবস্,
পর্ভাতে দশদিগে যান্তি কাকস্য পেটবেদনা।

জানলু মালাঝি! মুঞী কুনো মড়ামড়ীর আশৈ করিনিক লিজের গতরটা সুখে খাউ কমন? যে হোঁ মা তোর ইমন্তরটা ভারি কাফিজালিম রকম এরুমৈধে মোকে উশ্বাস মাড়েঠে। ইবিদ্দুয়া কাইনু শিখ ছুগো?

হাব্সী—মোর বাফুর ছামু। আগো তিন্কি কম কেরামতি কফিরাজ থাইলন! রাইৎ পৈনে মুঠাকে মুঠা টাঁকা অজ্জাইতন্। তান্ ডাক্রাটা এম্নু থাইল যে তিন্ যাকু হাত দিতন্ তাকু আর ঘুর্যা দেখ্তে হৈতনি। ছেনার তিকিচ্ছায়ত যমন যম ছিলন্ বুড়া থাড়ারত কথাউ নাই। ঝালঝাড়ার একটা বট্ক্যা পাঞ্চন দিলে ঝাল ঝাপট খেল্যা এক্কাদমে ঝাল গুড়ান-গ্রিন্থে ডোর-রাসকাবার হাত হাতে বিদাই। বৈদ্যকী শাস্তরটাত তান্ জুভ্ভার আগায় হল্হল কত্ত। মুক্ড়োধ্বজ-মুদ্দোক-চক্রমুক-গুঁড়ুরছা তেলটেল কত্তকি ধন্তরী ইলাজে গট্টা ঘরটা পত্তা থাইত।

হাপৎরঙ্গী—আজ কাল মা আঁইসপাত্তালী ইলাজ হয়া উ সবকে আর কেউ ধুয়ায়নি।

হাব্সী—ডাকাতী ইলাজের মুঞে ধাড়ু, তাকে ঝাট্টা মারি। মাগোমা! ডাকাৎ ঢ্যাম্না আরাকার ঐষধ গা লিচ্ছুক বারাণ্ডী, গো-রকৎ আর ঘুসুরচের্পি, ইবিড়া কথা। শুনব?—মাইলোরী বচ্ছর থকার খ্যোণপাৎ হবায় যাদ্দলাইর পরামিশে ধন্সর ফুরের ডিপ্ডোলসানীকে গেছনি। ওমা! সেঠি পৌচ্যা দেখি—একটা লিখুয়া-কঁথ্লা-দেহেল-অদলভারী-গেঁড়মেঠা লোক চাঠেঙ্গ্যায় বুস্যা হুঁকা খায়ঠে। সৌ নাকি পড়ধান ডাকাৎ। সে মোর ছামু আইমূল অড়ান্ত বাত্তা শুণ্যাকার্যা তার কুরুপাণ্ডবকে সড়ামড়া-কল্যাণ টল্যাণ কি কি ইলাজগা মোর বৈতলে দিতে কৈল। মাগোমা! তার ঘরটায় এম্নু একটা 'বো' উঠ্ছে যে সেঠি দাঁড়ায় কার বাপ্পে! ভূতপেত-ভাগ্যা খাড়া হয়। মোরত খালি গা ইচ্পিচ্ কর্যা হেই উচ্ছাল হেই বাঁন্তি হবার হুমুদ হৈল। ফের সেঠিনু দৌঢ়্যা আইস্যা মড়ার ইলাজ-গাকে খৎকুড়ে ঢাল্যা দিয়া গমাই মাখ্যা গাধ্যা আস্তে তেবে মা লিস্তার পাই। তাবাদে মা খকার মুড়ে হাত বুল্যা বুকুটা কিল্যা দিতে ছেনাটা সেক্ষেপাণ আগি পায়। নাইত মা, সে ডাকাতী ঐষধ খাবাইনেকি আর বাপধনকে পাইতিন?

হাপৎরঙ্গী—সেকথা যথাৎ। মা নাই হৈনে ছেনার কদর কে বুঝ্বে মা?

পরের বেদন পর কি জাণে, জাহান থাক্তে হাঙ্গলে টাণে।
অভাগার মড়া-গলায় আঁকুড়া দড়া অর্থিতের বাছা পড়্যা গগাচিৎ।

হাব্সী—ও মেই কাপের ঝি! মোন্নেকার গপ্ ছাঁটতে উদ্গে চক্চক্যা টুকু যে ডাং হয়া আইল গো! উঠ মা উঠ, হাটটা খুম ভর্থর লাগাছ খালি গহ গহ কচ্ছে।

হাপৎরঙ্গী—হঁমাহঁ যাইমা চ, চমা যাই, আলো মালো! বাপ্পালোমা। মোন্নেকার আঠান কত্তে বেলাটা লিপ্পটে ঢিক ঢিক্যা গেছেগো? জলদ্ ঘেঙ্গা দাব্র্যা লৌট্তে পান্নে হয়, নাইত ফের বিলক্ষে বিক্ষোড়ে পড়্যা হাপ্ট্যা মত্তে হবে। মালোমা! হা সেউ মাস্না গেড়্যা ধারে ভুকুঁ'ড় গাছের ঢগ্র্যা হাঁড়োলে একটা ঝাঁকড়া থাঁড়া পুর্ষা-তর্সলা-অক্ষড়্যা-বুড্ঢা জম্বুরা গোমুয়া আছে গো! সেটা একলা আধলা পাইনে, পাঁজ্যা পাঁজ্যা পিছু পিছু গড্ঢায়, বৌরপার মতু লিমিয়্যে লক্ষি অব্তার হয়, একটাবার দিশাভুল্যা ঠান্পাছণ্ঁ্যা আক্রষণ কত্তে পান্নে, খালি হেঁক্টী পাড়্যা মূঞ্রের বাটে গাজ্জুয়া বার্ক্যা ছাড়ে। আর মা সেঠি কভু কভু ভূতের রাজা সুদাও মশাল জ্বাল্যা পজ্জা পাটক সাঁথে লিয়া কাফ্লা কর্‌্যা বুসে। ওঃ সে কথা সঁউন্নে সব্বাং শরীটা খালি সিংর্‌্যা টাঙ্গুর্‌্যা উঠে।

হাব্সী—হঁমাহঁ মোকেও সুদা একদিন একটা বাউটী ঘুর্‌্যা ঘুর্‌্যা বাঘুয়ামাড়ির ছামু ঠেক্যা দিছ্ল। সেকি ছামু বল্যা ছামু মা! হেই সেউটা হেই মুই! লেই আর কি! যাই আরকি! হায় হায় সে বিৎপাতের কহতব্যি নাই। ফেরমা কাপড় ঝাড়্যা পর্‌্যা অঁটাদড়ি ছিঁড়্যা ভূঞ্রে তিনটা লাৎকুড়া মাত্তে মড়াট্টা মস্ত একটা ধুপ্পালী উড়্যা ঠায় সৌঠি পাণীঁ হয়া গেল—মূয়োভিকাণ্ডাতোবাচঃ। মাগো মা! তার মুড় বল্যা আদু নাই খালি লাক্কে থন্থন্যা কথাগা কয়। মেই কাপের ঝি! তুমি মনে কথাব ইগা লাগ্না কথা। তমার কিরা মা—দম্ম মা বড়াম! ইতলে বসমন্তা, উপ্রে দে-দেবতা, তিনকাল একের বেলা কৈঠি বিকু'ল সৎ—সৎ।

হাপৎরঙ্গী—আলো মা! তেবে আর কৈছে কিনি—যা নাই দেখ্বে দুলয়ানে, পিত্তৈ না যাবে লুরুর বচনে। মোর পর্তক্ষি কথা নাই হৈনে অন্‌বিশ্বাস কত্তিন। ইসব কথা ফাক্চা খিষ্টাং মিচ্কুৎরা ছেনা আরাকার ছামু ক দেখি উপ্টিঙ্গালী কর্‌্যা কৈবে ইগা ব্যাক্ খিস্বা। আগো সে কি নি? মোর গাঁর উচ্ছবা তেলির ঝি পেমীকে যে, এক পুর্ষা ভেট্যা ছিলন, লিত্তি রাইৎ হৈনে ছাতির উপ্রে মাড়্যা বুস্তন। ফেরতার গিরস্ত গয়াভূমে পিঁড় পড়দান কর্‌্যা আস্তে তেবে তাকে ছাড়লন্ সে কথা কি মিচ্ছা? আর শুনছু না? লদর কালীর তর্পে নাকি বাজে বাজে মন্নিষের ঘরে ভাতের হাঁড়িয়ে কে তার অক্রুসাঁৎ চন্দন ফঁটা লাগ্যা দেই। যেদি বা অজান্তে কেউ তায় রান্দাবাড়া কর্‌্যা খায় সে হৈনে এক্কাদমে লিদ্ধুম পুরী। ইসব ভূতের কাণ্ডি বিত্ত্রেকে কার আর কুদরৎ মা? শুন্তে পাবা যায় কালামুড়্যা জখ্র্যা দিয়া বাদ্দি বাজনা কর্‌্যা—সেগাঁনু যুগ্নী বাউট্যা দিনে নাকি তেবে থাম্থুম্ হয়। যুগ্নীমাকে কোট্ কোট্ দঁড়বৎ মোন্নেকার সাইকে যমন বিজো নাই করন। আলোমা! কলিক্কাল ভোর হয়া আইল কিন! বাঁচ্যা থাউত বিড়বি—পুষ্করা মেঘে চাকড়া লাগাণীঁ হয়া কোট্টালপোক ডাক্যা গাগ্গা শ্ববদে বন্যা আসবে, ধানে ভামা—ক্ষেতে আউসা—শস্তি নাশ—ওরুণ্যে বাস হবে, ডোলে ফরু শামুকে ধান

থাবে, কাঠুয়ায় কঙ্গা ডাঙ্গায় ডিঙ্গা বাইবে, আচানক আচানক পেড়ায় লোকের গুষ্টী গুড্যান লিদ্ধ্ূই হয়া যাবে, আগুণ বিরিষ্টি হয়া ঘর গা আবাই হবে, গেড়্যার মছ্যগা শূন্যে উড়্যা বুলবে আর বিরোস্পতির সঞ্চারে ভূঁকঁপ্ পাঁণীকঁপ্ হয়া একাদমে যুগ লৌট্ হয়া যাবে। সৌসব লছ্যণ ঘট্যা আসেব্ঠে আর কি! আর শুনছুনিক? মাথি পিঁড়াকে গিজ্জোটে খবর আস্বে—ডিল্লীসহরে একটা বিল্লির নাকি দিন দুটা 'ছা' হয়।

হাব্সী—আগো মা! গিজ্জোট্ কিগো?

হাপৎরঙ্গী—কে জাণে মা গিজ্জোট্ ফিজ্জোট্। কুম্পানীর ঘরে কথাকে দঁড়বৎ! সেটা নাকি পক্ষীরাজ ফড়াজ্জনা—আঠ্রাকে আঠ্রা উড়্যা আইসে। তায় তল্লাটের খবর থায়। আথাকু তোয় মোয় যত্ত কথা হৈনি রাইৎ পৈনে তাঁয় ব্যাক্ আঁক্কা হয়া যাবে।

হাব্সী—আঁ-আঁ! কি কনা কি বলগো! আগো ইসব কথা মোর বৌ বেদীর ফাণে উঠ্বে নিত? কে জাণে মা মোর ত ছাতি ধস্ ধস্ করেব্ঠে। যে হৌ মা, অৎবা ধুপটা পড়্যা গেছে তৎকাল উঠমাউঠ। আগো মোন্নেকার সাই এঠি কাইগো? দিশ কাটেনিক। হৈ দেখছ্—সে আন্দ্র্যা গাঁটার গা ঠেস্যা—হৈ সে সাত গাছ্যার পচ্ছি ভিতায় তমার গাঁ, আর হৈ বাট্যাকি পার্য্যা সাগরকর্ণের বাটে যে ঝিল্‌ঝিল্ রিৎরিৎ কচ্ছে সৌ ঢোল সমুদ্র ফক্কা পার মোর গাঁ!

হাপৎরঙ্গী—সৎ কৈছু মা সৎসৎ। যাই মা চ, তোর কি কি বরাৎ আছেগো?

হাব্সী—আর কিচ্ছোঁ লয় মা, খালি এউ কঁপাটায় লিজজাহোসো চিকণ, থালিটায় থাস্বিন, গরুর ঠ্যাঙ্গে দিতে পাথট্টায় আলকাতরা আর মোর গাঁর ছ্যাখনহাঁসি বষ্টমবৌর-গজামুগের-দেউলগুঁড়ির-সৈঘরে বরাতি একটা দিবাগুল—

হাপৎরঙ্গী—আলো; দিবাগুল কিলো মা?

হাব্সী—যা কপ্পালে! আগো কদ্দিন্ন্ যে ই হুহুর উঠ্ছে তমাকে কি মালুম নাই? তার ভিত্রে যে জ্যান্তা লালঘড়া আছেগো! তারু একটা খঁচ্চা লিয়া হাউলে ঝক্ কর্য্যা ঘস্যা দিনে ধক্ কর্য্যা আলো ম্যাক্কুল হয়া যায়।

হাপৎরঙ্গী—আগো সেকি গরম আগুণের জানা? কি কৌ না কি বলু গো! ওঃ ধন্যিরে কুম্পানীর পো! তোর আগুন পৈদা করাকে ধন্যি! আর পাইসা লুঠাকেও ধন্যি! তেবে মা মোর কামগা সাবড়্যা পেলিঠি তুই লৌটবার ওক্তে অব্ব্শ একটা হাঁক মার্ব্বি,—কমন?

হাব্সী—সে কথা কৈতে হবেনি। কথায় বলে—ভাত ছাড়বি সাঁথ ছাড়বিনি।

(উভয়ে প্রস্থান)

হাপৎরঙ্গী—(মনোহারী দোকানী প্রতি) দেতহে দকানীর পো মোর ঘরে বড়বৌর পাতায় পরা একজড়া লল্লুড়ি, আর দুগঁড়র'সের কাঁঠি, লাতির মিজ্জায়ে ঘুড়া দুটা বুদ্দাং। খুম জৌলসী রকম বাছ্যাদে। অমন্দ নাই হয়।

দোকানী—নাগো মাউসী মুই তেন্‌ক্যা লাক্রামাল আঙ্গিনি জিয়া। বিকুর্ল কোলকাত্তার আমদা গরা মিস্ত্রীর হাতের কাম জিয়া। দেখ্‌ছু জিয়া কেন্‌ক্যা খুল্‌তা জিয়া? এর মূল্যি লাগবে ইটায় একপাই জিয়া, উটায় আধপাই জিয়া আর সেটায় জিয়া তিন ছদ্দাং।

হাপৎরঙ্গী—আহে! ই তিনটা দরিবত থোক্কে এক পাইসায় পাবা যায়, তেবে অত্ত গলাকাটা কথা কৌঠু কিনি? জুম্বোলে জোহোতে কত লিবিকঃ। মুঞী উদার মগ্নিষ সাত ভজকট জানিঁনিক।

দোকানী—আগো মোর ছামু দগল ফস্‌ল্যা কথা পাবিনি জিয়া। লিট-মুক্কোর ছপাই লাগবে জিয়া। এয় লিতে হয় লে জিয়া—নাইত চল্যা যা জিয়া।

হাপৎরঙ্গী—হুঁ! ঘোল কেনে পাণ্যারে? না—গরাক ধচ্ছে টাণ্যাঁ। তোন্নেকারু পহবার পড়ছে আর কি! লাতির ব্যায় ইকিস্তা গুছ্যা যাবিলে। আহে!—যার সমূক্র মণেঁ খচ্চা, তার কি বালিকাণাঁয় বুজ্জা? হেইলে থোক্কা ছপাইসা। (প্রদান ও প্রস্থানকরতঃ ময়রার প্রতি) আরে ক্বেরে গপ্পাল নাকি রে? গায়পায় ভালা আছুত আপ্পা? বাস্‌সার মণঁ কত্ত কর‍্যা লেউঠু নাকি? দেত মোর ভত্তা লাতির ব্যার ফগন ভারের তরে ধান ঢুকাঠার খুম জব্বর ধালমা টিপ্রা রকম বাস্‌সা। আর গাঁদেবতীর তরে আদ্দামড়ীর সাতখলা সিন্নি মিষ্টাবান্‌। ই জাগস্বী খবিসের নৈবিচ্ছি। ভেল্‌দিনে ফুমন্সার গজবে পড়া চোট্টে হাঁকাড়্যা থাবি, তাউ হুঁস্যার কর‍্যা দিনি বুঝলুত?

ময়রা—লাতির ব্যায় অত্ত খচ্চা কর‍্যা কম্নে বাঁচবিগো? মোর ছামু এন্‌ক্যা বরাতি দর্ব্বি নাই, অন্যি দকানে যা।

হাপৎরঙ্গী—মুই জানিঁ তুই তুট পুঞ্জ্যা লোক। চিরোকালটা তোর নাইর বা বৈছে—খালি নামে গলা কাঁজি ভৈখণ। আরে লিহাৎ যদি তোর পুঁজি পাটা নাই তেবে মোদ্বরে ছমাস্থা ভাত মাইনা—হালঠিকা থাবিচঃ। সে হৈনেতে মঝাস্বেঁ থাবি বা যোগে বা কর্কায় থাবি—বেপর্বায় দক্কানদানি চল্যা যাবে—কমন? যাবিত চ উঠ্‌।

ময়রা—আইগাঁ, অংবা বিজো করুন, মোর গরাক লাগছে।

হাপৎরঙ্গী।—আচ্ছা তেবে মুই ঘুর‍্যা আইসিঠি। (প্রস্থান ও বেণ্যা প্রতি) ক্বেরে লোঠা ভাই নাকিরে আপ্পা! একটা কথা শুঙ্‌না? তোস্বাঁথে মোর ভত্তা লাতির মিতা বান্দ্যা দিব। ব্যারদিনা ওববুশ মোদ্বরে যায়া পৌচবি, আজনু আবাহন দিনি বুঝ্‌লত? হা দেখ লাতি! মোকে ব্যা ঘরের আঞ্জ্যাম কটা মট্‌কর‍্যা দেত—আধপাইসার পানসজ, একছদাঙ্গের ঝাল জিরামরিচ, একদামড়ীর রাংতা, আদ্দামড়ীর মিসিটিসি সব কিছো আঞ্জ্যাম। রাংতা আর মিসিটা যমন পাঁচপসিন্দি হয়। আর কৈ—মোদ্দিগে চাঁ? মোকে পত্যমশাণেঁর নৈতন আম্‌দার দরিব দিবি, হুটাসৈ কর‍্যা কিষ্টোপৈখা অখামারি দরিব দিয়া কুটুম বোঁদের ছা

অপষ্ট করাবিনিক। মোর বরঙ্গ তুসিকা যাউবা থাউ তব্বো খৎরা চিজ্‌টি নাই হয়। আরে ধন! মোর ঘরে বির্হদ্দ্যা কাণ্ডি কার্খানা কি তোকে ছাপ্পা আছে যে আরো বল্যা কার্য্যা বুঝাইতে হবে? যাউত দেখ্যা খালি কিত্তাৎ হয়। যাবি—তেন্‌ক্যা তোর জিনগানি ভোর দেখুনিক।

বেণ্যা—সেত মুই জাণি। তোর কুল্যে এক পাইসা, তায় অত্ত চিজ কন্নে খুজু?

হাপৎরঙ্গী—আহে যাহু! তুই মনে কন্নে কুন্‌ কামটা নাই হয়। ছামু কৈনে খুসামৎ, নাইত চাড়কর্য্যাত কৈ তোর মতু সাব্‌কাড় সিয়ঙ্গস দেনেবালা আর কুন্‌টা আছেরে? সব মড়ামড়ীনে দাগাবাজ ডাকাৎ। তুই যদ্দিন আছু আপ্পা তদ্দিন মোর আসা যাবা, নাইত তোর সে করম হৈনে মোকে আর ইবাটে দেখবিনিক। তোর ঘরটা কাইশাড়ে লয়? তোর বাপ যে থারার মন্নিষ থাইল রে আপ্পা সে কথা আর কি কৈব ধন! হাটে বাটে ভেট্‌ হৈনে হাঁউমাউ কর্য়্যা ঝড়াক্কেনে গপ্‌কত্তন তেন্‌ক্যা হল্‌সা মন্নিষ কি আর পাবিরে ধন।

বেণ্যা—আগো মোর ঘরত মাগুর্য্যায়। বাফুত বড়তমান তুই যে লিহাৎ অবুরা সবুরা গা কৈতে লাগলু গো! ভালা গুক্কী কিন্তু! তোকে জাণিঁযা—এঠিহু ভাগ্‌।

হাপৎরঙ্গী—আহে জাণঁবিনি কিনি? তুই জাণুঁকি মুঞী জাণি আর জাণেঁ হর্য়্যা, মর্য়্যা গেছে তোর বাপ মোর ছপণ কড়ি ধার্য়্যা, দেত-তার লিকাস কর্য়্যা?

হাব্‌সী।—(ক্রন্দনস্বরে) আহে কেকুণ্ঠি আছুহে, দৌড়হে—লুঠ পড়ছেহে—গেনিহে মন্নিহে—বিন্দাবন ফাঁক্কা হৈলহে! ও মেইকাপের ঝি কাই আছগো আইসনাগো!

হাপৎরঙ্গী—(দ্রুতপদে) আগো ও মালঝি! কি হৈলগো! কিবিৎপাৎ ঘট্‌ল গো! কিসের গুল্লি হুরি উচ্ছান চব্ব পড়ছেগো! কনা গোমা?

হাব্‌সী।—আর কি চুলা হবে মা! কুন মুপড়ার মুচাঞা হাট আস্নি, মোর কঁপাকাৎ কর্য়্যা দিলগো? আগো কুন্‌ আধাবর্দ্র্যা লগেলগে থাইল, চারাচত্তুর বুঝ্যা মোর কুঁড়্যা পাথরটি সট্‌কালী কল্লগো! মুই যে বিচুট্যা পাঁচ-ছ পন্নি খুজ্যা হাল্লাক হৈনি তব্বো উদ্যা পাইনিনিগো! ওঃ মড়ার হৈরপ কি লিল বল্যা লিলগ, চক্ষে আঙ্গুল দিয়া লিল! সে কি পাথর বল্যা পাথর মা! লকির পারা লম্বা লগদ্বীপের লিদ্দা কালা কঝোর মুগ্নি পাথর থাইল মা! আথ্যান দিনা উচ্‌কা ফোড় দেখতে যায়া আখা তেত্যার যাংহু রোক দেড় পাই দিয়া মোর পো সনাচ্চাঁদের ভোজন্যার তরে কিণ্যা লেস্নিগো! আগো তাকে রাজা কোক্‌সিমার আম্বোলহু সাউত্যা রাখ্‌ছিলি গো? আর কিসে কর্য়্যা জাউ খাবগো মা? হায় হায়! লিঠুর বিধি এউতাকাৎ কল্লুরে।

হাপৎরঙ্গী—কিবলু মালাঝি অত্তলোকের বিচ্চে তোর দরিব ভিৎরমাটি?

আচ্ছা থামতুই, মুই অক্ষু দিয়াশী পিড়ায় মুদাডাঙ্গ্যা ললধাউড্যা কর‍্যা আড়পষ্টে ইঝার দিয়া খাড়াদম লালমুড্যা লেইস্যা আঁকুড়া দড়ায় পিছলা বন্ধনটি দিয়া বিকুল মড়ামড়ীকে এক্কাভিতাহু নড়ভঁড়গুণাগার করিবঠি থাম্। কিলোষ্টোর সাইভের ছাম্ গাবাদিয়া মকড়ধমা চাল্যা মামুঘর পাঠ্যা তসীল কর‍্যা ছাড়ব। অম্ন পাইছু নাকি? লাগে ঝড়াক্কেনে অসরূপী চিন্তাটা কি? তুই এউঠি লালাকাৎরা মার‍্যা কর্বিহাল্লা হয়া পড়্যাথা—মুই এই চন্নি। (প্রস্থান)

পথিক—কে তুই এঠি চিৎমাৎ খাইছুগো? তোর কি হৈছে গো?

হাব্সী—কে তুই রে ঢ্যাম্না? চিৎপট্টাং খাইনিত তোর বাপের কিরে? ওঃ অগণিঁমাপ্তরকে নাই কৈনে চল্লনি আর কি! বলে,—কাইকার বা কে? ছুটা তমড়া ভাতে দে।

পথিক—নাই হৌ, তুই পড়্যা থানা মোর তায় কি? (প্রস্থান)

কন্‌ষ্টেবল—কাঁ্যাও তোমারা নাম হাবোসী? তোমারা ক্যা চিজ চুরী গেয়া?

হাব্সী—আপ্পা লালমুড্যারপো আস্ব্নাকি বুস্ বুস্। আহে যাহু কৈতেকি এউঠি বুস্যা দক্কানীর সাঁথে বাৎ চিৎ হৈতে হৈতে কুন্ গুলাম মোর ঘরে সনার পাথরবাটিটী গাঁইৎ কর‍্যা এক্কাদমে উতারপার হৈছে। দেত আপ্পা সেটি তন্‌খি কর‍্যা। তোর জয়জয়কার হৌ, ধনে পুতে লক্ষীলাভ হৌ, ঝির কোড়ে পো হৌ তোর বাপ জ্যান্তায় স্বরগ্ বাস করু।

কন্‌ষ্টেবল।—ক্যা বক্ বক্ কর্ত্তেহো হাম্‌তো উস্কা কুচ্ সমঝ্‌তা নেহি।

হাব্সী।—হুঁ অৎবা বুঝ্‌বি কিনি? নাচ্ খাবাইতে পান্নে তড়াক ইৎপাক কর‍্যা লিতু। চোরের সাঁথে সাব্‌ক্যা আছে কিনা? অক্ষুকে এক ঢ্যাম্না টৌসলিয়া গেল কের তুই আস্ব্ সৌতত্বে, আরো কিছু গাপ্পাইতে। সনার পাথরবাটী বল্‌তে বুঝ্‌তে পাল্লুনি—ট্যাঁপ গুঁজার কথা হৌ দেখি অক্ষু কৈবি কাঁহা দে দে। ওঃ ব্যাক্ গুলাম এক্কাটিপরে।

কন্‌ষ্টেবল—সোণেকা পথলবাটী? ক্যা তাজ্জবকি বাৎ। হা-হা-হা।

হাব্সী—মরিমরি। হাঁস্যা দিনে ভাস্যা গেনি আরকি? বাপার খমটি কি স্বগোড়। আরে বক্কা-লাকাবিল! সণাকাতো লয় যেদি তেবেকি তরা বাপ কা?

কন্‌ষ্টেবল—তোম্ ক্যা সনাকাতো সনাকাতো বোল্‌তেহো হাম্‌তো কুচ্ ঠেকানা পাওতে নেহি তব্ কিস্তরসে মাল সনাক্ত করেঙ্গে?

হাব্সী—আর কর‍্যা কাম নাই যা। ছেলিয়ে যদি পোৎলি মাড়্‌ত, তেবে গরু বাছুরে পিরোজন কি? কুন্‌কম্বক্তা তোকে পাঠাইছেরে? দূর উজবক্ স্যাঁক চিল্লিটা দূর-দূর।

কন্‌ষ্টেবল।—কাঁ্যাও হাম্‌সে গারি দেতেহো? জান্তেও নেহি হাড্ডি তোড় দেগা।

হাব্সী।—আর দাঁত মুড় গিজড়্যা খুরমূঠি ঝাড়্যা চ্যাটম্ দেখাইতে হবেনিক।

মুয়োভি থড়া থড়া খট্টাই পাগাতে জান্তাহে। তেরা মতু কেত্তাগঁড়া চক্ষকে পুড়্যা পাক্কাল খায়াহে, তুই আস্ব্ ভ্যাব্‌কাণি দেখাইতে। ই-জাউখাবা ঞাঁক মাউগের ছামু কর্ব্বি যা। তোকে অলাণীঁ হৌ—পুষ্করালাগু—ছমাস্থা ধরু—ল খোড় হৌ—য়ুয়াণী খস্থ—আশ্বিমিটু—যমলেউ—অছ্যবে ঘস্‌ড়াউ—ভঁড়া শিয়ালে খাউ—চিলকাবা খঁপ্রাউ—মুড়ে হুড়হুড়্যা হুদ্দুড়্যা পড়ু। মহুয়া মদ্‌ক্যা লিম্বাখোর মড়া লিক্কাল লিক্কাল। না আপ্পা ই মন্‌হর ফাঁসর‍্যার আগড়দানীর হাটকে কভ্‌ভু আস্তে নাইক। মুঞী তির্বাচ্য কন্নি—যেদি পির্কিত একলা মার পৈদা গাঁঠ্যাগব্‌রার ঝি হৈ, তেবে মন্নে মর্ব, তব্বো যুগ্‌গে ইমুয়া হবনি হবনি হবনি। সেবঞ্চ কত্তু্ব্যি বঞ্চ তব্বো বঞ্চ হবেনি বঞ্চ। মুই কিন্তু একটা বার কিন্তু দেখ্যা কিন্তু ছাড়ব, এউ মোর পিতিঙ্গা কিন্তু। (প্রস্থান)

সতীর হাট ভাঙ্গল, মোর কথাটি রইল
ভত্তার 'ব্যা' সরবে, লট্যা গাছটি মুড়াবে।*

নির্দেশিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বাংলাভাষা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, যুক্তিতর্কানুমোদিত পদ্ধতিতে গুরুভার অথচ সরস আলোচনার জন্য প্রখ্যাত। বাংলাভাষা সম্পর্কে তাঁর অন্বেষা এখনও অতন্দ্র। 'বাগর্থ' তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ।

'বাগর্থ'-এর বর্তমান সংস্করণ অধিকতর সমৃদ্ধ এবং 'দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার উপভাষা, নিবন্ধটির জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষা সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করবেন 'বাগর্থ' তাঁদের বিভিন্নভাবে সহায়ক হবে।

বৈচিত্র্যে অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে এবং যৌক্তিকতায়' 'বাগর্থ' বাংলাভাষায় 'নতুন ধরনের গ্রন্থ' হিসাবে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার-কর্তৃক অভিহিত হয়েছে।

মূল্য : বার টাকা

ভারত সরকার সুলভ মূল্যে কাগজ সরবরাহ করায় পুস্তকমূল্য হ্রাস করা সম্ভব হল